সুচিত্রা ভট্টাচার্য

পালাবার পথ নেই

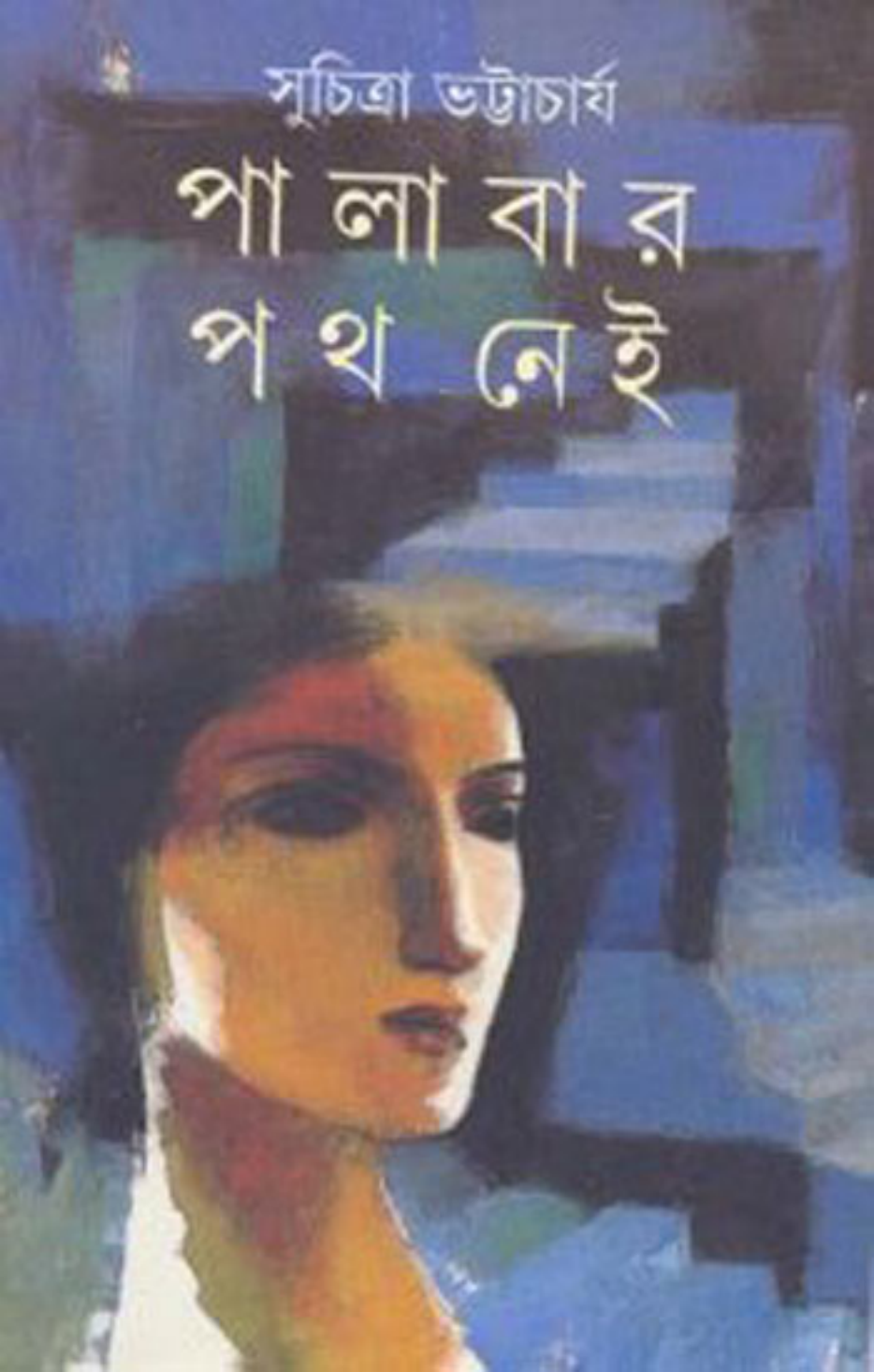

পালাবার পথ নেই

প্রথম পর্ব

[এক]

অর্কর সঙ্গে হঠাৎ এভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবতেও পারেনি বিদিশা। তাও আবার এখানে, এই দিঘায়!

গতকালই দুপুরে দিঘায় এসেছে বিদিশা, অর্চিষ্মান। বিয়ের পর এই তাদের দ্বিতীয় সফর। প্রথম বারটা ছিল হানিমুন, মাস সাতেক আগে। জানুয়ারির রক্তজমানো শীতে ডালহাউসি চাম্বা ধরমশালা। তখন ছিল এক ঘোরের সময়, অর্চিষ্মানকে আবিষ্কারের নেশায় তখন তন্ময় ছিল বিদিশা। তবু তার মধ্যেও একটা খুঁতখুঁতে ভাব মনে লেগে থাকত সারাক্ষণ। ধুস, পাহাড়পর্বতে আসার কোনও মানে হয়! বিশ্রী ঠাণ্ডা, দিনের বেলাতেও ফায়ার প্লেসের সামনে কুঁকড়ে মুকড়ে বসে থাকো, প্রাণের সুখে হেঁটে চলে বেড়ানোর উপায় নেই, চড়াই উৎরাই করতে করতে হাঁপ ধরে যায়...এর চেয়ে সমুদ্র ঢের ঢের ভাল। একের পর এক ঢেউ কাছে ছুটে আসছে, সাদা ফেনা লুটিয়ে পড়ছে পায়ে, কানে বাজে অবিরাম চাপা গুমগুম ধ্বনি, চোখে মুখে নোনতা বাষ্পের মাখামাখি—এর সঙ্গে পাহাড়ের তুলনা হয়! ওই অন্তহীন জলরাশির দিকে শুধু তাকিয়ে থাকাতেই যে কী আবেশ!

সেই আবেশের টানেই এবার দিঘা। না, পুরী ওয়ালটেয়ার চাঁদিপুর কিংবা গোয়া আন্দামান নয়, ওসব জায়গায় যেতে গেলে বেশ কয়েকটা দিন হাতে নিয়ে বেরোতে হয়। অন্তত সাত দিন। অর্চিষ্মান অত দিন ব্যবসা ফেলে নড়বেই না। অগত্যা দিঘা। দু দিনের জন্য। মঙ্গলবার ভোরে বেরিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে ফেরা। অনেকটা উইকএন্ড করার মতো। মিড উইকই অর্চিষ্মানের উইকএন্ড। মঙ্গল বুধ তার নিলামঘর বন্ধ থাকে। আর বার-কাম রেস্তোরাঁটা দুটো দিন নয় ম্যানেজারই সামলে নেবে।

বিদিশারা উঠেছে পুরনো টাউনশিপের দিকটায়। সমুদ্রের একদম পাড়েই, নতুন এক বিশাল হোটেলের তিনতলায়। ভারী সুন্দর নাম হোটেলটার। ব্লু হোয়েল। নীল তিমি। একটু কষ্টকল্পিত নাম বটে, তবে শুনলেই মনে হয় অ্যাটলান্টিক প্যাসিফিকের পাড়ে এসে গেছি। এখানে ব্যালকনিতে সমুদ্র, জানলায় সমুদ্র, চোখ মেললে সমুদ্র, চোখ বুজলে সমুদ্র, শয্যায় রমণের সময়েও ঢেউ-এর ফসফরাস বুঝি লেগে থাকে গায়ে।

নীল তিমি কেতাদুরস্তও খুব। ইউরোপিয়ান স্টাইলের ঝকঝকে স্যুইট, মেঝেয় নরম কার্পেট, পা রাখলে গোড়ালি ডুবে যায়, নীচে মাদক আলোয় মোড়া পানশালা, মখমলসবুজ লন, এখানে সেখানে বাহারি টেবিলচেয়ারের মাথায় রঙিন বিশ্রামছাতা, মোমমসৃণ ডাইনিং হল, প্যাসেজে সার সার এরিকা পাম, সুইচ টিপলেই উর্দিপরা বেয়ারা হামেহাল হাজির, জেনারেটারের গুণে অবধারিত লোডশেডিং টের পাওয়া যায় না...।

এমন হোটেলে বাস বিয়ের আগে বিদিশার কাছে স্বপ্নের মতো ছিল।

মতো কেন, স্বপ্নই। অথবা স্বপ্নাতীত।

দিঘায় এখন ভিড়ও নেই তেমন। একে বর্ষাকাল, যখন তখন ঝমঝম ঝমঝম, তায় আবার সপ্তাহের মাঝখান, হোটেল রাস্তাঘাট সবই এখন ফাঁকা ফাঁকা। এমন একটা কুড়িয়ে পাওয়া নির্জনতায় বিদিশার খুশি বুঝি আর ধরে না। অর্চিষ্মানও বদলে গেছে। কলকাতায় সে এক প্রবল পুরুষ, মিতবাক পুরুষ, স্থিতধী, ঘড়ির কাঁটার তালে তাল মিলিয়ে চলা আদ্যন্ত কাজমাতাল এক মানুষ। এখানে পা রেখেই সে রুটিনছাড়া। রাত বারোটার সময়ে কাল বিচে চলে গেল, ভোর হতেই বেরিয়ে পড়ল ক্যামেরা কাঁধে। পটাপট ছবি তুলে চলেছে, গুনগুন গান গাইছে, চুটকি রসিকতা করছে, আকাশ দেখছে, সমুদ্র দেখছে, ঝাউবনে ছুটছে বাঁই বাঁই।

এই তো সকালেই ব্রেকফাস্ট সেরে বিদিশাকে টানতে টানতে সমুদ্রে নিয়ে গেল। হাত ধরে দু'জনে একটার পর একটা ঢেউ টপকাচ্ছে। একেবারে বিদিশার থুতনিজলে এসে দুম করে হাত ছেড়ে দিল।

বিদিশা হাউমাউ আঁকড়ে ধরেছে অর্চিষ্মানকে,—অ্যাই, ডুবে যাব, ডুবে যাব...

অর্চিষ্মান হা হা হেসে উঠল,—কাউকে না ধরে একটু নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখো ডাডাম।

—কী করে দাঁড়াব? বিদিশা অর্চিষ্মানকে খামচে ধরেছে, নীচ থেকে বালি সরে যাচ্ছে যে।

—ও তো যাবেই। আন্ডার কারেন্ট।

—আমার কেমন গা শিরশির করছে। এই প্লিজ, আমি পাড়ে যাব।

বলতে বলতেই সামনে ঢেউ। প্রকাণ্ড। ওমনি ডুব, দু'জনে একসঙ্গে। মাথা তুলে হাঁপাচ্ছে বিদিশা। থু থু করছে নুনজল,—এই প্লিজ চলো, আর নয়। সমুদ্র আজ বড় টানছে গো।

অর্চিষ্মান নির্বিকার। হাসছে,—ভিতুর ডিম কোথাকার। বালি সরে যেতেই এত ভয়? পায়ের তলার মাটি সরে গেলে কী করবে?

—মরে যাব। একদম মরে যাব।

—বললেই হল? মরতে তোমায় দিচ্ছে কে?

অর্চিষ্মান পলকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল বিদিশাকে। জল ভেঙে ভেঙে পাড়ে ফিরছে। বিদিশা দু হাতে অর্চিষ্মানের গলা জড়িয়ে ধরল। চোখ বুজে ফেলেছে। উফ, প্রিয় পুরুষের শরীরে লেপটে থাকায় কী যে অবিমিশ্র সুখ! সে যেন এক রক্তগোলাপ, কামনার ছোঁয়ায় একটু একটু করে ফুটে উঠছে।

গোলাপে কাঁটা থাকে। সুখেও।

না হলে অর্কর সঙ্গে তার দেখা হবে কেন!

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরেই অর্চিষ্মান ঘুমিয়ে কাদা। পাশে শুয়ে বিদিশারও চোখ জড়িয়ে এসেছিল, উঠে পড়ল সাড়ে চারটে নাগাদ। বাইরে তখন এক মলিন বিকেল। শ্রাবণের আকাশ ঘন হয়ে নীচে নেমে এসেছে, নামতে নামতে মিশে গেছে দিগন্তরেখায়,

ছুঁয়ে আছে সমুদ্রকে। মেঘের গন্ধ পেয়ে ফুঁসছে ঢেউ, গর্জন তুলে ছুটে আসছে পাড়ের দিকে। বাতাস ভারী গুমসুম, যেন মেঘ তাকে ধমকে থামিয়ে রেখেছে।

বিদিশার মন আনচান করে উঠল। এমন বিকেলে হোটেলে কেউ বসে থাকে!

অর্চিষ্মানকে ঠেলল বিদিশা,—এই ওঠো, বেরোবে না?

অর্চিষ্মান উম্ আম্ করে পাশ ফিরল।

বিদিশা সুড়সুড়ি দিল পায়ে। কানেও। কেঁপে কেঁপে উঠছে অর্চিষ্মান, সরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু জাগার লক্ষণ নেই।

—উঠবে না? আমি কিন্তু তাহলে একাই বেরিয়ে যাব।

জড়ানো গলায় অর্চিষ্মান বলল,—যাও।

তবু একটুক্ষণ অপেক্ষা করল বিদিশা। বেয়ারাকে ডেকে চা খেল, আয়নার সামনে বসে সাজল মন দিয়ে। অসামান্য রূপসী সে, ছোট্ট একটা টিপ লাগালেই তাকে কল্পলোকের রাজকন্যা বলে বিভ্রম জাগে। তবু চোখে একটু কাজল টানল বিদিশা, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক, শঙ্খ হেন ত্বকে ক্রিমের প্রলেপ। নাইটি ছেড়ে গাঢ় নীল সালোয়ার কামিজ পরে নিল, বুকে বিছিয়ে দিল সাদা ওড়না। এখন তাকে দেখলে রম্ভা মেনকা উর্বশীরাও হিংসেয় মটমট করবে।

সন্তর্পণে দরজা খুলে একাই বেরিয়ে পড়ল বিদিশা। লনে ছাতার নীচে এক জোড়া বিদেশি তরুণ, কথা থামিয়ে বিদিশাকে নিষ্পলক দেখছে। বিদিশা রাজহংসীর মতো গ্রীবা উঁচু করে তাদের পার হয়ে গেল।

পায়ে পায়ে একেবারে বেলাভূমিতে। ভাঁটার টানে সমুদ্র পিছিয়ে গেছে খানিকটা, ভেজা বালি মাড়িয়ে জলের কাছে এল। গড়ানে ঢেউ এসে পা ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে, বিদিশা অনুভব করছিল স্পর্শসুখ। মেঘধ্বনি হচ্ছে গুমগুম। বিদিশা শুনছিল।

তখনই পিছনে চেনা স্বর,—দিশা?

বিদিশা ভীষণ জোর চমকেছে,—তুমি! তুমি এখানে?

পলকের জন্য বুঝি থমকাল অর্ক। তার চেহারা পাকা অ্যাথলেটিক। হাইট পাঁচ এগারো। দেহের সেই ঋজু কাঠামো একটু বুঝি নুয়ে পড়েছে এখন। ছায়ামাখা মুখে বলল,—আজই এসেছি। হঠাৎ তোমাকে দেখতে পেয়ে...

বিদিশার স্নায়ু টানটান। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,—কেন এসেছ?

অর্ক আরও মিইয়ে গেল,—কেন, আমার কি দিঘা আসতে নেই?

—তা কেন, দিঘা তো কারুর কেনা নয়, ইচ্ছে হলে আসতেই পারো। অস্বস্তি ঢাকতে বিদিশা সামান্য ঝেঁঝে উঠল। দ্রুত এদিক ওদিক চোখ চালিয়ে নিয়ে বলল,—একা?

—না, আমরা তিন জন এসেছি। কন্টাইতে স্টেট মিট ছিল। আজ সকালে আমাদের ইভেন্টটা হয়ে গেল, ভাবলাম একটু দিঘা ঘুরে যাই।

—ও। এখনও তাহলে দৌড়ে বেড়াচ্ছ?

—আর কিছু তো আমি পারি না দিশা।

—চাকরি টাকরি জুটল?

পূর্ণ চোখে বিদিশার দিকে তাকাল অর্ক। তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী দৃষ্টি। বিদিশা দৃষ্টিটা পড়তে

পারছিল। যেন বলছে, জেনে তোমার কী লাভ! তুমি তো আমায় সময় দাওনি।

অজান্তেই কেঁপে উঠল বিদিশা। হয়তো বা সামুদ্রিক বাতাসে। হয়তো বা ওই চোখ মনে পড়িয়ে দিল, কী অবলীলায় ওই শ্যামলা মায়াবি-মুখ ছেলেটাকে প্রতারণা করেছে বিদিশা। টানা দেড় বছরের সম্পর্ক এক লহমায় ছিঁড়ে ফেলেছে। কোনও প্রস্তুতির অবকাশ না দিয়েই। কারণ অর্চিষ্মানের সঙ্গে তার তখন বিয়ে পাকা, এবং অর্ককে সে পোকামাকড়ের মতো ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। অর্কর চাকরি পাওয়া অবধি কি অপেক্ষা করতে পারত না বিদিশা? সে রুখে দাঁড়ালে বাবা কি জোর করে তাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসাতে পারত?

লোভ, লোভই তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল।

মনকে কষে ধমকাল বিদিশা। লোভ কেন, সে তো যুক্তি মেনেই কাজ করেছে। শুধু চুমু খেয়ে কি পেট ভরে? সংসার করতে গেলে অন্য কিছুও লাগে। যা লাগে তা অর্কর তখনও ছিল না, এখনও নেই।

অর্ক তাকিয়েই আছে নির্নিমেষ। অস্ফুটে বলল,—তুমি আরও সুন্দর হয়েছ দিশা।

অভ্যস্ত স্তুতিতে বিদিশা গলল না। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল,—বিয়ের জল গায়ে পড়লে মেয়েরা সুন্দরই হয়।

—তা অবশ্য ঠিক।...উঠেছ কোথায়?

পিছনেই ব্লু হোয়েল। ঠিক পিছনে নয়, বিদিশা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে একটু কোনাকুনি, উত্তর পুবে। হোটেলের সব কটা ব্যালকনি এখান থেকে দৃশ্যমান নয়, ঝাউবনের আড়াল আছে একটা। তিনতলার কোন স্যুইটটায় কেন আছে বিদিশা? বাঁ দিক থেকে উঠে পাঁচ নম্বর। তার পরে আর কটা ব্যালকনি? বিদিশা ঠিক ঠিক হিসেব করতে পারল না। আন্দাজে আঙুল তুলতে গিয়েও সামলে নিল। ওরে মুখ্যু, অর্ক যদি গিয়ে হাজির হয়?

বিদিশা আলগা ভাবে হাত ঘুরিয়ে দিল,—ওই ওদিকের একটা হোটেলে।

ছলনাটা কি ধরে ফেলল অর্ক? ঠোঁটের ফাঁকে বাঁকা হাসি কেন?

হাসিটুকু ঠোঁটে রেখেই অর্ক বলল,—একা এভাবে ঘুরছ যে বড়? তোমার হাজব্যান্ড কই?

অকারণে মিথ্যে বলল বিদিশা। কিংবা হয়তো অর্ককে শোনানোর জন্যই বলল—আমাদের জেন গাড়িটা গড়বড় করছে খুব। লোকাল গ্যারেজে দেখাতে নিয়ে গেছে।

অর্ক বুঝি ঈষৎ ম্লান,—গাড়ি নিয়ে এসেছ?

বিদিশা মাথা নাড়ল,—হুম্। অর্চিষ্মান লং ড্রাইভে নতুন গাড়িটা টেস্ট করে দেখতে চাইল। আমারও হাইওয়েতে খানিকটা প্র্যাকটিস হয়ে গেল।

—তুমি গাড়ি চালাচ্ছ?

—বিয়ের পর শিখে নিলাম। ড্রাইভার-টাইভারের ওপর বেশি ভরসা করা অর্চিষ্মান পছন্দ করে না।

অর্ক একটুক্ষণ চুপ। তারপর বলল,—তোমার বরের নামটা ভারী আনকমন। অর্চিষ্মান।

—মানুষটাও আনকমন। কাজের লোক। অকাজের খই ভেজে বেড়ায় না।

অর্ক শ্লেষটা গায়ে মাখল না। নাকি মাখল। বিদিশাকে বুঝতে দিল না। বলল,—তোমার বরের কীসের যেন বিজনেস?

—জেনে তোমার লাভ? বিদিশা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, চাকরি টাকরি চেয়ে বোসো না। আমি বলতে পারব না।

অর্ক হো হো করে হেসে উঠল,—আরে আরে, তোমার স্বামীর চাকর না হয়েও আমার পেট চলে যাবে। বরং আমিই তোমার স্বামীকে কিছু দান করতে পারি।

বিদিশা ভুরু কুঁচকে তাকাল।

—প্রেমপত্রগুলোর কথা মনে পড়ে? মোট সাঁইত্রিশটা আছে। বনেদি বাড়ির গিন্নির প্রেমিককে লেখা রগরগে চিঠিগুলো তার স্বামীকে প্রেজেন্ট করলে কেমন হয়? তোমাদের বিয়েতে তো কোনও উপহারও দেওয়া হয়নি।

বিদিশার মুখ কালো হয়ে গেল,—তুমি...তুমি...!

—ঘাবড়ে গেলে তো? অর্ক আরও জোরে হেসে উঠল,—আরে না না, তোমার চিঠিগুলোই তো এখন আমার সম্বল। স্মৃতি। ওগুলো কি আমি হাতছাড়া করতে পারি? বলতে বলতে হাত রেখেছে বিদিশার কাঁধে। নাটুকে ভঙ্গিতে বলল,—সুখী হও। আমি রব চিরকাল বঞ্চিতের দলে...। বাট মাইন্ড ইট, ডোন্ট টিজ মি এগেন। নেভার।

বড় বড় পা ফেলে অর্ক মিলিয়ে গেল। বিদিশা স্থানু। টিপটিপ বৃষ্টি নেমেছে। মোটা মোটা ফোঁটাগুলো বিঁধছে গায়ে। অর্কর কথাগুলোর মতো।

মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে থেকে ফিরল বিদিশা। জোরে পা চালিয়ে। হোটেলে ঢোকার মুখে এ পাশ ও পাশ দেখে নিল ভাল করে। বিশ্বাস নেই, অর্ক যদি কাছাকাছি কোথাও...!

স্যুইটে ঢুকে বিদিশা অবাক। অর্চিষ্মান বসে আছে সোফায়, চোখ কেবল টিভির ইংরিজি সিনেমায়, হাতে সোনালি পানীয়।

বিদিশা সোফার পাশে এসে দাঁড়াল,—এমন অসময়ে ড্রিঙ্ক করছ যে?

—এমনিই। গা'টা ম্যাজম্যাজ করছে। অর্চিষ্মান ঘুরে তাকাল,—তোমার বেড়ান হল?

—দুৎ, একা একা কোথায় যাব? এই একটু সামনে গিয়ে...

—মার্কেটিং সেরে আসতে পারতে। কীসব কিনবে বলছিলে...

—একা আমার দোকানে যেতে ভাল লাগে না।

—কলকাতায় তো একাই যাও।

—এটা কলকাতা নয়। এখানে আমি বেড়াতে এসেছি। বেড়াতে এসে মোটেই আমি একা একা ঘুরব না।

অর্চিষ্মানের যেন কানেই গেল না কথাটা। চোখ আবার ঘুরে গেছে টিভিতে। গ্লাসে চুমুক দিল।

বিদিশা স্বামীর গা ঘেঁষে বসল,—এই চলো না, একটু নিউ দিঘা ঘুরে আসি। তুমি কিন্তু নিয়ে যাবে বলেছিলে।

—চলো তাহলে।

অর্চিষ্মান কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল। এক চুমুকে গ্লাস শেষ, মুহূর্তে টিভি বন্ধ, দু

মিনিটে অর্চিষ্মান রেডি। বিদিশাকে পাশে নিয়ে যখন গাড়িতে স্টার্ট দিল, তখনও দিনের আলো পুরোপুরি মরেনি।

ফেরার পথে তুমুল বৃষ্টি। উইন্ড স্ক্রিন ঝাপসা হয়ে গেছে, ওয়াইপার চালিয়েও সামাল দেওয়া যাচ্ছে না, ধীর গতিতে চলছে গাড়ি।

হঠাৎ অর্চিষ্মান স্টিয়ারিং-এ বসে গজগজ করে উঠল,—ফালতু এই ঝড়বৃষ্টিতে বেরোলাম। হোটেলে বসে সিনেমাটা দেখলে ভাল হত। তোমার জন্য আমার শেষটা দেখা হল না।

বিদিশা বলল,—সরি।

—শুড বি। সিনেমাটার শেষটা দেখার আমার খুব ইচ্ছে ছিল।

—কী সিনেমা?

রাস্তায় একটা গোরু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। তাকে পাশ কাটিয়ে অর্চিষ্মান বলল,—ডায়াল এম ফর মার্ডার। হিচককের।

—ও তো আমার দেখা বই। শেষটা আমি তোমায় বলে দিতে পারি। বিদিশা ঠোঁট টিপে হাসল,—বজ্জাত স্বামীটা শেষ পর্যন্ত বউকে মারতে পারবে না। এক্স লাভারই মেয়েটাকে বাঁচিয়ে দেবে। চাবি নিয়ে বেশ একটা ইন্টারেস্টিং পাজল আছে।

ঝপ করে ঘাড় ঘুরিয়ে বিদিশাকে দেখল অর্চিষ্মান। বিড়বিড় করে বলল,—আমিও তাই অনুমান করেছিলাম। গল্পে হাজব্যান্ডরাই যত দুষ্কর্মের নায়ক হয়, আর পূর্ব প্রেমিকরা ত্রাণকর্তা। হাইলি আনরিয়েল আইডিয়া।

—কেন? আনরিয়েল কেন?

—ও, তোমার বুঝি রিয়েল মনে হয়? অর্থাৎ আমি যদি হিচককের ওই স্বামীটা হই, তুমি তোমার প্রেমিকের কাছে শেল্টার নেবে?

বিদিশা হেসে ফেলল। শরীর হেলিয়ে অর্চিষ্মানের কাঁধে মাথা রাখল। মৃদু স্বরে বলল,—উঁহু। আমায় মারতে হলেও তুমি মারবে, রাখতে হলেও তুমি রাখবে। আমি তো গল্পের নায়িকা নই, সুতরাং আমার প্রেমিক টেমিকও নেই।

—তাই বুঝি?

শব্দ দুটো ঠং করে বাজল বিদিশার কানে। অর্চিষ্মানের স্বর হঠাৎ এমন হিমশীতল কেন? অর্ককে কি দেখে ফেলেছে অর্চিষ্মান?

[দুই]

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ভারতী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মেয়েকে দেখেই চোখে খুশির ঝিলিক,—ওমা, বুলু তুই! কখন এলি?

—অনেকক্ষণ। বিদিশা ঠোঁট টিপে হাসল,—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম তুমি কতক্ষণে টের পাও।

—সদর খোলা ছিল বুঝি?

—ছিল মানে? একেবারে হাট।

—সে কী! ভানু নেই?

—কোথায় দাদা! ও ঘর তো ফাঁকা।

—আশ্চর্য, এই তো ছিল! তোর বাবা অফিস বেরোনর সময়েই তক্তপোষে শুয়ে কাগজ পেনসিল নিয়ে কী সব করছিল।...কোথায় যায়, কখন যায়, কিছু বলেও যায় না...

—ভাল ভাল। বিদিশা ভুরু বেঁকাল—যেদিন সর্বস্ব চুরি হয়ে যাবে, সেদিন টের পাবে।

দরজার কাছে গিয়ে বাইরেটায় ইতিউতি উঁকিঝুঁকি দিলেন ভারতী। ছিটকিনি লাগাতে লাগাতে আলগা নিশ্বাস ফেললেন—আমাদের আর আছেটা কী, যে নেবে।

কথাটা নিখাদ সত্যি। এ বাড়িতে দুটো মাত্র ঘর, দুটোই শ্রীহীন। খাট চৌকি আলমারি, কাঁড়িখানেক আদ্যিকালের ট্রাঙ্ক স্যুটকেস, সবেরই বেশ লঝ্ঝরে দশা। ছোট মতন প্যাসেজ আছে একটা, নামকা-ওয়াস্তে চিলতে বসার জায়গাও। সর্বত্র এলোমেলো জিনিসপত্র। মামুলি। রংচটা টেবিল, নড়বড়ে চেয়ার, মান্ধাতা আমলের সাদাকালো টিভি, সাবেকি পুতুলে সাজানো ধুলোয় ঢাকা শোকেস, পাথরের ভাঙা ফুলদানি, পুরনো রেডিও, বিকল সেলাইমেশিন...। আজকালকার চোরদের যথেষ্ট আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, এ বাড়িতে ঢুকে মোটেই তারা হাত গন্ধ করবে না।

মার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিদিশা ভেতরের ঘরে এসে বসল। হাতের বিগ শপার নামাল বিছানায়, গরমে হাঁসফাঁস করছে। ভারতী ফ্যান চালিয়ে দিলেন, ঘুরন্ত বাতাস একটু বুঝি স্বস্তি ছড়াল দমচাপা ঘরটায়।

মেয়ের সামনে বসেছেন ভারতী,—হ্যাঁ রে, তোরা দিঘা গিয়েছিলি না?

—এই তো পরশু ফিরলাম। কালই আসতাম, যা বৃষ্টি...

—এবার যেন বর্ষা একটু বেশিই হচ্ছে। রাত নেই, দিন নেই...দিঘায় বৃষ্টি পেয়েছিলি?

—মাঝে মাঝে হচ্ছিল। বিদিশা ব্যাগ থেকে এক রাশ ঝিনুকের পর্দা বার করল,—কী, পছন্দ হয়?

—বাহ্, সুন্দর!...কত পড়ল রে?

—দাম জেনে কী হবে! তোমার জন্য এনেছি, ঘর সাজাবে, ব্যস চুকে গেল।

একের পর এক জিনিস বার করছে বিদিশা। যেন বিগ শপার নয়, রত্নগুহা। শঙ্খের ধূপদানি, সিগারেট হোল্ডার, ইয়া বড় কাজুবাদামের প্যাকেট, পাঞ্জাবিতে লাগানোর ঝিনুক বোতাম, আপেল বিচির ভ্যানিটি ব্যাগ, এমনকী একটা দক্ষিণাবর্ত শাঁখও বেরোল ঝোলা থেকে।

ভারতীর চোখ বড় বড়,—এত কিছু এনেছিস বুলু? এত?

—তাও তো মার্কেটিং করার সময়ই পেলাম না। আসার দিন সকালবেলা যা একটু...। বিদিশা গর্বিত মোরগের মতো ঘাড় ফোলাল,—তোমাদের জন্য একটা ফোল্ডিং মাদুরও আনার ইচ্ছা ছিল। অফসিজন তো, তেমন ভাল স্টক নেই।

ক্ষণপূর্বের ঈষৎ আড়ষ্ট ভারতী কিশোরীর মতো চপল সহসা। কোন জিনিস যে কোথায় রাখেন! একবার বসার জায়গায় ছুটছেন, তো একবার ছেলের ঘরে, ঘটাং ঘটাং আলমারি খুলছেন...। তারই মধ্যে ছুটলেন রান্নাঘরে, চচ্চড়ি নামাতে।

মার দৌড়োদৌড়ি দেখে বিদিশার বেশ মজা লাগছিল। ফুরফুরে মেজাজে আলগা চোখ বোলাচ্ছে ঘরে। আরও মলিন হয়েছে বাড়িটা, সর্বাঙ্গে দারিদ্র্য বড় প্রকট লাগে। পলেস্তারা ওঠা দেওয়াল, সিলিংয়ে চাবড়া ঝুলছে, যে কোনও মুহূর্তে খসে পড়বে, বিবর্ণ দরজা জানলা—প্রতি বারই এলে মনে হয় আগের বারের চেয়ে হীনতর দশা। কী করে যে এই হতশ্রী বাড়িতে সে চব্বিশটা বছর কাটিয়েছিল!

রান্নাঘর থেকে ভারতীর গলা উড়ে এল,—চা খাবি তো? বসিয়েছি।

—শুধু চা কিন্তু। আমার পেট একদম ভর্তি।

ঝটিতি দু হাতে ধূমায়িত পেয়ালা নিয়ে মেয়ের পাশে এসে বসলেন ভারতী,—হ্যাঁ রে, জামাই কি তোকে নামিয়ে দিয়ে গেল?

—না, সে অনেকক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছে। সেই আটটায়।

—তোদের নিলামঘর অত সকালে খোলে নাকি?

—খোলে না, আবার খোলেও। বিদিশা শাড়ি গুছিয়ে বাবু হয়ে বসল। ছোট্ট চুমুক দিল কাপে,—দু তিনটে দিন বেড়িয়ে কাটাল তো, এখন সে টাইমটাও কাজ করে উশুল করবে।

—ওভাবে বলছিস কেন? কাজের মানুষ হওয়া তো ভাল। ভারতী ভ্রূকুটি করলেন—তুই আবার এই নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করিস না তো?

—বয়ে গেছে। দিব্যি খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুমোচ্ছি, পার্লার যাচ্ছি, মার্কেট যাচ্ছি, তোফা আছি।

বিশদ চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন ভারতী। মেয়ের এই উপচে পড়া সুখ দেখে বুক ভরে যায় তাঁর। রূপ যৌবন তো অনেক মেয়ের থাকে, এমন কপাল হয় ক'জনের? বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরছিল মেয়ে, ঘাচাং করে এক গাড়ি এসে পাশে থামল, রূপো বাঁধানো ছড়ি হাতে নেমে এলেন বেয়াইমশাই! নাম কি তোমার মা? থাকো কোথায়? সতেরোর দুই মহিম হালদার লেন? ভবানীপুর? পূর্ণ সিনেমার কাছে? রোববার সকালে তোমার বাবা বাড়ি থাকবেন? মাত্র কুড়ি দিনের মধ্যে সানাই বাজল। এক পয়সা দেনাপাওনা নেই, ঘুরিয়ে পেঁচিয়েও সামান্যতম দাবিদাওয়া নেই, শুধু আপনাদের মেয়েটিকে চাই। ব্যস্ ঘুঁটেকুড়ুনির মেয়ে রাতারাতি রাজরানি বনে গেল। সল্টলেকে বিশাল প্রাসাদের মতো বাড়ি! গেট ঠেলে ঢুকতে গেলে গা ছমছম করে। ভারতীর অবশ্য প্রথম দিকে একটু মন খুঁতখুঁত ছিল। ছেলের সঙ্গে মেয়ের অনেকটাই বয়সের তফাত, প্রায় কুড়ি বছর! স্বামী, ছেলে, এমনকী মেয়ের পর্যন্ত আপত্তি নেই দেখে মুখ ফুটে কিছু আর বলেননি। এখন মনে হয় ভালই হয়েছে। শুধু ভাল কেন, তার থেকে অনেক অনেক বেশি কিছু। শাশুড়ি গত হয়েছেন বহুকাল, একটা মাত্র ননদের কবেই বিয়ে হয়ে গেছে, অমন বড়লোক শ্বশুর তবু কী দম্ভহীন, আর জামাই তো একেবারে হিরের টুকরো—সাত জন্ম তপস্যা করলে এমন ঘর পাওয়া যায়। এ যেন গল্পকথা। না না না, রূপকথা। রূপকথাই।

ভারতী মেয়ের গায়ে আলতো হাত বোলালেন। আঙুল খেলা করছে মেয়ের চুড়ি বালায়। হঠাৎ কী যেমন মনে পড়ে গেল। প্রশ্ন করলেন—তা হ্যাঁরে বুলু, জামাই নামিয়ে

দিয়ে যায়নি, তো তুই এলি কীসে?

—যাতে আসি। বাড়ির গাড়িতে। নেভি ব্লু মারুতিটায়।

—কই, বাইরে গাড়ি দেখলাম না তো?

—মোড়ের ও পাশে পার্ক করা আছে।

একটু যেন চিন্তিত হয়ে পড়লেন ভারতী,—এমা, ঘরে তো মিষ্টিমাস্টা কিছু নেই কাকে দিয়ে আনানো যায়?

—মিষ্টি কী হবে? আমি মিষ্টিফিষ্টি খাব না।

—আহ্, তোর জন্য বলছি নাকি? তোদের ড্রাইভারকে দিতে হবে না?

বিদিশা মুচকি হাসল,—ড্রাইভার কোথায়, গাড়ি তো আমি চালিয়ে এনেছি। ব্যাক করতে অসুবিধে হবে বলে বড় রাস্তায় রেখে দিয়েছি।

—সর্বনাশ! তুই আজকাল এত দূর গাড়ি চালাচ্ছিস নাকি?

—আমায় কী ভাবো বলো তো মা? আমার হাত এখন পুরো সেট। ভোরবেলা যা সাঁই সাঁই সল্টলেকে চক্কর মারি না...

—তাও এতটা রাস্তা তোমার একা একা আসা উচিত হয়নি।

—তাহলে আজও আসা হত না। রবি আজ ডুব মেরেছে। ...শ্বশুরমশাইই তো বললেন, কদ্দিন আর সল্টলেকে পাক খাবি? যা, আজ ভিড়ভাট্টায় হাত টেস্ট করে আয়। অ্যাক্সিডেন্ট করলে থানা থেকে খবর দিস, ছাড়িয়ে আনব।

ভারতী হেসে ফেললেন,—শ্বশুরও পেয়েছ বটে। যেমন উদার, তেমন রসিক। লাই দিয়ে দিয়ে তোমায় মাথায় তুলছেন।

—ওমা জানো না, এই নিয়ে দিদির সঙ্গে বাবার কত খুনসুটি হয়। বিদিশা হেসে লুটিয়ে পড়ল,—দিদি তো কথায় কথায় গাল ফোলায়। হ্যাঁ, আমি হচ্ছি তোমার ডাস্টবিন থেকে কুড়নো মেয়ে, বিদিশাই হল গিয়ে যাকে বলে কন্যা। বাবাও বলেন, ঠিকই তো, ঠিকই তো। ডাস্টবিন থেকে না হোক, হাসপাতাল থেকে তোকে এনেছিলাম তো বটেই।

—তোর ননদ আসে মাঝে মাঝে?

—ননদাই আসে খুব, দিদি আসে বড় জোর মাসে দু একবার।

—তোকে ভালবাসে?

—হাবে ভাবে তো মনে হয়। মনের ভেতরে কী আছে, কী করে বলব! এই তো পুজোর পরে দিল্লি রাজস্থান যাচ্ছে, আমাকে সঙ্গে যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করছিল।

—ভাল। ঘুরে আয়।

—ধুস, ওদের সঙ্গে কে যাবে। পুষনদাকে আমার একটুও পছন্দ হয় না। শুধু চালবাজি মার্কা কথা বলবে, মুখে রাজা উজির মারবে...ওদিকে জানো তো, ব্যবসার অবস্থা ঢু ঢু। অর্ডার নেই, কিছু নেই, ফ্যাক্টরির এখন আজ উঠে যায় কাল উঠে যায় দশা।

—কেন, তার ব্যবসা তো বেশ চালু ছিল।

—উঁহু, অনেক দিন ধরেই ফোঁপরা। চেপে চুপে রাখত, এখন প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বিদিশা চোখ ঘোরাল,—প্রেমের বিয়ে তো, বাবাও আগে অত কিছু খবর নেননি।

—প্রেমের বিয়ে? আগে বলিসনি তো?

—আমিও কি ছাই জানতাম। শ্বশুরমশাই আমায় সব মনের প্রাণের কথা বলেন তো, একদিন দুঃখ করছিলেন, তখনই...

—শ্বশুরমশাই বলেছেন? জামাই বলেনি?

—তোমার জামাই বাপের ঠিক উল্টো। পেটে একবার কোনও কথা ঢুকল, তো জমে বরফ হয়ে গেল।

পলকের জন্য দিঘার বৃষ্টিভেজা সন্ধেয় গাড়ির চালকের আসনে বসা অর্চিষ্মানের মুখটা মনে পড়ল বিদিশার। পুট করে একটা কথা ছুড়ে দিল অর্চিষ্মান, তার পরই চুপ। হোটেলে ফিরে আর ওই প্রসঙ্গেই গেল না, আবার বোতল খুলে বসে পড়ল। এত খাচ্ছ কেন, দিনে দু পেগ না তোমার লিমিট? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, আজ দিনটা অন্য রকম, আজ সুরা না হলে চলে! কীসে অন্যরকম? বৃষ্টির রাত, না অর্ক...জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয়নি বিদিশার। অর্চিষ্মান ঘুমিয়ে পড়ার পর অনেক রাতে একা একা দাঁড়িয়ে ছিল ব্যালকনিতে। বৃষ্টি থেমে গেছে, তবু চরাচরে কী নিবিড় অন্ধকার! সমুদ্রকে ভাল দেখা যাচ্ছে না, শুধু তার গর্জন শোনা যায়। জোয়ার এসে ডুবিয়ে দিয়েছে বেলাভূমি, ঠিক কোনখানটায় অর্কর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কী করে বুঝবে বিদিশা!

ধুস, যত সব ফালতু ভাবনা। অর্চিষ্মান তো পরদিন স্বাভাবিকই ছিল। ফেরার পথে গাড়ি চালাতে চালাতে কী হেঁড়ে গলায় গান ধরল অর্চিষ্মান। ভুল সব, ভুল কথা...মনে রেখো শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর... পাঁচজনেতে কথা কবে, তুমি রবে নিরুত্তর...! কী গিটকিরি ছাড়ছিল মাঝে মাঝে! হিহি।

ভারতী কাপ ডিশ রেখে ফিরে এলেন। সঙ্কুচিতভাবে বললেন,—বুলু, দুটো ভাত খেয়ে যাবি নাকি? আজ অবশ্য মাছ নেই, ডিমের ঝোল!

বিদিশা ঘড়ি দেখে তড়াং করে লাফিয়ে উঠল,—উরেব্বাস, এগারোটা বেজে গেছে। আজ বারোটায় ব্যাংক বন্ধ না?

—ব্যাংকে আবার তোর কী কাজ?

—এই চুড়ি কটা লকারে ঢুকিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

—তুই লকার নিয়েছিস? কবে?

—ওমা, বলিনি তোমায়? ও, তার পরে আর কবেই বা এলাম। বিদিশা এক সেকেন্ড হিসেব করে বলল,—তা ধরো, হপ্তা তিনেক হবে। তোমার জামাই জোর করে করিয়ে দিল। বাড়িতে গয়না রাখা ও একটুও পছন্দ করে না। ওই হতে দু-চার গাছা চুড়ি রইল, এক জোড়া বালা, একটা হয়তো পাতলা নেকলেস, ব্যস। বাকি সব ব্যাঙ্কের লকারে।

—আলাদা লকার করার কী দরকার ছিল? আগে তো সব শ্বশুরের লকারেই থাকত।

—শ্বশুরের মানে শ্বশুর আর শ্বশুরের ছেলের জয়েন্ট লকার। ওখানে তোমার জামাইও আর রাখতে চায় না, বাবাও না। যত দিন শাশুড়ির গয়না ছিল, তদ্দিন নয় ওখানে ছিল, এখন তো ওগুলো আমার! সুতরাং...। রাজেন্দ্রাণীর মতো হাসল বিদিশা। মায়ের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল,—তোমায় একদিন দেখাব সব। অজ্ঞান হয়ে যাবে। কত ভরি যে সোনা তার ঠিকঠিকানা নেই। তার সঙ্গে হিরে মুক্তো পান্না চুনি, কত রকম যে স্টোন...আমি সব কটার নামও জানি না।

—থাক, ওসব আর সাতকাহন করে বলতে হবে না।

বিদিশা মাকে জড়িয়ে ধরল,—তুমি মা এখনও...আরে বাবা, তোমার মেয়ে এখন রিচ লেডি। সে তার হকের ধনের কথা বিশ্বসুদ্ধ লোককে চেঁচিয়ে বলবে, তাতে কার বাপের কী?

—ওভাবে বলতে নেই রে। যা নিয়ে মানুষ গর্ব করে, তাই থেকেই মানুষের বিপদ আসে। হারিও না, ছড়িও না, যত্ন করে রেখো...

—সে তোমায় বলতে হবে না মা। ওসব হওয়ার জো নেই। তোমার জামাই হল গিয়ে ব্যবসাদার চূড়ামণি। হিসেবের গুরুঠাকুর। লকারের প্রতিটি গয়নার ফর্দ একেবারে তার কাছে মজুত। এই যে বারো গাছা চুড়ি রাখতে যাব, এও তার লিস্টে আছে।

কথা বলতে বলতে বলতে বিদিশা দরজায় এল। ভারতীও এসেছেন পিছন পিছন। অনুযোগের স্বরে বললেন—আজ নয় ব্যাঙ্কে নাই যেতিস। কদ্দিন পর এলি... খেয়েদেয়ে একটি গড়িয়ে নিলে তোর বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। আজ তো হাফডে, আজ ও তাড়াতাড়িই ফিরবে।

—উপায় নেই মা। দিনের দিন কথামতো কাজ না করলে তোমার জামাই চটে ফায়ার হয়ে যায়। আমি নয় নেক্সট উইকে একদিন আসবখন...সন্ধের দিকে...

আরেক বার কবজিঘড়িতে চোখ বুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল বিদিশা। কাল রাতেও প্রচুর ঢেলেছে আকাশ, মহিম হালদার লেনের এঁদো গলিতে জমাট জলকাদা। পিওর সিল্কের শাড়ি সামান্য উঠিয়ে নিয়ে সাবধানে হাঁটছে, দামি বিদেশি হাইহিলে কাদার ছোঁয়া বাঁচিয়ে। আশপাশের বাড়ির জানলায় বেশ কয়েকটা চোখ, বিদিশা টের পাচ্ছিল। কীটপতঙ্গের দল সব, ঈর্ষাকাতর প্রতিবেশী। দু একজন কি কেমন আছ গোছের আলাপও ছুড়ল, কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাদের পেরিয়ে এল বিদিশা।

মোড়ে এসে গাড়ির লক খুলতে গিয়ে থমকেছে। দাদা। দাঁত বার করে হাসতে হাসতে চায়ের দোকান থেকে উঠে আসছে।

—কী রে লেডি ডায়না, এসেই চললি যে?

—তুই আমাকে আসতে দেখেছিলি?

—উহুঁ, গাড়ি দেখে বুঝলাম।

চিত্রভানু একদম কাছে এসে দাঁড়াল। ধারাল উজ্জ্বল চেহারা। বেঁটেই বলা চলে, তবে গঠন চমৎকার। গায়ের রং লালচে ফর্সা, বোনেরই মতন। পরনে তাপ্পি মারা জিনস, গাঢ় হলুদ টি শার্ট। শ্যাম্পু করা ফাঁপানো চুল উড়ছে হাওয়ায়।

চাপা গলায় বলল,—কিছু মাল্লু না ছেড়েই কেটে পড়ছিস?

বিদিশা দরজা খুলে স্টিয়ারিং-এ বসল। ঘাড় হেলিয়ে বলল,—মাল্লু কীসের? এলেই তোকে নজরানা দিতে হবে নাকি?

—নয় দিলিই। তার জন্য তোর বাকিংহাম প্যালেস ভিখিরি হয়ে যাবে না।

যত্ত সব পিত্তি জ্বালানো কথাবার্তা। বাক্য ব্যয় না করে বিদিশা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলল,—কত?

—দে যা পারিস, পাঁচশো হাজার...

বিদিশা চটেও চটল না। ভাবলেশহীন মুখে বলল,—কী করবি?

—বিজনেসে ইনভেস্ট করব।

—কী বিজনেস?

—আছে একটা। হাই প্রফিট। কুইক রিটার্ন।

—ফোট, দেব না। বিদিশা গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল,—তোর হাই প্রফিট কুইক রিটার্ন মানে তো সাট্টা, নয় তাসের জুয়া।

—নারে, এবার সিরিয়াস কেস। গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ গলাল চিত্রভানু,—সত্যিকারের বিজনেস। হাজার দশ বারো হলেই ভাল হত। মিনিমাম থাউজেন্ড তো এখন লাগবেই। কিছু দে, বাকিটা অন্য কোথাও থেকে দেখছি।

চিত্রভানুর যাচনভঙ্গি এতই অকপট যে সত্যি মিথ্যে যাচাই করা অসম্ভব। কিন্তু নিজের এই পিঠোপিঠি দাদাটিকে হাড়ে হাড়ে চেনে বিদিশা। জানে, টাকাটা কোন খাদে বিলীন হয়ে যাবে। তবু একটু কোমল হল। ব্যাগ থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে বলল,—এই দিয়েই কাজ চালিয়ে নে।

বিদিশার ভ্যানিটি ব্যাগ কয়েক মুহূর্তের জন্য খোলা ছিল, বাজপাখির চোখে অন্দরটা দেখছিল চিত্রভানু। ব্যাগ বন্ধ হওয়ার আগেই শিকারি মাহরাঙার মতো খপ করে দু আঙুলে আরও কটা নোট তুলে নিয়েছে।

বিদিশা আগুন হয়ে গেল। রাস্তার মধ্যিখানে চেঁচাতেও পারছে না। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল,—তুই একই রকম নির্লজ্জ রয়ে গেলি। দু পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নেই, বোনের টাকা থেকে খামচা মারিস...

—খামচা মারাটাও রোজগার। তুই তোর বরের থেকে খামচা মারিস, আমি তোর থেকে খামচা মারছি। তোর মতো মেয়ে রাজবাড়ির সুখ ভোগ করছে, দাদাকে একটু ট্যাক্স দেবে না?

শুধু দৃষ্টি দিয়েই যদি মানুষকে ভস্ম করে দেওয়া যেত! বিদিশা রাগে কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। অনেক কষ্টে বলল,—বোনকেও তুই হিংসে করিস? তুই এত নীচে নেমে গেছিস? বাবা একা মুখের রক্ত তুলে খাটছে, তার কোনও সাহায্যে আসিস না, উল্টে ফুর্তির টাকার জন্য...

—চোপ। একটা কথা নয়। তুই বাবার কী সুসারটা করেছিস, শুনি? গেছিস তো বাবাকে ধসিয়ে দিয়ে। চিত্রভানুর কমনীয় মুখ বিকৃত হয়ে গেল,—জানিস তোর বিয়ের সময়ে বাবাকে কাবলিঅলার কাছ থেকে ধার করতে হয়েছে! কম নয়, পঞ্চাশ হাজার! পাঁচের পিঠে চারটে শূন্য। এখন আগা সাহেব সুদ নেওয়ার জন্য মাসপয়লায় বাবার অফিসে গিয়ে হানা দেয়। বাবার জন্য দরদ দেখাচ্ছিস তুই। হুঁহ্।

শ্বশুরমশাই তো শাঁখাসিঁদুরে মেয়ে নিতে চেয়েছিলেন, কে বাবাকে দেড় দু লাখ টাকা খরচ করার জন্য মাথায় দিব্যি দিয়েছিল? কেন বিশ ভরি সোনা নিয়েছে বাবা? কেন পাত পেড়ে সাড়ে তিনশো লোক খাইয়েছে? বিদিশা বলেছিল? হ্যাঁ, বিদিশার বাবা প্রভাকর দত্ত সেই বিরল প্রজাতির মানুষ, যারা সারা জীবন হতদরিদ্র অবস্থায় কাটিয়েও হঠাৎ হঠাৎ লুপ্ত বংশগরিমার দাপটে অন্ধ হয়ে যায়। এতে বিদিশা কী করবে? তাদের মতো

নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরে মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা ধার করাটাও এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়। তবে হ্যাঁ, কাবলিঅলাটা একটু বাড়াবাড়ি। বাবার সতর্ক থাকা উচিত ছিল।

চিত্রভানু এখনও গজরাচ্ছে,—আমি ফুর্তি মেরে বেড়াই, অ্যাঁ? আয়নায় নিজের মুখ দেখেছিস? রাজবাড়ির পালঙ্কে শুয়ে খুব পায়াভারী হয়েছে, অ্যাঁ? যখন বলব, তখনই টাকা ফেলবি। টুসকি বাজালেই টাকা ফেলবি। বুয়েচিস?

দাদার দিকে হিংস্র চোখে তাকাল বিদিশা। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল,—আমি আর কোনও দিন একটা পয়সাও দেব না।

—দেখব তোর কলজের জোর। আমার নামও চিত্রভানু, মনে রাখিস।

বিস্বাদ মুখে গাড়ি স্টার্ট করল বিদিশা। আকাশ একেবারে ঝুলকালি মাখা, এখনই বোধহয় কান্না শুরু করবে। আর ব্যাংকে যেতে ইচ্ছে করছে না। কাঁকুড়গাছিতে ব্যাংক, সে পথে গেলই না বিদিশা। বাইপাস ধরে সোজা সল্টলেক।

বাড়ির গেটে গাড়ি ঢোকানোর মুখে আকস্মিক বিপত্তি। একটা লোক হন্তদন্ত হয়ে বেরোচ্ছিল, লোকটা একেবারে বিদিশার গাড়ির সামনে পড়ে গেছে।

প্রচণ্ড জোরে ব্রেক কষল বিদিশা। চোখ বুজে ফেলল।

[তিন]

পলকের জন্য নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বিদিশার। ভয়ে ভয়ে চোখ খুলতেই ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। ঈশ্বরের অপার করুণা, চাকার তলায় পড়েনি লোকটা, জোর বেঁচে গেছে। লোকটার ঠিক ইঞ্চি ছয়েক আগে থমকেছে বিদিশার মারুতি।

ঘাবড়ে গিয়েছে লোকটাও। তার দু হাত বনেটে, আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে। হাঁপাচ্ছে বেচারা। বিশেষত্বহীন চেহারা, পোশাক আশাকে তেমন জৌলুস নেই। বয়সও খুব একটা বেশি নয়, জোর তিরিশ। মুখটা যেন কেমন চেনা চেনা! আগে কি দেখেছে বিদিশা?

স্টিয়ারিং-এ বসে বিদিশার এখনও হাত কাঁপছিল। হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস। চোট ফোট লাগেনি তো? একটু স্থিত হয়ে বিদিশা গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছিল, তার আগে লোকটা সরে গেল। কোনও বিরক্তি নেই মুখে, অভিযোগও না, বিনা বাক্যব্যয়ে চলে যাচ্ছে গেটের বাইরে।

ছি ছি, আর একটু হলে কী বিশ্রি কাণ্ডই না ঘটে যেত! একঝলক দোতলার দিকে তাকিয়ে নিল বিদিশা। শ্বশুরমশাই দেখে ফেলেননি তো? তাহলে একেবারে ঠাট্টায় ঠাট্টায় জেরবার করে ছাড়বেন। আজই প্রথম গাড়ি নিয়ে অদ্দূর বেরোল, আর আজই কিনা...! অর্চিষ্মানের কাছেও ঘটনাটা চেপে যেতে হবে। শুনে সে মোটেও আহ্লাদিত হবে না।

নাহ, এখনও হাত পা চোখ কানের মেলবন্ধন ঘটেনি। আরও প্র্যাকটিস করতে হবে বিদিশাকে, আরও। সন্তর্পণে গাড়ি গ্যারেজ করল বিদিশা। আঙুলে চাবি দোলাতে দোলাতে এগোল বাড়ির দিকে।

অর্চিষ্মানদের বাড়িটা সত্যিই বিশাল। সল্টলেকের একেবারে প্রথম দিককার বাড়ি, অনেকটা জায়গা জুড়ে। ঘেরা কম্পাউন্ড, সামনে সবুজ মসৃণ লন, এক দিকে ছোট্ট মতন

বাগান আছে, মালী এসে নিয়মিত পরিচর্যা করে যায়। চার পাঁচটা বড়সড় ফুলগাছও আছে। চাঁপা বকুল গন্ধরাজ অমলতাস...। বাড়ির মালিকরা থাকে দোতলায়, তাদের খাওয়া থেকে শুরু করে সবই হয় ওপরে। একতলায় বৈঠকখানা রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর, কাজের লোকদের থাকার জায়গা, গোটা তিনেক গেস্টরুম, আর সামনে পিছনে দু'খানা পেল্লাই টানা বারান্দা। বৈঠকখানাটিও প্রকাণ্ড, একটু সাবেকি ঢঙে সাজানো। ইয়া ইয়া সোফা, কার্পেট, সুদৃশ্য ঝাড়বাতি, বাহারি স্ট্যান্ডল্যাম্প; কারুকাজ করা আবলুশ কাঠের টেবিল, কাচের শো কেসে দুষ্প্রাপ্য চিনে মাটির পুতুল, লাইফসাইজ হরিণ... সবই বাড়ির বিশালত্বের সঙ্গে মানানসই।

বৈঠকখানায় আলগা উঁকি দিয়ে বিদিশা সিঁড়ির পথে, সামনে পদ্মপাণি। বিদিশাকে দেখে পদ্মপাণি এক গাল হাসল,—এত দেরি করলে বউদি? কর্তাবাবু না খেয়ে তোমার জন্য বসে আছেন...

মাঝবয়সি পদ্মপাণি এ বাড়ির পুরনো কাজের লোক। নামেই কাজের লোক, খবরদারিতে মালিকদেরও ছাপিয়ে যায়।

বিদিশা বিশেষ আমল না দিয়ে বলল,—বাবা জানেন আমার দেরি হবে।

সিঁড়িতে পা রেখেও কী মনে করে থামল বিদিশা,—পদ্মদা, লোকটা কে গো?

—কোন লোকটা?

—এই যে এই মাত্র বেরিয়ে গেল?

পদ্মপাণি টাক চুলকোল,—তপনবাবু?

—তপন...?

—হ্যাঁ, তপনই তো। ...ওই তো, আগে নিলামঘরে কাজ করত।

—এখন করে না?

—না। ছাঁটাই হয়ে গেছে।

—ও।

বিদিশা নিজের মনে মাথা দোলাল। এই জন্যই বুঝি চেনা চেনা লাগছিল! বছর দুয়েক হল দোকান রিমডেলিং করার সময়ে অনেক লোকজনকে বসিয়ে দিয়েছে অর্চিষ্মান, শুনেছে বিদিশা। ও তবে তাদেরই একজন। মাঝে মধ্যে এদের কেউ কেউ শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে। কেন আসে এরা? টাকাপয়সার ধান্দায়? তাইই হবে? শ্বশুরমশায়ের যা দরাজ দিল, নিশ্চয়ই খালি হাতে ফেরান না।

ঊর্ধ্বগামী বিদিশা হুকুম ছুড়ে দিল,—সুমতিকে ঝটপট খাবার লাগাতে বলো। আমি বাবাকে ডাকছি।

—তুমি চান করবে না বউদি?

ওফ, আবার বাড়তি কথা! বিদিশা মৃদু ধমক দিল,—যা বলছি তাই করো তো। আমার চান আমি বুঝব।

ওপরতলাটা দো-মহলা। অর্চিষ্মানরা থাকে উত্তর দিকে, দক্ষিণে দিননাথ। দক্ষিণের অর্ধবৃত্তাকার বারান্দাটি দিননাথের ভারী প্রিয়।

দোতলায় এসে ত্বরিত পায়ে আগে নিজের ঘরে গেল বিদিশা। হাতের ছয়-ছয় বারো

গাছা চুড়ি চালান করল আলমারির অন্তঃপুরে, পরে নিল এক জোড়া বালা। শাড়িটা বদলাবে বদলাবে করেও বদলাল না, বাথরুম ঘুরে এসেছে দক্ষিণ মহলে।

দিননাথ যথারীতি বারান্দায়, ইজিচেয়ারে। চোখ দুটি বোজা, বুকের ওপর ইংরিজি কাগজ, খোলা ডটপেন। ক্রসওয়ার্ড পাজল করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছেন?

বিদিশা কোমল স্বরে ডাকল,—বাবা?

দিননাথ চমকে তাকালেন,—ও তুই! এসে গেছিস?

—এখনও খাওনি কেন বাবা? তোমায় না বলে গেলাম আমার জন্য ওয়েট করবে না!

দিননাথ চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে দাঁড়ালেন। সস্নেহে বললেন,—ভাবলাম এসেই তো পড়বি, বাপ বেটিতে এক সঙ্গেই না হয়...

—এটা কিন্তু মোটেই ঠিক কাজ নয় বাবা। তোমার কি অনিয়ম করা উচিত? বয়স হচ্ছে না?

—অ্যাই মেয়ে, বেশি শাসন করবি না তো। তুই ধমকাবি, তোর বর ধমকাবে, এত বকুনি আমার সহ্য হবে না।

বিদিশা হেসে ফেলল,—ইস, তোমার ছেলের বদনাম করছ কেন? কখন বকে তোমায়?

—বকে না? ওর তাকানোটাই তো ফাউল। সেই কথায় আছে না...হুঁকোমুখো হ্যাংলা, বাড়ি তার বাংলা, মুখে তার হাসি নেই দেখেছ...

—সে তুমি তোমার ছেলেকে যেমন গড়েছ। বিদিশা পায়ে পায়ে ডাইনিং হলের দিকে এগোল।

—মোটেই না। ছেলে আমার মোটেই আগে এরকম ছিল না। দিননাথও চলেছেন সঙ্গে সঙ্গে,—তুই আমার ছেলেটাকে গোমড়ামুখো করে দিলি।

দিননাথের কথা বলার ধরনটাই এরকম। অন্তত বিদিশার সঙ্গে। কে বলবে শ্বশুর বউমার বাক্যালাপ চলছে! বিয়ের পর প্রথম প্রথম ভারী আড়ষ্ট ছিল বিদিশা, শ্বশুরের সঙ্গে তাল মেলাতে পারত না, ঠাট্টা তামাশার উত্তরে লাজুক লাজুক হাসত। এখন সেও দিব্যি সড়গড় হয়ে গেছে। দিননাথই মনের আড় ভেঙে দিয়েছেন। বিদিশাও বেশ বুঝে গেছে এই ভাবে কথা বলাটাই দিননাথ বেশি উপভোগ করেন। মায়া পড়ে গেছে মানুষটার ওপর। আহা, বড্ড একা। সেই কোন কালে বউ মারা গেছে, অর্চিষ্মান তখন নাকি মাত্র চার বছরের। সংসারে নারীর ছোঁয়া না থাকলে পুরুষমানুষ বড় কাঙাল হয়ে যায়। তাও দিদি যদ্দিন ছিল... তারও তো বিয়ে হয়ে গেছে অনেক কাল, ষোলো বছর। মাঝে নাকি বেশ খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন শ্বশুরমশাই, ওই পদ্মপাণিই গল্প করে। হয়তো বা বিদিশাকে এনে নিজেই আবার এভাবে সংসারে প্রাণ জাগাতে চাইছেন। নাহলে কোন শ্বশুর বলে, বউমা পরিচয়টা একদম ভুলে যা! বেটি বনে যা, স্রেফ বেটি!

সুমতি টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়েছে। ইলিশ মাছের ডিমভাজা, ইলিশের তেল, দই-ইলিশ, কাঁটা চচ্চড়ি... যাকে বলে ইলিশের একেবারে হদ্দমুদ্দ। সঙ্গে চাটনি আর বেনারসের ল্যাংড়া।

বেসিনে হাত ধুয়ে এসে চেয়ারে বসেছেন দিননাথ। ভাত ভাঙতে ভাঙতে

বললেন,—হ্যাঁ রে, তোর কাজ হল আজ?

বিদিশা দু দিকে মাথা নাড়ল,—কই আর হল। মার ওখানে যা দেরি হয়ে গেল...

দিননাথকে অল্প চিন্তিত দেখাল,—বাবলু রাগ করবে না?

—জানবে কী করে! বিদিশা মুখ টিপে হাসল,—চুড়িগুলো তুলে রেখেছি। সোমবার টুক করে গিয়ে লকারে দিয়ে আসব।

—বাবলু ঠিক টের পেয়ে যাবে।

—কী করে?

—তুইই বলে দিবি। মেয়েরা খুব পেটপাতলা হয়।

—আমার পেট থেকে সহজে কথা বেরোয় না।

দিননাথ আর কিছু বললেন না। বিদিশা লক্ষ করল শ্বশুরমশাই হঠাৎ যেন একটু অন্যমনস্ক। ইলিশের চওড়া পেটি খুঁটছেন, সেভাবে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছেন না।

হলটা কী শ্বশুরমশায়ের? শরীর গড়বড়? উঁহু, দেখে তো মনে হচ্ছে না। আধিব্যাধি তো কাছেই ঘেঁষে না মানুষটার। কী স্বাস্থ্য, বাবার চেয়ে অন্তত দশ বছরের বড়, কিন্তু একটুও বুড়োননি! নিয়মিত যোগব্যায়াম করেন, চামড়া এখনও টান টান, পেশি সবল, গাল ভরাট, পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চির মজবুত দেহকাণ্ড একেবারে পামগাছের মতো ঋজু। চুল পর্যন্ত পাকেনি, এখনও স্বচ্ছন্দে পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। আহারেও মানুষটা রীতিমত রাজসিক। খান কম, কিন্তু বেছে বেছে সেরা জিনিসটি খান, রসিয়ে রসিয়ে। সকালে তো নিজেই ভাল ইলিশ আনার জন্য পদ্মপাণিকে নির্দেশ ছুড়ছিলেন, পাতে বসে বীতস্পৃহ কেন?

বিদিশা জিজ্ঞাসা করল,—কী ভাবছ বাবা?

—কই, কিছু না তো!

—বললেই হল? এত ভাল টেস্টফুল ইলিশ... তুমি খাচ্ছ কই?

—আজ তেমন খিদে হয়নি রে।

—সে কী? কেন?

—সারাক্ষণ শুয়ে বসে আছি, কাজকর্ম নেই... আজ সকালে এক্সারসাইজটাও বাদ পড়ে গেল...

কেমন যেন দুঃখী দুঃখী গলা! বিদিশার বুক মমতায় ভরে গেল। এত শক্তসমর্থ মানুষ কাজ ছাড়া থাকলে বুঝি এমনটাই হয়। অর্চিষ্মানটা যেন কী! বাবাকে তো নিলামঘরের দায়িত্বটা দিয়ে রাখলেই পারে। দেবে না। তার এক কথা, বাবা সারা জীবন অনেক পরিশ্রম করেছে, নাউ হি নিডস এ হ্যাপি ডিসেন্ট রিটায়ার্ড লাইফ! ঘুরুক, ফিরুক, যেমন ভাবে খুশি লাইফটাকে এনজয় করুক। নো মোর খাটুনি! নো মোর টেনশান! আর নিলামঘরে তো বসাবই না! বাবা হল ওল্ড ভ্যালুজের মানুষ, দয়ার প্রাণ, হাসিমুখে বাবা বাছা করে কাজ ওঠাতে চায়, ওই বিজনেস ট্যাকটিকস অর্চিষ্মান রুদ্রর পোষাবে না। আশ্চর্য, শ্বশুরমশাই বিনা প্রতিবাদে মেনেও নিয়েছেন ব্যবস্থাটা, ছেলের হাতে ব্যবসা তুলে দিয়ে দিব্যি হাত উল্টে বসে আছেন! ছেলেকে জোর করেন না কেন?

থাক বাবা, বেশি দরদ দেখিয়ে কাজ কী! মানুষকে কিছু বিশ্বাস নেই, হয়তো উনিই

ভেবে বসবেন সাধের বউমা আবার শ্বশুরকে যাঁতাকলে ফেলার মতলব করছে! পুরুষদের জগতে অনুপ্রবেশ না করাই ভাল।

বিদিশা পরিবেশটাকে হালকা করতে চাইল। মুখে দিদিমণি দিদিমণি ভাব ফুটিয়ে বলল,—কেন ব্যায়ামটা বাদ পড়ল আজ জানতে পারি?

দিননাথ হাসলেন,—উঠতে দেরি হয়ে গেল যে।

—কেন দেরি হল?

—কাল ফিরতে অনেক রাত হল না..।

—কেন রাত হল?

দিননাথ হঠাৎ চোখ পাকালেন,—অ্যাই, তুই জানিস তো...

—জানি তো আমি সবই। তোমার ক্লাসিকাল ফাংশন। অমন ফাংশন না শুনলে কী হয়, যার জন্য শরীরের ওপর অত্যাচার হচ্ছে?

দিননাথ নাটুকে ভঙ্গিতে বললেন,—ওরে বেটি, তোর প্রাণে কি দয়ামায়া নেই? একটাই তো মাত্র নেশা, তাও তুই কেড়ে নিতে চাস?

—শুধু নেশা নয়, বলো যমনেশা। বিদিশা চোখ পাকাল,—মনে আছে, গত মাসে কী কাণ্ডটা করেছিলে?

—কী বল তো?

—সেই যে শ্রীরামপুরে কোন বন্ধুর বাড়ি গান শুনতে গেলে, সারারাত দেখা নেই, কী তুমুল বৃষ্টি, আমরা ভেবে ভেবে মরছি...

—ওহো, সেই দিন! দিননাথ ছোট্ট এক টুকরো আম মুখে পুরলেন,—সেদিন কী বিশাল আয়োজন! রশিদ খাঁ এসেছেন, পণ্ডিতজি এসেছেন, মল্‌হারের তান চলছে, সঙ্গে বৃষ্টির রিমঝিম... তুই থাকলে তুইও নড়তে পারতিস না।

সত্যি, খ্যাপা লোক বটে! কী যে মজা পান ওই সব গিটকিরিতে! বিদিশাকে লাখ টাকা দিলেও সে ওই আসরে গিয়ে বসবে না।

তারে না না করতে করতে আহার পর্ব শেষ। দিননাথ শুতে গেছেন, ঘরে এসে স্নানে ঢুকল বিদিশা। আজ বৃষ্টি নেই বটে, কিন্তু গুমোট খুব, গা একেবারে ঘেমে প্যাচপেচে। বাথটবে সুগন্ধি ছড়িয়ে বিদিশা জলে শুয়ে রইল অনেকক্ষণ। হাত পা ডলল, শ্যাম্পু করল, ফেনা নিয়ে খেলল...। ইটালিয়ান মার্বেল মোড়া এই ঘরটায় ঢুকলে আর যেন বেরোতেই ইচ্ছে করে না! মহিম হালদার লেনের বাড়িতে কী এঁদো একটা কলঘরে ছ্যাকরা ছ্যাকরা করে গায়ে জল ঢেলে স্নান করত বিদিশা! উফ, দুঃস্বপ্ন!

বাথরুম থেকে বিদিশা বেরোল প্রায় চারটেয়। গা পুরোপুরি মোছেনি, এতে বেশ আরাম হয়। ঢোলা একটা কাফতান চড়িয়ে নিল গায়ে, আয়নার সামনে বসে ড্রায়ারে চুল শুকোচ্ছে। ফরফর করছে হাওয়া, উড়ছে চুল. এও সুখ। হঠাৎই দাদার কথা মনে পড়ল. সত্যিই কি কাবুলিঅলার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে বাবা? দাদার চপও তো হতে পারে।

ঝট করে ড্রেসিংটেবিল থেকে কর্ডলেসটা তুলল বিদিশা। টিপ টিপ করে ভায়াল টিপছে। রিং হয়েই যাচ্ছে বাবার অফিসে, কেউ ধরে না কেন? ধুৎ, আজ শনিবার তো,

ছুটি হয়ে গেছে।

বিদিশা দু চার সেকেন্ড থম। তারপর নিজের মনে ঠোঁট উল্টোল। ফোনে বাবাকে পেলেই বা হতটা কি? বাবা থোড়াই স্বীকার করত। মরুক গে যাক, নিলে নিয়েছে। মেয়ের জন্যই তো নিয়েছে। কিন্তু দাদাকে আর একটি পয়সাও নয়। প্রমিস প্রমিস প্রমিস।

তৃপ্ত মুখে উত্তরের বারান্দায় এল বিদিশা। বেতের দোলনায় দুলছে মৃদু মৃদু। মেঘেরা আবার দখল নিয়েছে আকাশের, বৃষ্টি পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। পিছন দিকের চাঁপা গাছ থেকে গন্ধ ভেসে আসছে। মিষ্টি, উগ্র সুরভি। নেশা নেশা লাগছে, বিদিশার চোখ জড়িয়ে এল।

তখনই কোলের কর্ডলেস টেলিফোনটা বেজে উঠেছে। সহসা।

ধড়মড়িয়ে চোখ খুলল বিদিশা। রিসিভার কানে চাপল,—হ্যালো?

ক্ষণিক নৈঃশব্দ্য। তারপরই ও প্রান্তে একটা হিম হিম গলা—সুখে আছ, বিদিশা?

[চার]

বিদিশার ঘুম ঘুম ভাব ছিঁড়ে গেল, কে রে বাবা?

টেলিফোনে আবার স্বর বাজল,—চিনতে পারলে না?

—না! কে আপনি?

—আপনি নয়, তুমি। আমরা একদিন পরস্পরকে তুমিই বলতাম।

বিদিশার কপালে ভাঁজ। অর্কর গলা কি? একবার বিদিশার দর্শন পেয়েই...? জ্বালাতন!

নির্লিপ্ত স্বরে বিদিশা বলল,—হতে পারে। আমি বুঝতে পারছি না।

—ভুলেই গেলে? খোঁড়ো, খোঁড়ো নিজেকে।

বেশ কায়দা করে কথা বলে দেখি! উঁহু, এ তো অর্ক নয়। দু' দিন আগেই যার সঙ্গে অত কথা হল, সে এমন হেঁয়ালি করতে যাবে কেন? টেলিফোনে অবশ্য অর্কর কণ্ঠ কখনও শোনেনি বিদিশা। অর্কর স্বরও ভারী বটে, কিন্তু যে এ যেন একটু অন্য রকম! বড় বেশি ধাতব! তাছাড়া অর্ক তার নাম্বার পাবেই বা কোত্থেকে? যদি নাম্বার থাকত, তা হলে তো আগেই...!

অস্বস্তি কাটাতে এবার সামান্য ঝেঁঝে উঠল বিদিশা,—দ্যাখো, আমার অত ফালতু সময় নেই। নাম বলতে হয় বল, নইলে রাখছি।

—নাম? নামে কী হবে বিদিশা?

—তা হলে থাক।

বিদিশা কট করে ফোন কেটে দিল। চোখ বন্ধ করে ভাবল কয়েক সেকেন্ড। উড়ো ফোন? কোনও ত্যাঁদোড় লোকের বজ্জাতি? আন্দাজে আন্দাজে একটা নম্বর ঘুরিয়ে মেয়ের গলা পেয়ে ফাজলামি করছে? উঁহু, বিদিশার নাম জানবে কী করে? তাহলে আর কে হতে পারে? মিহির...? ভাস্কর...? ধুৎ, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তো কবেই চুকে বুকে

গেছে!

আবার ফোন বেজে উঠল।

অজান্তেই গাটা ছমছম করে উঠল বিদিশার। আড়ষ্টভাবে রিসিভার কানে চেপেছে।

—পরিচয় না দিলে আমি কথা বলব না।

—হুঁউ?...ধরে নাও তোমার একশো আটটা প্রেমিকের একজন।

—মানে?

—মানে বলতে হবে? বিয়ের আগে কোথায় কী কী কীর্তি করেছ মনে নেই?

—একদম আজেবাজে কথা বলবেন না।

—বাহ বাহ, বিয়ের পর খুব সতী বনে গেছ দেখছি। কী করছ এখন, অ্যাঁ? এসি চালিয়ে বিছানায় গড়াগড়ি খেতে খেতে বরের ধ্যান করছ?

—যাই করি না কেন, আপনার কী? বিদিশা অসহিষ্ণু হল,—আপনি আমায় ডিস্টার্ব করছেন কেন?

—আমার একটা কথা ছিল।

—কী কথা?

—বিয়ের আগে এতগুলো ছেলেকে যে ল্যাঙ মারলে, তার খেসারত দিতে হবে না?

—কী খেসারত? বিদিশার গলা দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল কথাটা।

—আপাতত পঞ্চাশ হাজার!

—টাকা?

—নয় তো কী, চুমু? ও তোমার বরের জন্যই তোলা থাক। আমি টাকা পেলেই খুশি। লোকটা খ্যাক খ্যাক হাসল।

বিদিশার ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। চেঁচিয়ে উঠল প্রায়,—ভেবেছেন কী, মগের মুলুক? উল্টোপাল্টা বলে ভয় দেখাচ্ছেন?

—ধরে নাও তাই। আই ওয়ান্ট দ্যাট মানি। ওই ক'টা টাকা তো এখন তোমার হাতের ময়লা!

—চোপ।

বিদিশা আবার লাইন কেটে দিল। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। সুস্থিতভাবে চিন্তা শুরু করার আগেই আবার সরব হয়েছে কর্ডলেস।

সঙ্গে সঙ্গে বোতামটা টিপল না বিদিশা। হাতে ধরা রিসিভারের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। একবার বাজল, দু বার বাজল, তিন বার বাজছে, চার বার...উফ, এত জোরে বাজে কেন? বেশ কয়েক বার বাজার পর থেমে গেল, আবার বাজছে।

অতিষ্ঠ হয়ে ফোন তুলল বিদিশা। কড়া গলায় ধমকাতে যাচ্ছিল, তার আগেই ও প্রান্তের স্বর ঝাপটে এল,—তোমার সাহস তো কম নয়! বার বার লাইন কেটে দিচ্ছ কেন?

বিদিশার গলা কেঁপে গেল,—কেন এরকম করছেন বলুন তো?

ভারী গলা হঠাৎ বরফের মতো শীতল,—বললাম তো, টাকা চাই।

—কেন টাকা দেব আপনাকে? মিছিমিছি চাইলেই হল?

—আমি কিন্তু সব কথা ফাঁস করে দিতে পারি। আমার কাছে সমস্ত প্রমাণ আছে।

—কী প্রমাণ?

—সে তোমার বরের হাতেই তুলে দেব। নাকি তোমার ভালমানুষ শ্বশুরের হাতে দেব, যিনি তোমায় আহ্লাদ করে বউ করে নিয়ে গেছেন? কোনটা বেশি ভাল হবে?

—আপনি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন? জানেন আমি পুলিশে খবর দিতে পারি?

—দাও। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোবে। দু এক সেকেন্ড থেমে থেকে আবার স্বর ফুটল,—একদম বাড়াবাড়ি কোরো না। নিজের ভাল যদি চাও তো সুড়সুড় করে টাকাটা দিয়ে দেবে। কখন কীভাবে দেবে, আমি তোমায় জানিয়ে দেব।

এবার ওদিক থেকেই কেটে গেছে ফোন। রিসিভারে একটানা ঝিঁঝিঁপোকার ডাক। অসাড় হাতে টেলিফোন কোলে নামিয়ে রাখল বিদিশা। তাকাতেও সাহস হচ্ছে না, মনে হচ্ছে বুঝি বেজে উঠবে এক্ষুনি। হয়তো আরও কিছু ভয়ঙ্কর কথা বলবে, হয়তো আরও ঠাণ্ডা স্বরে শাসাবে। বিদিশা দোলনা থেকে নামার চেষ্টা করল। পা টলে গেল, হাঁটুর জোর যেন কমে গেছে হঠাৎ। কে তার এই অবিমিশ্র সুখের জীবনে আগুন লাগাতে চাইছে? কী জানে সে? কতটা জানে?

টেলিফোনের প্রতিটি বাক্যবন্ধকে মনে করার চেষ্টা করল বিদিশা।... কী কীর্তি করে বেড়িয়েছ, জানি না!...সব ফাঁস করে দেব!...ভাষা ভাষা কথা না সব? কেউ কি টোকা দিয়ে বাজিয়ে দেখতে চাইছে তাকে? যদি ভুলেও কারুর নাম করে ফেলত বিদিশা, তা হলে তাই নিয়ে...? কেউ প্র্যাক্টিকাল জোক করছিল না তো? অর্চিষ্মানের জামাইবাবুর চাষাড়ে রসিকতা করার শখ আছে, সে'ই মজা করছিল না তো বিদিশার সঙ্গে? চান্স কম। পূষনদা কি জানে না, ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে কী বিশ্রী কাণ্ড হবে? অর্চিষ্মানের সঙ্গে পূষনদার মোটেই সুসম্পর্ক নেই, এমন গাড়োয়ানি রংতামাশা অর্চিষ্মান মোটেই বরদাস্ত করবে না।

আর কে হতে পারে? দাদা? শাসিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু নিজের বোনকে এভাবে...! দাদা সব পারে, কোনও গুণেরই ঘাট নেই তার। নেশা ভাঙ মদ জুয়ার জন্য ঘরের জিনিস পর্যন্ত বেচে দিয়ে আসে, সঙ্গীসাথিগুলো লোফারস্য লোফার...তবু যেন বিশ্বাস করতে মন চায় না। মুখে দশ বারো হাজারের আওয়াজ তুললেও দাদার চাহিদা পাঁচশো হাজারের বেশি নয়, পঞ্চাশ হাজার উচ্চারণ করতেই দাদা ভিরমি খাবে।

তবে কি অর্কই? কিন্তু গলাটা যে মিলছে না। রিসিভারের মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কথা বললে গলা নাকি অন্য রকম শোনায়। দিঘাতেই অর্ককে যথেষ্ট আহত মনে হয়েছিল, ফিরে এসেই কি তার প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠল? কথায় কথায় বলেছিল না, অর্চিষ্মানকে প্রেমপত্রগুলো উপহার দেবে? ফোন নাম্বার পেল কী করে? ডিরেক্টরি দেখে? সে অবশ্য নিলামঘর থেকেই জোগাড় করতে পারে। অর্চিষ্মানের কার্ডে এ বাড়ির দুটো নম্বরই ছাপা আছে। শ্বশুরমশায়ের ঘরে কি ফোন করেছিল আগে? তারপর বুঝে গিয়ে এখানে...! চাকরি বাকরি জুটছে না বলে একবারে মোটা কোপ মারতে চায় অর্ক?

দরজায় ছায়া।

বিদিশা চমকে তাকাল,—কে?

—আমি বউদি। সুমতি।

—ও।...কী চাই?

—চা হয়ে গেছে। এখানেই কি দিয়ে যাব, না হলঘরে যাবে?

সরু চোখে সুমতিকে দেখল বিদিশা। কতক্ষণ এসেছে দরজায়? এত নিঃসাড়ে দাঁড়িয়েছিল কেন? কিছু শোনেনি তো?

প্রাণপণে বিদিশা গলা স্বাভাবিক বলল,—বাবা উঠে পড়েছেন?

—হ্যাঁ। উনিই তোমায় ডাকতে পাঠালেন।

—যাচ্ছি। যাও।

দ্রুত ঘরে এল বিদিশা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আলগা চিরুনি চালাল চুলে, কাঁপা কাঁপা হাতে। এখনও তার নাড়ির গতি স্বাভাবিক হয়নি। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে নিজের হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি। লাবডুব। লাবডুব। বড় করে নিশ্বাস ভরে নিল ফুসফুসে, ছাড়ছে ধীরে ধীরে। আবার নিল, আবার ছাড়ল। কর্ডলেস ফোনটা হাতে নিয়েই হলঘরে এসেছে।

দিননাথ টেবিলে বসে, হাতে ধূমায়িত কাপ। বিদিশাকে দেখে হাসলেন,—কীরে, টেলিফোন হাতে নিয়েই ঘুরছিস যে? কারুর সঙ্গে কথা বলবি বুঝি?

বিদিশা হকচকিয়ে যন্ত্রটা রাখল টেবিলে,—না...এমনিই...

—ঘুমোচ্ছিলি নাকি? তোর টিভির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল না তো?

—চালাইনি আজ।

—মুখটা শুকনো লাগছে কেন? শরীর খারাপ?

—তেমন কিছু নয়। বিদিশা ঠোঁটে হাসি আনল,—মাথাটা একটু ধরেছে।

—ওষুধ খেয়েছিস?

—লাগবে না। বিদিশা সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করল,—বিকেলে আজ তোমার কী প্রোগ্রাম?

—আমার তো বাঁধা গৎ। স্টেডিয়াম অবধি হাঁটতে হাঁটতে যাব, ফেরার পথে একবার কর্নেল লাহিড়ির বাড়ি ঢুঁ মারব, খেলব এক দু দান, ব্যাক।

কর্নেল লাহিড়ির গল্প অনেক শুনেছে বিদিশা। দিননাথের সমবয়সী, বছর দুয়েক হল স্ত্রী মারা গেছেন, একমাত্র ছেলে আমেরিকায় থাকে, বেশ বড়সড় এক বাড়িতে এখন ভারী নিঃসঙ্গ জীবন কাটান ভদ্রলোক। বিশেষ একটা বেরোন না, সঙ্গী না জুটলে একা একাই দু দিকে গুটি সাজিয়ে দাবা খেলেন। দিননাথ গেলে খুব খুশি হন, দাবার বোর্ড ছেড়ে দিননাথকে উঠতেই দিতে চান না।

মাঝেমধ্যেই দুই বৃদ্ধের দাবা খেলার গল্প নিয়ে টিপ্পনি কাটে বিদিশা, আজ কথাটা খেয়ালই করল না, অন্যমনস্ক ভাবে বলল,—বৃষ্টি পড়ছিল, ছাতা নিয়ে বেরিয়ো।

—হ্যাঁ রে বেটি, সে খেয়াল আমার আছে। তুই বেরবি কোথাও?

—কোথায় যাব?

—কেন, যেখানে ফি শনিবার যাস। তোর বিউটি পার্লার?

—আজ যাব না।

বাইরে চেনা হর্নের শব্দ। দুজনেই উৎকর্ণ সহসা। সুমতি হলঘরেই দাঁড়িয়েছিল, ছুটে

গেছে জানলায়,—ওমা, দাদাবাবু ফিরলেন যে!

কথায় কথায় বিদিশার বুকের কাঁপন সামান্য কমেছিল, ধক ধক করে উঠল। আজই কেন তাড়াতাড়ি ফিরল অর্চিষ্মান? এ কি কোনও অমঙ্গলের পূর্বাভাস?

হাশ্ পাপিজ্ জুতোয় মশ মশ শব্দ তুলে অর্চিষ্মান উঠে আসছে। দিননাথ প্রশ্ন ছুড়লেন,—কী রে বাবলু, তোরও আজ মাথা ধরল নাকি?

কপালে ভাঁজ ফেলে অর্চিষ্মান চেয়ার টেনে বসল,—সত্যিই মাথা ধরেছে। এক কাপ চা দাও তো।

বিদিশা হাতে টিপট তুলল,—কিছু খাবে?

—নাহ।

দিননাথ ছেলেকে দেখছিলেন। বললেন,—মুখ এত কালো কেন বাবলু? এনি প্রবলেম?

—প্রবলেম তো বটেই। অর্চিষ্মান রুক্ষস্বরে বলল,—নিলামঘরে চুরি হয়ে গেছে।

—সে কী? কখন?

—প্রোব্যাবলি কাল রাত্তিরে। পেছনের কোল্যাপসিবল গেটটা ভেঙে...

—পুলিশে খবর দিয়েছিস?

—তাদের পেছনেই তো সারাটা দিন গেল আজ। তিনবার করে এল দোকানে, এটা দেখছে, ওটা দেখছে...কাজের কাজ কিছু নেই, অল রাবিশ!

—গেছে কী কী?

—তেমন কিছু অবশ্য যায়নি। মালপত্র সব ঠিক আছে। বড় আলমারিটা ভেঙেছে, সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ড্রয়ারগুলো, ক্যাশের সিন্দুকটা আর একদম পেছনের একটা আলমারি।...ওটা অবশ্য বাতিল অবস্থায় পড়ে ছিল।

—কত টাকা ছিল, সিন্দুকে?

—বেশি নয় হাজার দেড়েক মতন। আর আলমারিতে হাজার খানেক। ভাগ্যিস আমি দোকানে হার্ড ক্যাশ রাখি না।

দিননাথ উত্তেজিত মুখে বললেন,—দারোয়ানগুলো ছিল কোথায়?

—গড নোজ। হয়তো নেশা করে ঘুমোচ্ছিল। হয়তো দোকানে ছিলই না, সারা রাত কোথাও ফূর্তি করতে গেছিল। অর্চিষ্মান গজগজ করে উঠল,—এত অপদার্থ যে বার্গলারি ডিটেক্ট করার পরও বাবুদের আমায় ফোন করার হুঁশ হয়নি! কী, না কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ক্যান ইউ ইমাজিন দিস সর্ট অব নেগলিজেন্স? সব কটাকে ঘাড় ধরে তাড়াব আমি।

দিননাথ একটুক্ষণ চুপ। তারপর বললেন,—তোকে আমি কত দিন ধরে বলছি, দিনকাল ভাল নয়, প্রাইভেট সিকিউরিটি অ্যাপয়েন্ট কর...

—এবার তাই করতে হবে।

—পুলিশ দারোয়ানদের জেরা করেনি?

—করেছে। রুটিন জেরা। তারাও রুটিনমাফিক জবাব দিয়েছে।

—ইনসিওরেন্সে জানিয়েছিস?

—হ্যাঁ। ইন্সপেক্ট করে গেছে।

—আমি কি লালবাজারে একটা ফোন করব? মুস্তাফিকে বোধহয় এখনও পেতে পারি।

—থাক। তেমন কিছু তো যায়নি, ডিসিকে আর উত্যক্ত করে লাভ কী!

—যা ভাল বোঝ। দিননাথ উঠে পড়লেন,—আমি সাঁইত্রিশ বছর ওই দোকান চালিয়েছি। একটা মাত্র চুরির ইন্সিডেন্ট ঘটেছিল। তাও শীতের সময়ে। তখন ওই পেছনে কোলাপসিবল্ গেটের সিস্টেমটা করেছিলাম।

—প্লিজ স্টপ দ্যাট ওল্ট স্টোরি বাবা। আমার ভাল লাগছে না।

অর্চিষ্মান চা শেষ করেই ঘরে চলে গেল। পিছন পিছন এসেছে বিদিশাও, প্রায় ছুটতে ছুটতে। অর্চিষ্মানের এখন মেজাজ গরম; প্রতিটি জিনিস হাতের কাছে জুগিয়ে যেতে হবে।

সন্ধের পর ভাল মতোই বৃষ্টি নামল। ঝমঝম শব্দ হচ্ছে একটানা। একঘেয়ে। দিননাথ আর বেরোননি, ঘরে বসে টিভি দেখছেন। অর্চিষ্মান বাইরের পোশাক ছেড়ে ফেলে পাজামা পাঞ্জাবিতে বদলে নিয়েছে নিজেকে, খানিকক্ষণ গিয়ে বসে রইল বারান্দার দোলনায়, দুম করে উঠে পর পর নিজস্ব সেলুলারে কটা ফোন করল, ব্রিফকেস খুলে কী সব কাগজপত্র ঘাঁটল কিছুক্ষণ, তার পরই গ্লাস বোতল নিয়ে বসে পড়েছে। এমন অস্থির অর্চিষ্মানের সঙ্গে কথা বলার সাহস হয় না বিদিশার। তার ওপর দুপুরের ফোনটা গায়ে কাদার মতো লেগে রয়েছে। আজ ফোনও আসছে ঘন ঘন, ধরতে ভরসা পাচ্ছে না বিদিশা। একটুক্ষণ অর্চিষ্মানের কাছাকাছি থেকে সুড়ুৎ করে নীচে রান্নাঘরে চলে গেল।

রাত্রে খাওয়াদাওয়াও তাড়াতাড়ি হয়ে গেল আজ। দিননাথ এসি ঘরে শোন না, তাঁর ঘরে মশারি টাঙিয়ে দিয়ে এল বিদিশা। নিজের মহলে ফিরল যখন, আবার বোতল খুলে বসেছে অর্চিষ্মান। সে বড় মাপা মানুষ, রোজ দু পেগ বরাদ্দ। চিত্তবিক্ষেপ ঘটেছে আজ, বেশিই খাবে। তাকে না ঘাঁটিয়ে বিদিশা বিছানায় চলে এল।

চোখ বুজে ফোনটার কথাই ভাবছিল বিদিশা। অর্চিষ্মানের গলা শুনতে পেল,—ঘুমিয়ে পড়লে?

বিদিশা স্বামীর দিকে ফিরল,—না। কেন?

—কেসটা কী বল তো?

—কী কেস? বিদিশা আমূল কেঁপে উঠল।

—অর্চিষ্মান চুলে আঙুল চালাল—দোকানে চুরিটা ভারী অদ্ভুত হয়েছে। কত দামি দামি মাল ছিল, কিছু নেয়নি। টাকাপয়সাও না। শুধু সব তছনছ করে দিয়ে গেল।...

—আশ্চর্য।

[পাঁচ]

সারা রাত ভাল ঘুম হল না বিদিশার। তন্দ্রা আসছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে, চমকে চমকে উঠে বসছে বিছানায়। পাশে অর্চিষ্মান গভীর নিদ্রায়, পানের মাত্রা আজ একটু বেশিই হয়ে গেছে তাঁর, নীলাভ রাতবাতির আলোয় বিদিশা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল তাকে। সন্ত্রস্ত

চোখে। আজ নয় নিলামঘরের চুরি নিয়ে অর্চিষ্মান চিন্তিত ছিল, বিদিশাকে ভাল করে লক্ষই করেনি, এমনকি বিদিশার শরীর নিয়েও নাড়াঘাঁটা করল না, কিন্তু কাল কী হবে? কিংবা পরশু? বিদিশার মুখ দেখে কিছুই কি টের পাবে না অর্চিষ্মান? মনে কোনও সন্দেহ জাগবে না? ঘনিষ্ঠতম মুহূর্তে বুকের চাপা উদ্বেগ লুকিয়ে রাখা বড় কঠিন।

টাকা চায় লোকটা! বিদিশা অত টাকা কোত্থেকে পাবে? পঞ্চাশ হাজার! অর্চিষ্মানের অজান্তে অত টাকা দেওয়া কি বিদিশার পক্ষে সম্ভব? না দিলে কি ফোনের লোকটা সত্যি সত্যি সব জানিয়ে দেবে অর্চিষ্মানকে? শুনে অর্চিষ্মান কী করবে? তাড়িয়ে দেবে বিদিশাকে? তারপর? এই বিলাস, এই প্রাচুর্য, এই ঐশ্বর্য, গুমোট শ্রাবণ রাতে হিম হিম শীতল ঘরে শুয়ে থাকার এই সুখ, সব সব মিলিয়ে যাবে মহাশূন্যে।

আবার সেই মহিম হালদার লেনের বাড়ি। ওই কুৎসিত দীনহীন পরিবেশ। পাড়াপড়শিরা হাসাহাসি করবে, বন্ধুবান্ধব ব্যঙ্গ ছুড়বে, সামনে আড়ালে কানাকানি করবে আত্মীয়স্বজন—ঘুঁটেকুড়ুনির রাজরানি হওয়া কপালে সইল না তো। মাগো! বিদিশা ভাবতেই পারে না।

আচ্ছা, বিদিশাই যদি অর্চিষ্মানকে সব খুলে বলে? কত জনের কথা বলবে? মিহির ভাস্কর অর্ক...

মিহিরের সঙ্গে বিদিশার কলেজের রাস্তায় আলাপ। বছর চারেক আগে। চেহারাপত্র তেমন একটা আহামরি না হলেও চমৎকার কথা বলতে পারত মিহির, তিন দিন বিদিশার পিছনে ঘুরেই তাকে জপিয়ে ফেলেছিল। সাদামাটা চাকরি করত, সেলসে। হরেকরকম ঘরগেরস্থালির জিনিস ফিরি করার কাজ। সামান্য মাইনে থেকেই বিদিশার জন্য খরচ করত দু হাতে। এই রেস্টুরেন্টে ঢুকছে, এই পারফিউম কিনে দিচ্ছে...। মিহিরের সঙ্গে বার তিনেক ডায়মন্ডহারবারও গেছে বিদিশা। কলেজের নাম করে সকালে বেরিয়ে সন্ধেয় ফেরা। মাঝে সারাটা দুপুর হোটেলের নিভৃতে দু'জনে...। বেশ উদ্দামে কেটেছিল দিনগুলো। বছর খানেক মতো টিকেও ছিল সম্পর্কটা। আরও নিখুঁত ভাবে বলতে গেলে চোদ্দ মাস। বিদিশা তার মধ্যেই বুঝে গেল মিহির বাকপটু বটে, কিন্তু নেহাতই ফোঁপরা। সারাটা জীবন কাঁধে ব্যাগ বয়ে বেড়ানো ছাড়া তার আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই। এমন একটা চিড়িয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিন কেন স্বেচ্ছায় কাটাবে বিদিশা?

ভাস্কর ছিল আরও ক্ষণস্থায়ী প্রেমিক। মিহিরেরও আগের। সেই যখন স্কুলে ইলেভেন টুয়েলভে পড়ত বিদিশা, সেই সময়ের। স্কুলগেটের উল্টোদিকে বাসস্টপের শেডের নীচে দাঁড়িয়ে থাকত ভাস্কর। কোনওদিন বা দলবল নিয়ে, বেশিরভাগ দিন একাই। নিত্যনতুন দামি দামি টি শার্ট পরত ভাস্কর, গলায় ঝুলত সোনার চেন, হাতে স্টিলের বালা। চেহারাও ছিল দারুণ ঝকমকে। টকটকে ফর্সা রং, টিকোলো নাক, ঈষৎ ঢুলুঢুলু চোখ, যেন স্বপ্নের রাজপুত্র। স্কুলফেরতা হাহা হিহি হাসির মাঝেই পরিচয়, তার পর স্কুল পালিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, গঙ্গার ঘাট, বোটানিকস। মাঝে দিন সাতেক ভাস্করের দর্শন না পেয়ে বিদিশার যখন বুক আনচান, তখনই খবর পেল ভাস্কর শ্রীঘরে ঢুকেছে। গাড়ি চুরির কেসে। এবং যেহেতু এই তার প্রথম শ্রীঘর বাস নয়, বেরোতে দেরি হবে। ভাস্করের সঙ্গে আর কস্মিনকালে দেখা হয়নি বিদিশার।

আরও একজন অবশ্য ছিল। আরও আগে। বিদিশা তখনও মাধ্যমিক দেয়নি। সেটা ঠিক প্রেম কিনা বিদিশা নিশ্চিত নয়। অরুণ নামের ছেলেটার কসমেটিকস আর ইমিটেশন গয়নার দোকান ছিল। যদুবাজারে। একটু হাসি, একটু কটাক্ষ, একটু হাত-ছোঁওয়া বাস, তাতেই মিলে যেত অনেক কিছু। লিপস্টিক নেলপালিশ চুড়ি দুল...। ভারী বোকাসোকা ছিল ছেলেটা, দোকানটা টিকিয়ে রাখতে পারেনি।

এ সব কাহিনী না বলে যদি শুধু অর্কর কথাই বলে বিদিশা? টেলিফোনের লোকটা অর্চিষ্মানকে সব কিছু শোনালেও বিদিশা তখন স্বচ্ছন্দে অনেকটাই হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে। এ কথা তো ঠিক ভাস্কর মিহিরদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ছিল শুধুই শারীরিক মোহ অথবা চাহিদা মেটানোর খেলা। একমাত্র অর্কর ওপরেই এক ধরনের মায়া পড়ে গিয়েছিল বিদিশার। অর্চিষ্মানের সঙ্গে বিয়েটা না হয়ে গেলে হয়তো অর্ককেই সে একদিন...

কিন্তু অর্ক এপিসোডই কি মেনে নিতে পারবে অর্চিষ্মান?

ভাবতে ভাবতেই রাত ভোর হয়ে গেল।

ঘুম থেকে উঠেই অর্চিষ্মান হুটোপুটি শুরু করে দিয়েছে। রবিবার তার সাপ্তাহিক নিলামের দিন, কোনও রকমে নাকে মুখে গুঁজে সাত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। তার পরও স্বস্তি নেই, চোরা আতঙ্কে কাঁটা হয়ে আছে বিদিশা। একতলায় নামতে সাহস হচ্ছে না, শ্বশুরমশায়ের ঘরে যেতেও পা সরে না, বাথরুমে গেলেও সঙ্গে হ্যান্ডসেট। টেলিফোন একটু ঝঙ্কার তুলল, তো ওমনি বুক হিম। এই বুঝি হানা দিল সেই ধাতব কণ্ঠস্বর।

দশটা নাগাদ পদ্মপাণির আবির্ভাব। ডাকছে,—বউদি, ও বউদি...বউদিমণি?

বিদিশা প্রথমটা শুনতে পায়নি। আয়নার সামনে বসে চুলের জট ছাড়াচ্ছিল। বার কয়েক ডাকার পর সাড়া দিল,— কী বলছ? ...এসো, ভেতরে এসো।

পদ্মপাণি পর্দা সরিয়ে দরজায় দাঁড়াল,—তুমি সেদিন দইমাছ রাঁধবে বলেছিলে না? ভাল কাতলা এনেছি আজ। মানদাকে বলেছি কাঁচা রেখে দিতে। তুমি কি একবার রান্নাঘরে আসবে?

—আজ? বিদিশা অন্যমনস্ক ভাবে বলল,—আজ থাক।

পদ্মপাণি সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল না। দাঁড়িয়েই আছে দরজায়।

বিদিশা ভুরু কুঁচকোল,—আর কিছু বলবে?

—না মানে...পদ্মপাণি আমতা আমতা করছে,—তুমি ঠিক আছ তো বউদি?

—মানে?

—না...বলছিলাম...সকালে তুমি কর্তাবাবুর সঙ্গে জলখাবার খেতে হলঘরে এলে না, সুমতি কফি নিয়ে এল, ভর্তি কাপ ঠাণ্ডা ফেরত নিয়ে চলে গেল...

বিদিশা সচকিত হল। বাড়ির কর্তাব্যক্তিরা ছোটখাটো অনেক কিছু নজর করে না, কিন্তু কাজের লোকদের দৃষ্টি এড়ানো সহজ নয়। এবং এদের মনে কোনও কৌতূহল হতে দেওয়াটাও বিপজ্জনক।

মুখে হাসি টেনে বলল,—নাগো, ঠিকই আছি। এমনিই...। কাল নিলামঘরে একটা

চুরি হয়ে গেল, তোমার দাদা অত দুশ্চিন্তা করছে...

—ওমা, ওই নিয়ে ভাবছ তুমি! পদ্মপাণি এক গাল হাসল,—ধন্যি বউ বাবা! ভগবান জোড়ও মিলিয়েছেন তোমাদের।

—বাহ্, তোমার দাদার টেনশান হলে আমি কী করে নিশ্চিন্ত থাকি?

—তা বটে।... তবে নিলামঘরের কর্মচারিদের অন্ন উঠে গেল। শুধু দারোয়ান নয়, দাদা সবাইকে তাড়াবে।

—সে কী কথা! কেন? অন্যরা কী দোষ করল?

—দাদা ওসব মানে না। বোঝে না। কে দোষ করল সেটা বড় কথা নয়, দুর্ঘটনাটা ঘটল এটাই আসল। সবাইকেই শাস্তি পেতে হবে। এটাই দাদার আইন।

বিদিশার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,—এ তো অন্যায় আইন। ভুল করলে এক আধবার তো ক্ষমা করে দেওয়াই যায়।

—ক্ষমা? ক্ষমা দাদা কাউকে করে না। সুমতির আগে যে মেয়েটা ছিল, সরস্বতী, সে আমাদের মালীর সঙ্গে খুব ফস্টিনস্টি করত। একদিনই দাদার চোখে পড়েছে, ব্যস সেদিনই চাকরি খতম! সরস্বতী পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছিল। দাদার এক কথা, শাঁখাসিঁদুর পরে পরপুরুষের সঙ্গে মাখামাখি? এ বাড়িতে ও সব চলবে না। মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

অজান্তেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল বিদিশার। পলকে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে দিঘা। ডায়াল এম ফর মার্ডারের গল্প শুনে কী রকম যেন শীতল হয়ে গিয়েছিল অর্চিষ্মান! 'বিবাহিত নারীর প্রেমিক'—এই ব্যাপারটাই বুঝি অর্চিষ্মান সহ্য করতে পারে না। অর্ককে যদি সেদিন অর্চিষ্মান দেখে থাকে, আর তার পরে যদি বিদিশা অর্কর কথা তাকে যেচে বলে...

বিদিশা আরও সিঁটিয়ে গেল। সিঁটিয়েই রইল দিনভর। চাপা ত্রাস নিয়ে শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া সারল, জোর করে হাসি ধরে রাখল মুখে। রাতে অর্চিষ্মান ফেরার পর অকারণে উচ্ছল হওয়ার চেষ্টা করল। ধুকপুক করছে বুক, অথচ ঠোঁটে গুনগুন গান, সে কী বিষম দশা!

দিনটা ইষ্টনাম জপ করতে করতে কেটে গেল।

পরদিন সকাল থেকে বিদিশার তথৈবচ দশা। কাল আসেনি ফোন, আজ যদি আসে? তবু দুরুদুরু বুকে বেরোল একবার, ড্রাইভার রবিকে নিয়ে। ব্যাঙ্কে চুড়িগুলো রেখে এল। গত দু দিন নিলামঘর নিয়ে অর্চিষ্মানের মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল দশা ছিল, ওই তুচ্ছ বিষয় মনে আসেনি, আজ যদি প্রসঙ্গ তোলে। অন্য দিন লকার খুলে গয়নাগুলো অনেকক্ষণ উলটে পালটে দেখে বিদিশা, দেখে দেখে প্রাণ যেন আর ভরে না, সোনা রুপো হিরে জহরতে শুধু হাত বোলানোতেই এত সুখ! আজ বিদিশা বন্ধ কক্ষে ঢুকল আর বেরোল। ফিরেই পদ্মপাণি মানদা সুমতির মুখের দিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন, কোনও ফোন এসেছিল কিনা এই নির্দোষ প্রশ্নটুকু করারও সাহস নেই। অথচ সে ভাল মতো জানে, দূরভাষের সেই কণ্ঠ আর কারুর সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী হবে না।

তা সেই ফোন অবশ্য সেদিনও এল না। তার পরের দিন না। তার পরদিনও না।

একটু একটু করে ছন্দে ফিরছে বিদিশা। বৃহস্পতিবার ভোরে বেরিয়ে পড়েছে গাড়ি নিয়ে, নিয়ম মতো চক্কর দিল সল্টলেকে। অল্প অল্প উদ্বেগ নিয়ে দুপুরে ভাতঘুমও দিল একটা।

পর দিন আরও স্বাভাবিক। দিব্যি হাহা হিহি করছে শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে, মানদাকে হটিয়ে স্বহস্তে চিংড়ি মাছের মালাইকারি রান্না করল, দুপুরে ঝাঁ করে ঘুরে এল বিউটি পার্লার। ফিরে অলস মেজাজে গড়াচ্ছে বিছানায়। ধ্যুৎ, কোত্থেকে কে এক উটকো লোক উড়ো ফোন করল, মিছিমিছি তার ভয়ে কটা দিন গুটিয়ে সুটিয়ে রইল, কোনও মানে হয়! উফ, দুঃস্বপ্ন! নির্ঘাত কেউ তার সঙ্গে মজা করছিল। বলে কিনা সব খবর জানি তোমার। হাহ্, কী জানিস তুই? জানিসই যদি তো খুলে বললি না কেন? শুধু ভাসা ভাসা কথা! হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা... আরে যাহ্, তুই আমার কচু করবি।

কিন্তু অমন নিষ্ঠুর মজাটাই বা করল কে?

শূন্য ঘরে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে আছে বিদিশা। ফাঁকা চোখে। এসি বন্ধ, জানলা হাট, মাথার ওপর পাখা ঘুরছে বনবন। নির্জন কক্ষে ঘুরন্ত পাখার শব্দময় নৈঃশব্দ্য। এমন নৈঃশব্দ্যে কেমন যেন গা ছমছম করে। বাইরে এক মেঘলা আকাশ, মনের মেঘও যেন সরছে না।

কী ভেবে উঠল বিদিশা, ড্রয়ার খুলে একটা ছোট্ট ডায়েরি বার করল। উল্টোচ্ছে পাতা, থামল এক জায়গায়। আছে, নম্বরটা আছে।

কর্ডলেস ফোন হাতে তুলে বিদিশা পুট পুট বোতাম টিপল,—হ্যালো, মহুয়া আছে?

—বলছি। কে?

—আমি রে। বিদিশা।

মহুয়া কয়েক সেকেন্ড চুপ। তারপর গলায় যথারীতি ব্যঙ্গ ফুটেছে,—তুই হঠাৎ! কী মনে করে?

—কেন, তোর খোঁজ নিতে নেই? মনে পড়ে, এর আগের বার আমিই ফোন করেছিলাম?

—সে তো এক যুগ আগে।

এক যুগ মানে সাড়ে পাঁচ মাস। বিদিশার বিয়ের ঠিক পর পর। মহুয়া আজকাল বিদিশার সঙ্গে এই ভাবেই কথা বলে।

ভার মুখে বিদিশা বলল,—নম্বর দিয়েছিলাম, আমাকেও তো একটু ফোন করতে পারতিস।

—পারতাম। তবে...

—কী তবে? থামলি কেন, বল।

—তোর এখন ব্যাপারই আলাদা রে ভাই। কত বড়লোকের বউ তুই, বন্ধুদের আর পাত্তা দিবি, কি দিবি না...হয়তো ডিসটার্বড হবি...

সেই পুরনো রাগ! না হিংসে?

বিদিশা মুখ বেঁকিয়ে হাসল,—ডায়ালগ ছাড়। আছিস কেমন বল।

—ভাল। ভালই।

—করছিস কী আজকাল?

—আমাদের যথা পূর্বং তথা পরং। চাকরির চেষ্টা চলছে, টাইপ শিখেছি, এখন কম্পিউটারের একটা কোর্স করছি...

—আর কোনও খবর নেই?

—আর কী খবর?

—তোর বিয়ের কদ্দূর?

—যে তিমিরে, সেই তিমিরে। মাঝে মাঝেই পাত্রপক্ষকে ইন্টারভিউ দিচ্ছি, তারা সব সিঙাড়া সন্দেশ খেয়ে পরে চিঠি লিখে জানাব বলে ভেগে যাচ্ছে...। মহুয়া একটু দম নিল,—আমি তো আর তোর মতো পটেশ্বরী নই যে শ্বশুর এসে কোলে করে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেবে!

বিদিশার পেট হাসিতে গুলগুল করে উঠল। হিংসের বহর দ্যাখো! সাধে কি বিধাতা তোকে কেলেকুষ্টি করে গড়েছিল।

হাসি চেপে বিদিশা বলল,—তুই দেখছি এখনও আমার ওপর চটে আছিস।

—আমি চটার কে? যা ভাল বুঝেছিস, করেছিস।

—বিশ্বাস কর, বিয়েটা এমন হঠাৎ ঘটে গেল, আমার কিছু করার ছিল না রে।

—থাক, বার বার এক কৈফিয়ত নয় নাই দিলি। সুখে আছিস, ভাল আছিস...

সময় মেপে নিশ্চুপ রইল বিদিশা। এত বেশিক্ষণ নয় যাতে মনে হয় ভেবে চিন্তে কথা বলছে, আবার এত কম সময়ও নয় যাতে অনুতপ্ত ভাবের ছলনাটা মহুয়ার কানে বাজে।

স্বরে একটা দুঃখী দুঃখী ভাব ফোটাল বিদিশা,—দূরের ঘাস সব সময়েই ঘন মনে হয় রে। কে দুঃখে আছে, কে সুখে আছে, অন্যে তার কী বোঝে?

প্রত্যাশা মতোই মহুয়ার স্বরে ঔৎসুক্য, এত পেয়েও তুই সুখী নোস?

যাক, টোপটা গিলেছে। আগের বার তো মহুয়া ভাল করে কথাই বলেনি। অবশ্য বিদিশাও সেবার একটু বেশি উচ্ছ্বাস দেখিয়েছিল।

বিদিশা সতর্ক হল। এখন গলায় কণামাত্র বেফাঁস তারল্য এলে চলবে না। মহা নেকু মেয়ে মহুয়া। অর্কর সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। আহ্লাদ করে এক সময়ে ভাইফোঁটা দিত অর্ককে, রাখি পরাত।

দুঃখী ভাবটাকে আরও ঘন করল বিদিশা—আর সুখ? কোথায় অর্ক, আর কোথায় আমার এই আধবুড়ো বর।

—আধবুড়ো তো কী আছে? টাকার পাহাড়ে শুয়ে আছিস...

—টাকাই কি সব রে? সবাই কি অর্কর মতো ভালবাসতে জানে? বিদিশা স্বরে এবার দু চামচ হাহাকার মিশিয়ে দিল,—কী মোহে যে পড়েছিলাম।

মহুয়ার কোনও সাড়াশব্দ নেই। বিদিশা বেশ টের পেল ধন্দে পড়ে গেছে মহুয়া।

এবার রিসিভারে শব্দ করে শ্বাস ফেলল বিদিশা। গলা অস্বাভাবিক খাদে নামাল,—কেমন আছে রে অর্ক?

—এখন তা জেনে তোর লাভ? মহুয়া একটু মোলায়েম যেন।

—না, তুই বল। আমাকে ওর কথা একটু বল।

—কী বলব? তোর বিয়ের পর দুটো মাস তো ঘর থেকেই বেরোত না, কারুর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলত না, তারপর আস্তে আস্তে...মাস দেড়েক আগে আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। এসপ্ল্যানেডে, ট্রাম গুমটির কাছে। তখনও কী অন্যমনস্ক। একটা দুটো কথা বলছে, উদাস হয়ে যাচ্ছে...কাজটা তুই ভাল করিসনি রে বিদিশা।

—বার বার বলিস না রে। নিজেকে এমন অপরাধী লাগে। বিদিশা ফোঁচ ফোঁচ নাক টানল। এখন সে অনেকটা নিশ্চিন্তও বটে, দিঘায় অর্কর সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কথা জানে না মহুয়া। গুটি গুটি এগোল বিদিশা,—অর্ক এখন আছে কোথায় রে? সেই মাসির বাড়িতেই?

—আপাতত।

—আপাতত কেন?

—শুনেছিলাম খুব শিগগিরই বোধহয় এখানকার পাট উঠিয়ে দেবে।

—কেন?

—রায়গঞ্জ ফিরে যাবে। বাবা মার কাছে। এখানে চাকরি বাকরি তো কিছু হল না, ওখানে গিয়ে এবার কী ব্যবসা ট্যাবসা করবে। ফুলদা বলছিল কোত্থেকে যেন মোটা টাকা পাবে অর্কদা...

—টাকা? বিদিশার গলা কেঁপে গেল,—কীসের টাকা?

—তা বলতে পারব না। ফুলদা গত রোববার আমাদের বাড়ি এসেছিল, বলছিল শুনছিলাম। ...অর্কদা নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

পঞ্চাশ হাজার। বিদিশার স্বর আটকে গেল।

টেলিফোন রেখে দিয়েও বিদিশার ঘোর কাটছিল না। অর্ক, তবে অর্কই! হতেও পারে। লোভ যে কখন মানুষকে কোন দিকে টানে। চিঠির কথা শুনে বিদিশা ক্ষণিকের জন্য কেঁপে উঠেছিল, দেখেছিল অর্ক। হয়তো তার পরই মতলবটা মাথায় এসেছে। ভাবল কী করে গলা বদলে শাসালেই বিদিশা সুড়সুড় করে টাকা বার করে দেবে?

অন্য একটা বিদিশা পিনপিন করে উঠল বিদিশার বুকে। অর্কর মন কি এত ছোট? ভয় দেখিয়ে প্রেমিকার কাছ থেকে টাকা হাতাবে অর্ক? বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হয় না।

আরেক বিদিশা বলল, হয়তো টাকা নেওয়াটা উপলক্ষ! এতদিন পর হয়তো প্রতিশোধস্পৃহা জেগে উঠেছে অর্কর! হতাশ মানুষ, বিফল মানুষ মরিয়া হয়ে গেলে কত নীচে নামতে পারে তার ঠিক কী?

কিন্তু একবার ফোন করে চেপে গেল কেন? দ্বিধায় পড়েছে? অপরাধবোধ এসেছে? নাকি নিষ্ঠুর ঠাট্টা করে বিদিশাকে বেতালা করে দিতে চায় অর্ক?

নাহ, ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়া দরকার।

[ছয়]

সকালে অর্চিষ্মান বেরিয়ে যেতেই বিদিশা সেজেগুজে তৈরি। সাজ মানে নিপুণ সাজহীন বেশ। সালোয়ার কামিজ নয়, ওয়াড্রোব ঘেঁটে সাধারণ একটা তাঁতের শাড়ি বার

করে পরেছে। স্বর্ণাভরণ খুলে রাখল, হাতে শুধু শাঁখা আর লোহা। আঙুলের হিরের আংটিটা শুধু প্রাণে ধরে খুলতে পারল না। থাক গে, ওটা হিরে না কাচ অর্ক থোড়াই বুঝবে। আয়না ছেড়ে ওঠার আগে কী ভেবে সিঁথির সিঁদুরটা আরেকটু গাঢ় করে দিল বিদিশা। এখন সে এক পরিপূর্ণ সাধ্বী স্ত্রী।

পায়ে পায়ে বিদিশা শ্বশুরের ঘরে এল,—বাবা, আমি একটু বেরোচ্ছি।

দিননাথ টিভিতে ডিসকভারি চ্যানেল দেখছিলেন। কত হরেক রকম প্রাণী কত বিচিত্র উপায়ে শিকার ধরে তারই জীবন্ত ছবি ফুটে উঠছে পর্দায়। ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন,—চললি কোথায়?

—এক বান্ধবীর বাড়ি।

—এখন? এই সকালে?

বিদিশা মুখটা করুণ করে বলল,—একটু আগে বন্ধুর ফোন এসেছিল। ওর মার অবস্থা খুব খারাপ।

—কী হয়েছে?

—স্ট্রোক মতো। কথা-টথা নাকি জড়িয়ে গেছে।

—হাসপাতালে দেয়নি?

—বলল তো বাড়িতেই রেখেছে। দেখি, একবার গিয়ে দেখে আসি।

—থাকে কোথায়?

—ওই হাতিবাগানে।

—যা, ঘুরে আয়।...সাবধানে গাড়ি চালাস।

—গাড়ি আমি নিচ্ছি না বাবা।

—কেন রে?

—অফিস টাইম, রাস্তায় বাসট্রামের ভিড়...সেদিন ভবানীপুর যেতে যা নার্ভাস লেগেছিল। এদিকটা তো আরও ক্লামজি।

—রবিকে নিয়ে যা তাহলে। রবি ডিউটিতে আসেনি?

—এসেছিল। ওকে তো তোমার ছেলে আজ অফিসে নিয়ে গেল। কোথায় যেন পাঠাবে দুপুরে।

—ও।...টাকাপয়সা সঙ্গে নিয়েছিস তো?

—হ্যাঁ, বাবা।

—দেরি হলে ফোন করে দিস। নইলে আমি কিন্তু ওয়েট করব।

—আচ্ছা।

পথে বেরিয়ে বিদিশা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। পুত্রবধূ মিথ্যে বলল, এটা নিশ্চয়ই সন্দেহ করেননি শ্বশুরমশাই? তার সাদামাটা সাজ লক্ষ করেছেন কি? উঁহুঁ, তাহলে নির্ঘাত পরিহাস জুড়তেন। রুদ্রবাড়ির বউয়ের এমন যোগিনী বেশ কেন! মনে মনে হাসল বিদিশা। মেয়েদের পোশাক আশাকের ব্যাপারে বেশির ভাগ পুরুষের দৃষ্টিই তেমন সূক্ষ্ম নয়, এটা একটা মঙ্গলের কথা।

গোল চক্করের মুখে এসে ট্যাক্সি পেয়ে গেল বিদিশা। অর্কর বাড়ি হাতিবাগান ছাড়িয়ে

আরও পশ্চিমে, প্রায় চিৎপুরের কাছাকাছি। পাড়াটা মোটেই তেমন সুবিধের নয়। কাছেই কলকাতার কুখ্যাততম নিষিদ্ধপল্লি, এ পাড়াতেও যত্রতত্র নষ্ট মেয়ের বাস। এক সময়ে বিদিশা প্রায় দিনই পাতাল বেয়ে ভবানীপুর থেকে এখানে অভিসারে আসত। দুপুরবেলা। ওই সব মেয়েরা তখন রাস্তার কলে স্নান করত, জল ভরত, হাসাহাসি করত নিজেদের মধ্যে, চোরা অস্বস্তিতে গা শিরশির করত বিদিশার।

আজ কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। বড় রাস্তাতেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছে, হাঁটতে হাঁটতে মাথায় আলগা ঘোমটা তুলে নিল। পুরনো আমলের পলেস্তারাহীন বাড়ির রংচটা দরজায় পৌঁছে থমকে রইল একটুক্ষণ। কড়া নাড়বে, কি নাড়বে না? সময় মেপেই এসেছে, সাড়ে দশটা বাজে, অর্কর মাসির এখন বাড়ি থাকার কথা নয়, কিন্তু...? পোস্ট অফিসে চাকরি করেন মহিলা, স্বামী মারা গেছেন, ছেলেপুলে নেই, সকাল দশটার আগেই বোনপোর জন্য রান্নাবান্না সেরে বেরিয়ে যান, তারপর সারাদিন বাড়ি একেবারে ফাঁকা। অন্তত সে সময়ে থাকত, মাস সাত আট আগে। এই কদিনে কি রুটিন বদলেছে কিছু? আজ শনিবার, কোনও সরকারি ছুটিছাটা নেই তো? বিদিশার কথা জানেন মাসি, অর্কই বলেছে। আজ বিদিশাকে বিয়ের পরও অর্কর কাছে আসতে দেখে মাসি কী ভাববেন?

যে যা খুশি ভাবুক। বিদিশা তো আজ অর্কর সঙ্গে প্রেম করতে আসেনি। দরকার হলে মাসির সামনেই বিদিশা জেরা করবে অর্ককে।

দোনামোনা করতে করতে দরজায় মৃদু করাঘাত করল বিদিশা। সঙ্গে সঙ্গেই দরজার পাশের জানালা খুলে গেছে। গরাদ বসানো জানালা, এ পারে তারজাল, ও পারে অর্কর মুখ।

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেছে অর্কর,—তুমি! তুমি হঠাৎ?

—দরজা খোলো। কথা আছে।

মুহূর্তে উন্মুক্ত হয়েছে দ্বার। অর্কর গলায় বিস্মিত আহ্বান, এসো।

চৌকাঠ পেরিয়ে বিদিশা আরেক বার থমকাল। ঐই সেই পরিচিত ঘর। মাথায় ওপর মরচে ধার কড়িবরগা, দেওয়ালে জায়গায় জায়গায় ড্যাম্প, চার ব্লেডের পাখা। কিছুই বদলায়নি ঘরটার। আসবাবপত্র ঠাঁইনাড়া হয়নি এতটুকু। ওই কোণে টেবিল চেয়ার, একদিকে ফাটা কাচের আলমারি, দেওয়াল ঘেঁষে ইয়া বড় টিনের তোরঙ্গ, ও পাশের দুটো জানলা জোড়া তক্তপোষে অর্কর বিছানা, ফুলছাপ বেডকভারে ঢাকা। বাঁদিকের দরজা দিয়ে প্যাসেজে গেলে ভেতরে আর কী কী আছে তাও মনশ্চক্ষে নিখুঁত দেখতে পাচ্ছে বিদিশা। ছায়ামাখা স্যাঁতসেতে প্যাসেজের এক ধারে মাসির ঘর। অন্য ধারে বাথরুম, রান্নাঘর, খাবার জায়গা। পিছনে ছোট্ট উঠোনও আছে একটা, সেখানে টবে টবে নানান ফুলের গাছ। ছোটখাটো এই বাড়িটা বহুকাল আগে ভাড়া নিয়েছিলেন অর্কর মেসোমশাই। তাঁর অকালমৃত্যুর পর বাড়িটা এখন মাসির। তাঁর চাকরিটাও। বিদিশা জানে। আশ্চর্য, এত হতদরিদ্র পরিবেশের বাসিন্দা এই ছেলেটার প্রেমে কী করে সে হাবডুবু খেয়েছিল!

অর্ক ব্যস্ত মুখে ফুলছাপ বেডকভার টান টান করছে,—বোসো।

বসতে গিয়েও বসল না বিদিশা। ওই বিছানায় অনেক দুপুরের স্মৃতি লেগে আছে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েই সরাসরি অর্কর চোখে চোখ রাখল,—কেন এসেছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?

—না তো!

—অনুমানও করতে পারছ না?

—না, বিশ্বাস করো। অর্কর স্বরে অকৃত্রিম বিস্ময়,—তুমি আসবে আমার কাছে, এখন, এ সময়ে...এ আমার কল্পনাতেও ছিল না।

—ন্যাকামি কোরো না। বিদিশার স্বর কর্কশ হল, তুমি এত নীচে নেমে গেছে অর্ক?

—আমি! আ-আ-আমি কিছুই বুঝতে পারছি না দিশা।

—বাহ্, অ্যাক্টিংটা তো ভালই শিখে গেছ! গলায় মডুলেশান তো রপ্ত করেছই, পাকা একজন ক্রিমিনাল হয়ে উঠতে তোমার আর বাকি নেই।

অর্কর মুখের আহত ভাব লহমায় বদলে গেল। ভারী গলায় বলল,—তুমি কি আমাকে অপমান করতে এসেছ?

—না, সাবধান করতে এসেছি। প্রচুর বাড়াবাড়ি হয়েছে, আর নয়। এবার পুলিশে খবর দেব, কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাবে।

—তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। অর্কও রীতিমত তেতে গেছে, আমারই বাড়ি চড়াও হয়ে আমায় যা নয় তাই বলে যাচ্ছ? ভেবেছ টাকা থাকলেই ধরাকে সরা জ্ঞান করা যায়?

বিদিশা দমল না। একই সুরে বলল, মেজাজ দেখাবে না, একদম মেজাজ দেখাবে না। ও সব মেজাজ তোমার ভালমানুষ মাসির ওপর ফলিয়ো। আমি জানতে চাই এ সব নোংরামির অর্থ কী?

অর্ক কয়েক সেকেন্ড স্থির। একদৃষ্টে দেখছে বিদিশাকে। বিড়বিড় করে বলল, কী নোংরামি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। উল্টোপাল্টা না বলে মোদ্দা কথাটা বলো না।

—ছি অর্ক, ছি। বিদিশা জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলল,—কটা মাত্র টাকার জন্য আমায় ব্ল্যাকমেল করা শুরু করলে? তুমি আমার কাছে ভিক্ষে চাইতে পারতে...

—দাঁড়াও দাঁড়াও। কিসের ব্ল্যাকমেল বলো তো? কিসের টাকা?

—এখনও অভিনয়? তুমি আমায় টাকার জন্য ফোন করোনি? ভেবেছ হেঁয়ালি করে কথা বললে তোমায় আমি চিনতে পারব না?

—আমি তোমায় টাকার জন্য ফোন করেছি? কবে? কখন?

প্রশ্নের উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ল বিদিশা,—তোমার টাকার দরকার নেই?

—এই দুনিয়ায় কার টাকার দরকার নেই! আমারও আছে।

—পঞ্চাশ হাজার?

—হ্যাঁ, ওই রকমই...বলেই অর্ক হোঁচট খেল,—তুমি জানলে কীকরে?

—আমি অনেক কিছুই জানি। আমি এও জানি তোমার দৌড়বীর হওয়ার বাসনা চলে গেছে। তুমি আবার ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন, মানে রায়গঞ্জে ফিরছ। টাকা দিয়ে তুমি এখন ব্যবসা ফাঁদতে চাও। এবং সেই টাকা আমার গলা মুচড়ে...। তুমি যখন দিঘায় চিঠিগুলোর

কথা তুললে তখনই আমার আন্দাজ করা উচিত ছিল।

অর্কর মুখটা কেমন করুণ হয়ে গেল,—তুমি যা বলছ তার অনেকটাই ঠিক। কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমার অভিযোগের আমি বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছি না। টাকার আমার দরকার আছে। হ্যাঁ, পঞ্চাশ হাজারই। কিন্তু সে টাকা তো আমায় মাসি দিচ্ছে। মেসো মাসির নামে একটা এল আই সি করেছিল, এই জুনে সেটা ম্যাচিওর করেছে। স্পোর্টস কোটায় চাকরিটা তো শেষ পর্যন্ত হল না, আমার এমন বিদ্যের দৌড়ও নেই যে এই কলকাতা শহরে আমি...আমায় তো বাঁচতে হবে।...কিন্তু ফোন... আমি... তোমাকে...? আমি তো তোমার নাম্বারই জানি না।

—মিথ্যে কথা।

—আমি মিথ্যে বলি না দিশা। তুমি জানো। অর্কর স্বর অসম্ভব ঋজু। ওই স্বরকে অবিশ্বাস করতে চেয়েও পারছিল না বিদিশা। মিথ্যে কেন, অর্কর মধ্যে যে কোনও কপটতাও নেই, এ কথা বিদিশার থেকে বেশি আর কে জানে! ভাস্কর মিহির ছিল চালবাজ টাইপ। নিজেরা যা, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তার থেকে অনেক বেশি দেখানোর চেষ্টা করত নিজেদের। অর্ক একদম উল্টো। মহুয়ার বাড়িতে প্রথম আলাপের দিনই অবলীলায় নিজের অবস্থার কথা বলে দিয়েছিল। সে যে একজন অতি সাধারণ প্রাইমারি স্কুল টিচারের ছেলে, আরও পাঁচটা ভাই বোন আছে তার, বাড়িতে থাকতে ভাল করে খাওয়া জুটত না, কিন্তু দৌড়বীর হওয়ার নেশাটা তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল, এই নিঃসন্তান মাসির আশ্রয়ে থেকে স্বপ্নটাকে সে সফল করতে চায়...। কিচ্ছু কখনও গোপন করেনি অর্ক, কিচ্ছু না, ফুল ছাড়া কক্ষনও তাকে সামান্যতম কিছু উপহার দেয়নি অর্ক। বিদিশা রসিকতা করলে সোজাসুজি বলেছে, আমার টাকা কই দিশা! দু চার পয়সা যদি জোটাতেও পারি, সে আমি হয় মাসিকে দেব, নয় দেশে পাঠাব! আমরা তো পরস্পরকে ভালবাসি, তবে আর এই কেতাবি ঠাট ঠমকের প্রয়োজন কী।

বিদিশা ধম করে বিছানাতেই বসে পড়ল। শুকনো মুখে বলল, —তুমি নও? তাহলে কে?

চেয়ার টেনে এনে সামনে বসল অর্ক,—কী হয়েছে আমাকে খুলে বলো দিকিনি?

অর্ক শুনল সব। গুম হয়ে। তারপর উঠে পায়চারি করছে ঘরে। মাথা ঝাঁকাচ্ছে মাঝে মাঝেই। স্বগতোক্তির মতো বলল,—তুমি ধরে নিলে, আমি? এত অবিশ্বাস আমাকে, এত?

বিদিশা অস্ফুটে বলল,—কারণ ছিল বলেই না...

—ও। অর্ক এক মুহূর্ত জরিপ করল বিদিশাকে। আপাদমস্তক। ঠোঁটের কোণে বিচিত্র এক হাসি ফুটে উঠেছে। হঠাৎ ঝাঁ করে গিয়ে টিনের তোরঙ্গ খুলল। বার করছে একের পর এক পুরনো রানিং শু, ট্র্যাক স্যুট। একদম নীচ থেকে তুলে আনল একটা প্লাস্টিক প্যাকেট। দড়াম করে তোরঙ্গ বন্ধ করে প্যাকেটটা ছুড়ে দিল বিদিশার কোলে,—গুনে নাও, সাঁইত্রিশটাই আছে।

বিদিশা অবশ্য সত্যি সত্যি গুনল না। প্যাকেট ফাঁক করে আলগা চোখ বুলিয়ে চিঠিগুলো ব্যাগে রেখে দিচ্ছিল, অর্ক দ্রুত এসে ছোঁ মেরে কেড়ে নিল,—উহুঁ, এগুলো

তো তোমার প্রাপ্য নয়, এগুলো আমার।

বিচলিত স্বরে বিদিশা বলল,—তুমিই রেখে দেবে?

—এসো। দ্যাখো কী করি।

অর্ক ভেতরে ঢুকে গেল। পিছন পিছন বিদিশা, যন্ত্রচালিত মানবীর মতো। রান্নাঘরে এসে অর্ক গ্যাস জ্বালাল, প্যাকেট থেকে একটা একটা করে চিঠি বার করে পোড়াচ্ছে। নীল শিখায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে নীল খাম, লাল আগুন হিসহিস নাচছে। উৎকট কাগজপোড়া গন্ধ ছড়িয়ে গেল গোটা বাড়িতে।

বহ্ন্যুৎসব শেষ করে থামল অর্ক,—শান্তি হয়েছে তো?

বিদিশা নতমুখে সরে এল। বুকের মধ্যে এক তোলপাড় করা অনুভূতি। সহসাই। এই সরল যুবককে সে ঠগ জোচ্চর ক্রিমিনাল ভেবেছিল, অথচ প্রকৃত প্রতারক সে নিজেই। একটি বারও তার দিকে আঙুল তুলল না অর্ক, শুধু তাকে আশ্বস্ত করার জন্যই সযত্নে রাখা চিঠিগুলো...! দিথায় বলেছিল না, ওইটুকুই আমার সম্বল!

পিছনে অর্কর গলা, ভাবনা তো গেল, এবার একটু হাসো।

প্রাণপণে হাসার চেষ্টা করল বিদিশা। এ হাসি যেন কান্নার চেয়েও বিষণ্ণ। যেন শীতের আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে, মলিন সূর্য তাকে ভেদ করে উঁকি দিতে পারছে না।

ভেজা ভেজা গলায় বিদিশা প্রশ্ন করল,—কবে রায়গঞ্জ যাচ্ছ?

—দেখি। সবটাই একটা সুতোর ওপর ঝুলছে।

—কেন?

—একটা শেষ চেষ্টা করছি। কন্টাইতে স্টেট মিটে গিয়েছিলাম না, রানারস হয়েছি। দেখেছ নিশ্চয়ই কাগজে?

—না... মানে... তখন তো দিথায়...! তুমিও তো কিছু বলোনি?

অদ্ভুত হাসল অর্ক। একটু থেমে থেকে বলল,—চ্যাম্পিয়ানের সঙ্গে মাত্র পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের মার্জিন ছিল। ন্যাশনাল মিটে আমরা দুজনেই স্টেটকে রিপ্রিজেন্ট করব। যদি সেখানে কিছু করতে পারি তো...

—নিশ্চয়ই পারবে। বিদিশা সহজ হওয়ার চেষ্টা করল।

—খুব টাফ! দিল্লি মহারাষ্ট্র তামিলনাড়ু—অন্তত জন্য সাতেকের টাইম আমার থেকে বেটার। তবু এটাই আমি লাস্ট মোটিভেশান হিসেবে ধরে নিয়েছি। যদি হারি, তো চিরবিদায়।

—তুমি হারবে না। তোমার জেদ আছে, অ্যাম্বিশান আছে...

—শুধু কপালটাই নেই। লাক, যাকে বলে উইনারস লাক। না হলে কি তুমি আমার কাছ থেকে...! অর্ক মাঝপথেই কথা ঘুরিয়ে নিল, নেক্সট মানথে তোমাদের সল্টলেক স্টেডিয়ামে আমার ক্যাম্প শুরু হচ্ছে। যেটুকু মাজা ঘষা ওখানেই করতে হবে। তারপর যা হবে সব উপরওয়ালাকা খেল।

—হুঁ। বিদিশা আবার দূরমনস্ক, কিন্তু ফোনটা কে করেছিল বলো তো?

—আরে দূর, ওসব কোনও বখা ছেলেদের কাজ। কাগজে পড়োনি, কলকাতায় ইদানীং, একটা র‍্যাকেট গজিয়েছে, তারা ফোনে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে...

—কিন্তু আমার নাম জানবে কীকরে?

—হয়তো তোমাদের আশপাশের বাড়ির কোনও ছেলেই সে দলে আছে। তোমাদের সল্টলেক বড়লোকের জায়গা, ওই সব গুণধর ছেলেরাও পয়সাঅলা বাড়ির। কে কীভাবে তোমার নাম জেনে নিয়েছে তার ঠিক আছে!

—হতে পারে। বিদিশা আরও আনমনা,—আমার কিন্তু একজনকে সন্দেহ হচ্ছে।

—কে? চেনা পরিচিত কেউ?

—সে তো বটেই।

—প্রতিবেশী?

বিদিশা উত্তর দিল না। মনে মনে নামটা ভাঁজছিল।

[সাত]

পরদিনই বিদিশা বাপের বাড়ি ছুটল। অর্চিষ্মানের নতুন জেন টিউনিং-এর জন্য গ্যারেজে গেছে, স্বামী-স্ত্রী একই সঙ্গে মারুতিতে বেরিয়েছিল, পথে পার্ক স্ট্রিট নেমে গেল অর্চিষ্মান। আজ আবার নিলামের দিন, ডাক শুরু হবে ঠিক দশটায়, তার অন্তত আধ ঘণ্টা আগে দোকানে পৌঁছে যাওয়া অর্চিষ্মানের অভ্যাস। বিদিশাকে নামিয়েই রবি দোকানে ফিরে গেল, বিকেল সন্ধে নাগাদ এসে মালকিনকে তুলে নিয়ে যাবে। অনেক কাল পর আজ সারাটা দিন মহিম হালদার লেনে কাটাবে বিদিশা।

শখ করে নয়, বাবা-মার প্রতি ভালবাসার টানেও নয়, বিদিশার আজ অন্য উদ্দেশ্য আছে।

কাল অর্কর বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিদিশার মনের ভার অনেক লঘু হয়েছে বটে, কিন্তু নতুন কাঁটাটা খচখচ করেই চলেছে বুকে। ফোনের বজ্জাতটা যখন অর্ক নয়, তখন দাদা ছাড়া আর কে-ই বা হতে পারে! পুরোপুরি চাপমুক্ত হতে গেলে দাদাকে একবার বাজিয়ে দেখা দরকার। তারপর নয় গোটা ব্যাপারটাকে নিছক ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে।

চিত্রভানু আর বিদিশার সম্পর্কটা কোনও দিনই খুব সরল নয়। ভাইবোনে বয়সের ফারাক মাত্র আড়াই বছরের। অর্থাৎ প্রায় পিঠোপিঠি। এত কম তফাতে ভাই বোনে একটু আধটু খুনসুটি হয় বটে, তবে পরস্পরের প্রতি তীব্র এক টানও থাকে। চিত্রভানু আর বিদিশার মধ্যে সেটা একদমই নেই। জন্মের পর খুব বেশি দিন বাবা মার অখণ্ড মনোযোগ পায়নি চিত্রভানু, হয়তো বা সেই জন্যই।

ছোটবেলা থেকেই বোনের ওপর চিত্রভানুর প্রবল হিংসে। কী আজব আজব কাণ্ডই না করত চিত্রভানু, ওই ঈর্ষা থেকেই! পুজোয় বোনের এক সেট বেশি জামাকাপড় হয়েছে, সবার অগোচরে বোনের সব ফ্রক কখন ব্লেড দিয়ে চিরে রেখেছে চিত্রভানু। পরীক্ষায় বিদিশা ভাল নম্বর পেল হয়ে, প্রভাকর খুশিতে ডগমগ হে মেয়েকে কলম কিনে দিলেন, পরদিনই নতুন কলম ভ্যানিশ! লন্ডন-ফেরত মামা চমৎকার এক টকিং ডল এনে দিয়েছিলেন বিদিশাকে, সাত দিনের মধ্যে সেই পুতুল মুণ্ডু ছেঁড়া অবস্থায় ডাস্টবিনে পাওয়া গেল। প্রভাকর চোরের মার মেরেছেন চিত্রভানুকে, কিন্তু ছেলের স্বভাব বদলাতে

পারেননি। উল্টে ছেলে আরও বিগড়েছে। ক্লাস ফাইভে উঠে নাচ শেখার ক্ষণস্থায়ী শখ হল বিদিশার, বেলতলার এক নাচের স্কুলে প্রভাকর মেয়েকে ভর্তি করে দিলেন, আহ্লাদ করে মেয়ের জন্য দামি ঘুঙুর কেনা হল—প্রতিদিন ঘুঙুরের একটা করে ঘন্টি ছিঁড়ে রাখত চিত্রভানু। একজন বুড়ো মতো মাস্টারমশাই বাড়ি এসে পড়াতেন ভাইবোনকে, একদিন বুঝি তিনি বলেছিলেন চিত্রভানুর থেকে বিদিশার মাথা অনেক সাফ, ব্যস্ বুড়ো মানুষটার চপ্পলই আর খুঁজে পাওয়া গেল না। বোনকে হিংসে করতে করতেই চিত্রভানু বুঝি লেখাপড়ায় আরও তলিয়ে গেল। মাধ্যমিকে মেরেকেটে দু দাঁড়ি, হায়ার সেকেন্ডারি টায়েটুয়ে পাশ, কলেজের গণ্ডিটা তো আর উতরোলই না। চিরকালই যত রাজ্যের ওঁচা ছেলেদের সঙ্গে ভাব, এখনও তারাই চিত্রভানুর দুনিয়া বেহেশত দোজখ। এমন দাদাকে মনে মনে একেবারে ক্লিন চিট দেয় কী করে বিদিশা?

যে এক চাইতে পারে, সে দশও চাইতে পারে। যে দশ চাইতে পারে, পঞ্চাশ চাইতেই বা তার বাধা কোথায়! সঙ্গ গুণে হিংসুটে দাদার লোভের মাত্রা কোথায় পৌঁছেছে, বিদিশা কি তার পুরো হদিশ রাখে!

আজ অবশ্য বাপের বাড়ি আসার পিছনে বিদিশার অন্য [illegible] অভিপ্রায়ও আছে। সেটি ক্রমশ প্রকাশ্য।

যথারীতি হাট দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেই বিদিশা দেখল প্রভাকর চৌকিতে আধশোওয়া হয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট, লম্বা ছাই এই বুঝে খসে পড়ে। বয়স এখনও ষাট ছোঁয়নি প্রভাকরের, দেখে কিন্তু সত্তরোর্ধ্ব বলে ভ্রম হয়। ক্ষয়াটে চেহারা, লম্বাটে মুখ, ফর্সা রং জ্বলে তামাটে, মাথার চুল সব প্রায় পাকা। এক সময়ে মোটামুটি রূপবান ছিলেন, এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, একমাত্র খাড়া নাকটি ছাড়া।

মেয়েকে অসময়ে দেখে প্রভাকর ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। মুখ উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেল, শুরু হয়ে গেল হইচই। নিজের হাতেই চাদর টান টান করছেন, চেয়ার ঝাড়ছেন, টুল সরাচ্ছেন...। ভারতীও ছুটে এলেন, মেয়ে গোটা দিন থাকবে শুনে তাঁরও মুখে হাসি ধরে না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চা বিস্কুট এসে গেল। চানাচুর চিড়েভাজাও।

বাবা-মার শশব্যস্ত আপ্যায়নে বেশ মজা লাগছিল বিদিশার। যেন সে এই ঘোষবাড়ির মেয়েই নয়, ছিলও না কোনও দিন, যেন রুদ্রবাড়ির মহিমান্বিত বউ হঠাৎ এসে ধন্য করে দিয়েছে মহিম হালদার লেনের এই পরিবারকে। আদর অভ্যর্থনায় পান থেকে চুন খসলে বুঝি বা এদের ফাঁসি দ্বীপান্তর হয়ে যাবে। এইটুকু দূরত্ব থাকা এখন বোধহয় ভাল। বেচারার দল!

বিদিশা ঘাড় ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—দাদাকে দেখছি না? সে কোথায়?

প্রভাকর গম্ভীর হলেন,—নবাবপুত্তুর এখনও শয্যা ছাড়েননি।

ভারতী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—আহা, কাল শুতে অত রাত হল...

—কেন রাত হল? কেন রাত করে ফেরে?

—বারে বলল না, কোন এক বন্ধুর জ্যাঠা মারা গেছে।...শ্মশানে গেছিল...

—শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না। অন্য দিন বুঝি সন্ধেবেলা ফেরে? প্রভাকর মেয়ের দিকে ফিরলেন,—তোর মা...এই তোর মা'ই যত নষ্টের মূল। লাই দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে

একেবারে গোল্লায় পাঠাল। আমাদের বংশে আর একটাও অমন লক্ষ্মীছাড়া জন্মায়নি।

—তুমি খালি ওর দোষই দ্যাখো। ভারতীর মুখ ভার।

—গুণও আছে বুঝি হারামজাদার? ...কী গুণ, অ্যাঁ? মড়া বওয়া? কার পিসি হাসপাতালে খাবি খাচ্ছে তার জন্যে দৌড়ে বেড়ান?

—অন্যের উপকার করা দোষ?

—ওরকম ঘরেরটি খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াতে অনেকেই পারে। হারামজাদাকে বলে দিয়ো, প্রভাকর ঘোষ আর ওই দামড়ার নাদা ভরাতে পারবে না। সে যেন নিজের বন্দোবস্ত নিজে করে নেয়।

নিয়মমাফিক বাদবিতণ্ডা হল কিছুক্ষণ। থামলও এক সময়ে। কথা হচ্ছে টুকটাক। এলোমেলো। দিননাথ নিজে ধূমপায়ী না হয়েও বেয়াই-এর জন্য এক প্যাকেট দামি সিগারেট পাঠিয়েছেন, বিদিশার হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে প্রভাকর উল্লসিত, উল্টেপাল্টে দেখছেন। ভারতী রান্নাঘরে চলে যেতেই প্যাকেট খুলে রাজা মাপের সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়েছেন প্রভাকর। ধরিয়ে তৃপ্তির ধোঁয়া ছাড়ছেন। হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল। বললেন,—হ্যাঁরে বুলু, তোদের দোকানের চুরিটার কিছু সমাধান হল?

বিদিশা আকাশ থেকে পড়ল,—তুমি কোত্থেকে জানলে?

—অর্চিষ্মানের কাছ থেকে! আমি তো পরশু দুপুরে তোদের নিলামঘরে গেছিলাম। অর্চিষ্মান বলেনি?

—না তো।

—তাহলে বোধহয় ভুলে গেছে। কাজেকর্মে থাকে...প্রভাকর যত্ন করে অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়লেন,—অফিসের এক কলিগকে নিয়ে গেছিলাম, বুঝলি? পুরনো শোকেস কিনতে চায়, বললাম আমার জামাই-এর দোকানে চলো...। তা গিয়ে দেখি এক পুলিশ অফিসার বসে আছে।...সে উঠে যেতেই কথায় কথায়...। অর্চিষ্মান খুব চাপা আছে, না রে? কিছু ভেঙে বলতে চায় না।

—হুম্। বিদিশা ঈষৎ আনমনা।

—টাকা পয়সা তো শুনলাম তেমন কিছু যায়নি! এত থানা পুলিশ করছে কেন? সেদিন যা সিরিয়াস মুখে দারোগাটার সঙ্গে কথা বলছিল...! অন্য আর দামি কিছু গেছে নাকি?

—জানি না তো।

ভারতী আবার দরজায়। কী যেন ইশারা করছেন প্রভাকরকে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন প্রভাকর,—তুই একটু বোস, আমি চট করে ঘুরে আসছি।

—কোথায় যাচ্ছ?

—এইই, যাব আর আসব।

—বাজার যাচ্ছ?

ধরা পড়া মুখে হেসে ফেললেন প্রভাকর।

বিদিশা আলাগা ভাবে বলল,—থাক না বাবা। যা আছে তাই না হয়...

প্রভাকরের হাসি চওড়া হল—আরে দূর, তোর অনারে আমরাও আজ একটা

স্পেশাল খাওয়াদাওয়া করব না? কীখাবি বল? ইলিশ, না চিংড়ি? মুরগি, না মাটন?

—সে তোমার যা ইচ্ছে।

ভেতরে চলে গেলেন প্রভাকর। চাপা স্বরে কী যেন কথা হচ্ছে ভারতীর সঙ্গে, ঠিক শুনতে পাচ্ছিল না বিদিশা। মিনিট কয়েকের মধ্যেই পাঞ্জাবি চড়িয়ে থলি হাতে প্রভাকর বেরিয়ে গেলেন।

ভারতী মশলা বাটতে বসে গেছেন। তাঁর সঙ্গে আরও একটা দুটো কথা বলে চিত্রভানুর ঘরে এল বিদিশা।

চিত্রভানু জেগেই ছিল। বোনের আবির্ভাবেও কোনও হিলদোল নেই। শুয়ে শুয়েই আড়মোড়া ভাঙছে।

শুয়ে শুয়েই মন্তব্য ছুড়ল—আজ এখানে বডি ফেলে দিলি?

বিদিশা মুখ টিপে বলল,—বাপের বাড়ি আসাকে বডি ফেলা বলে বুঝি?

ছোট্ট হাই তুলল চিত্রভানু,—ভাল ভাল। আরও কিছু ধসিয়ে যা। মিস্টার প্রভাকর ঘোষ হার হাইনেসের বাপ হওয়ার ঠেলা বুঝুক।

—মানে?

—বাবা মার ডায়ালগটা শুনতে পাসনি? নাকি ওই সময়ে কানের পর্দা মোটা হয়ে যায়?

বিদিশার চোখ বড় বড়,—সত্যিই শুনতে পাইরে রে!

চিত্রভানু কথাটা বিশ্বাস করল বলে মনে হল না। উঠে বসেছে তক্তপোষে। এ ঘর এক সময়ে বিদিশার দখলে ছিল। হাত বদল হওয়ার পরে এ ঘরের এখন আর সামান্যতম শ্রী সৌষ্ঠবও নেই। যত্র তত্র জামা প্যান্ট ছড়ানো, মেঝেয় পোড়া সিগারেটের টুকরো, ছোট টেবিলে ছেঁড়াখোঁড়া কাগজের জঙ্গল, তার ওপরে ফাটা একটা আয়না...। সদ্য খুঁট খোলা মশারি স্তূপ হয়ে আছে বিছানার কোণে, তারই মধ্যে থেকে হাতড়ে হাতড়ে একটা টিশার্ট বার করল চিত্রভানু।

খালি গায়ে টিশার্টটা চড়াতে চড়াতে বলল,—আজ মাসের কত তারিখ খেয়াল আছে? টোয়েন্টি নাইনথ। বাবার পকেট ঢুঁ ঢুঁ। এখন ধার করতে ছুটল। তোকে খাওয়াতে।

বিদিশা আজ কিছুতেই চটবে না পণ করে এসেছে। তবু আহত হল। গোমড়া মুখে বলল,—আমি কী করব? আমি কি বাবাকে জোর করে পাঠিয়েছি?

—তোর এরকম দুম করে হাজির হওয়াটাই তো জোর করা।

—আমি এসেই চলে গেলে তুই খুশি হতিস?

—তোর বাপের বাড়ি, তুই ইচ্ছে হলে আসবি, আসবি না...আমি খুশি অখুশি হওয়ার কে? আমি শুধু অন্য হিসেব কষছি।

—কী হিসেব?

—পঞ্চাশের সঙ্গে আরও কিছু প্লাস হল। এটা অবশ্য পাড়া থেকেই ম্যানেজ করবে। হয়তো বিনা সুদেই...।

বলতে বলতেই গলা তুলে চায়ের হুকুম ছুড়ল চিত্রভানু। বিদিশাকে পুরোপুরি অবজ্ঞা

করে অলস পায়ে ছোট ঘরে এল। চোখের সামনে কাগজ মেলে চৌকিতে বসেছে।

বিদিশা প্রাণপণে মাথা ঠাণ্ডা রাখল। এসেছে পিছন পিছন,—তোকে একটা কথা বলব দাদা?

—বলে ফ্যাল।

—বাবার জন্য তোর যখন এত চিন্তা, নিজে কিছু একটা কর না।

—কী করব? চাকরি? বিদ্যেয় কুলোচ্ছে না। চিত্রভানু শব্দ করে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাল,—বল্লবগড়ের ঘোষবাড়ির ছেলে হয়ে তো আর কুলিগিরি করতে পারব না।

বিদিশা পাকা দাবাড়ুর মতো এগোতে চাইল। সন্তর্পণে একটা বোড়ে ঠেলে দিল,—চাকরি নয় না'ই করলি। ব্যবসা কর।

—টাকা কে দেবে? তোর শ্বশুর?

—ধর, শ্বশুরের বউমাই দিল।

ঝপাং করে কাগজ ভাঁজ করল চিত্রভানু। সরু চোখে তাকাল,—তুই! তুই দিবি?

—দিতেই পারি। বিদিশা ঠোঁট চেপে হাসল। কোনাকুনি গজ ঠেকল,—তুই সেদিন আমার কাছে টাকাটা চাইলি, আমি না বলে দিলাম...বাড়ি গিয়ে আমার ভীষণ খারাপ লেগেছে রে! সত্যিই তো, আমি যখন একটা ভাল জায়গায় পৌঁছেছি, তখন আমরাও তো উচিত বাবা মা ভাইকে দেখা, নয় কি?

—তুই এসব কথা ভাবলি? চিত্রভানুর গলায় স্পষ্ট অবিশ্বাস।

—ভাবি রে, ভাবি। অহরহ ভাবি। আরেকটা বোড়েকে এক ঘর এগোল বিদিশা,—কিন্তু একটা ধন্দ আমার থেকেই যাচ্ছে। দশ হাজার ইনভেস্ট করে তুই কী এমন ব্যবসা করবি, যাতে লাইফে শাইন করা যায়?

—বললাম তো, আছে ব্যবসা। ক্যাপিটাল পেলে দেখিয়ে দেব।

—কী দেখাবি? অল্প পুঁজির ব্যবসায় খাটুনি খুব, অনেক দিন লেগে থাকতে হয়। ও তুই পারবি না। বিদিশা ঝটাং করে ঘোড়া বাড়িয়ে দিল। একটু প্যাঁচ কষে, আড়াই পাক। মধুর স্বরে বলল,—তুই একটু বড় কিছু ভাবছিস না কেন? ধর, তোকে আমি যদি পঞ্চাশ হাজার দিই?

আশ্চর্য, চিত্রভানুর মুখে কোনও প্রতিক্রিয়াই ফুটল না। ঠোঁটের কোণটা বেঁকে গেল সামান্য,—টিজ করছিস?

—নো। ইটস অ্যান অফার। ওই টাকাতে একটা তুই ক্যাসেট ম্যাসেটের দোকান দে। যদি লেগে যায়...পারলে টাকাটা আমায় ফেরত দিয়ে দিস। আর ডুবলে ধরে নেব টাকাটা গেল। বিদিশা ঝাঁ করে মন্ত্রী চার ঘর এগিয়ে দিল,—বাট মাইন্ড ইট, দিলে আমি পঞ্চাশ হাজারই দেব। শুনছিস? পঞ্চাশ হাজার।

—ধুস্, তোর কাছ থেকে টাকা আমি নেবই না। আমি কি তোকে চিনি না? সারা জীবন খোঁটা দিবি তার পর। দাদাটার কিছু হচ্ছিল না, আমি দাঁড় করিয়ে দিলাম। বলতে বলতে আবার কাগজ টেনে নিল চিত্রভানু,—কী ভাবিস আমাকে? তোর কাছ থেকে দু চার পয়সা খামচা মারি বলে আমি কি ভুখ্খার পার্টি নাকি?

বিদিশা হতাশ হয়ে গেল। কক্ষচ্যুত ঘুটিগুলোকে আবার রাখছে স্বস্থানে, হৃদয়ে দাবার বোর্ডটাকে মুড়ে ফেলল। বিচিত্র এক অনুভূতি হচ্ছে বুকে। হতাশার সঙ্গে সঙ্গে একটা মুক্তির শিহরনও যেন টের পাওয়া যায়। নাহ্, দাদা নয়, দাদা নয়। দূরভাষের সেই কণ্ঠ অলীক ঠাট্টাই। তার দাদা এখনও এত দুঁদে অপরাধী বনে যায়নি, যে বার বার পঞ্চাশ হাজার শব্দটা শুনেও সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিহীন রাখতে পারবে নিজেকে।

আচম্বিতে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ল চিত্রভানু,—তুই এত টাকা দেব দেব করছিস কেন রে?

বিদিশা হাসার চেষ্টা করল,—এমনিই। তোর কথা ভেবেই।

—কিন্তু টাকাটা তো তোর নয়। তুই তো একটা প্যারাসাইট। অর্চিষ্মান রুদ্রর রোকড়া দেখিয়ে তুই ফুটুনি মারছিস কেন? বরং আমার উপকার যদি করতে চাস, তো অন্য ভাবে করতে পারিস। তোর বরকে বলে ওর দোকানে বা বারে যেখানে হয় আমায় ফিট করে দে। সংসারটাও বাঁচে, তোর কাছেও আমার হাত পাততে হয় না।

বিদিশা এবার কুঁকড়ে গেল। অর্চিষ্মান কী প্রকৃতির মানুষ সে এখন মোটামুটি জেনে গেছে। পদ্মপাণি সেদিন যা বলল তার কণামাত্রও যদি সত্যি হয়, তাহলে অর্চিষ্মানের কাছে কোনও আত্মীয়স্বজনকে চাকরি করতে দেওয়া সুবিধের হবে না। তার এই দাদাটিকে তো নয়ই। এক তিল গড়বড় হলেই নির্দ্বিধায় চিত্রভানুকে গলাধাক্কা দেবে অর্চিষ্মান, এবং বিদিশার জীবনটাও বিষময় হয়ে উঠবে।

তবু সরাসরি না করল না বিদিশা। ইতস্তত মুখে বলল,—দেখি। বলব।

ভারতী ছেলের চা এনেছেন। প্লেটে চা ঢেলে সড়াৎ সড়াৎ চার চুমুকে কাপ খালি করল চিত্রভানু, একবার টেরিয়ে বিদিশাকে দেখে বাথরুমে চলে গেল।

ভারতী তখনই নড়লেন না। চাপা স্বরে প্রশ্ন করলেন,—ভানু কী বলছিল রে? কী সব ব্যবসা...টাকা...অর্চিষ্মান...?

—ও কিছু না। বিদিশা প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল। পাল্টা প্রশ্ন করল,—মা, আমায় একটা সত্যি কথা বলবে?

—কী?

—দাদা সব সময়ে বলে আমার বিয়ের জন্য বাবা নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার নিয়েছে। কাবলিঅলার কাছ থেকে। সত্যি?

ভারতীর মুখ পাংশু হয়ে গেল। বিড়বিড় করে বললেন,—উফ, ভানুকে নিয়ে আর পারি না।

—তার মানে দাদা ঠিকই বলে?

—হ্যাঁ, মানে...। ও নিয়ে তুই ভাবিস না বুলু। কত বড় একটা দায় উদ্ধার হয়ে গেছে আমাদের...। তাছাড়া টাকা শোধের বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

—কোত্থেকে হল?

—সে প্রায় আকাশ ফুঁড়েই বলতে পারিস। ভারতীর মুখে অনাবিল হাসি,—বল্লভগড়ে তোর বাবাদের অনেক জমিজমা ছিল না...সেইগুলো কিছু বিক্রি হচ্ছে। বেশ কয়েক লাখ টাকার জমি। জ্ঞাতিগুষ্টিতে ভাগ হয়েও তোর বাবার হাতে পঞ্চাশ হাজার মতো আসবে।

বিদিশার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না কথাটা, আবার অবিশ্বাসও করতে পারছিল না। বল্লভগড়ে তাদের দেশ বটে, তবে বর্ধমানের সেই গঞ্জ অঞ্চলে সে বড় একটা যায়নি। আবছা আবছা মনে আছে প্রকাণ্ড একটা বাড়ি, অজস্র শরিক চারদিকে, খোপে খোপে পাখির মতো বাস করে তারা। সেখানে কী এমন সম্পদ ছিল যার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জুটবে বাবার? এত ভূসম্পত্তির অংশীদার হয়েও কেনই বা বাবা এই হতদরিদ্র দশায় দিন কাটায়? বল্লভগড়ের সঙ্গে বাবার তো তেমন সম্পর্কও নেই। তার বিয়েতেও ওখান থেকে বিশেষ কেউ আসেনি। এক আইবুড়ো পিসি, এক কাকা, ব্যস।

চিন্তাটা বেশি দূর গড়াতে পারল না। প্রভাকর চিংড়িমাছ আর মুরগি সমেত হাজির। ভারতী পই পই করে নিষেধ করেছেন বলে কাবুলিঅলার প্রসঙ্গ বাবার সামনে আর তুলল না বিদিশা।

অনেক বেলা অবধি হইহই হল। খাওয়া দাওয়া সারতে সারতে প্রায় আড়াইটে। মুখে চারটি গুঁজেই চিত্রভানু ধাঁ। প্রভাকরও একটু শুতে গেলেন।

মাকে কাটিয়ে কুটিয়ে বিদিশা দাদার ঘরে এল। একটা গড়ানোর বাহানা করে। এই বেলা আরও একটা কাজ সেরে ফেলতে হবে। আসল কাজ।

নিঃসাড়ে দরজায় ছিটকিনি তুলল বিদিশা। মেঝেয় বসে তক্তপোশের তলা থেকে টেনে বার করল একটা কালো ট্রাঙ্ক। বিদিশার নিজস্ব তোরঙ্গ। স্মৃতির ঝাঁপি।

ট্র্যাঙ্ক খুলেই বিদিশার বুক ধক করে উঠেছে। ভেতরে শুধুই গাদা গাদা পুরনো কাপড়। তার নিজস্ব ছোট্ট বাক্সটি কোথথাও নেই!

[আট]

দরজা খুলে বিদিশা চেঁচিয়ে ডাকল—মা? ...মা?

সাড়া পেতে একটু বুঝি সময় লাগল। পাশের ঘর থেকে হাই তুলতে তুলতে এসেছেন ভারতী,—কী হল, তুই শুসনি?

বিদিশা উত্তর দিল না। অস্থির ভাবে মাথা ঝাঁকাল,—আমার সব জিনিসপত্রগুলো গেল কোথায়?

—কী জিনিস?

—আমার জিনিস। আমার ট্র্যাঙ্কে যা ছিল।

—ও, তোর পুরনো শালোয়ার কামিজ? ও তো আর তুই পরবি না। ভারতী এক গাল হাসলেন, ওগুলো সব আমি সাবিত্রীর মেয়েকে দিয়ে দিয়েছি। পড়ে পড়ে নষ্ট হওয়ার থেকে গরিব মানুষ পরে বাঁচুক।

—আর আমার কাঠের বাক্সটা?

—ওতে তো শুধুই কুটো গয়না। ও আর তোর কী কাজে লাগবে?

—মানে? ওটাও দিয়ে দিয়েছ? বিদিশা এক সেকেন্ড থমকাল,—আমার অত সব শখের গয়না...

—নারে বাবা না। ওটা আছে। যত্ন করেই তোলা আছে।

—কোথায়?

—আলমারিতে।

—নিয়ে এসো তো বাক্সটা।... গয়নাগুলো একটু দেখব।

ভারতী যেন সমান বিস্মিত। কোটিপতি মেয়ে এখন সর্বাঙ্গ সোনামোড়া হয়ে থাকতে পারে, তবু ওই তুচ্ছ নকল গয়নার ওপর টান এখনও মরেনি, বুঝি এই কথা ভেবেই।

বাক্সটা আনতেই বিদিশা ছোঁ মেরে হাতে নিয়ে নিল। ওয়ালনাটের বাক্স, গায়ে সুন্দর কাশ্মীরি কারুকাজ, দৈর্ঘ্য প্রস্থে কোনও দিকেও ফুট খানেকের বেশি হবে না। অরুণ উপহার দিয়েছিল বাক্সটা, এসপ্ল্যানেডের ফুটপাথ থেকে কিনে। ভেতরে একটা ছোট্ট আয়নাও বসানো আছে। অসমতল আয়না।

বাক্স নিয়ে ঘরে ফিরল বিদিশা। পিছন পিছন ভারতীও। ডালা খুলেই বিদিশা সতর্ক হয়ে গেল। ছদ্মমনোযোগে ঘাঁটছে ছদ্ম অলংকার। রুপোর ওপর সোনার জল করা চুড়ি, রোলগোল্ডের কণ্ঠহার, অজস্র ছোট বড় মেকি সোনার দুল, বালা ব্রেসলেট...। কাচের চুড়িও আছে বেশ কয়েক ডজন। সবই উপহার, কোনওটা বা অরুণের, কোনওটা মিহিরের।

ভারতীও নড়ছেন না সামনে থেকে। তিনিও ঝুঁকে দেখছেন। ভেতরে ভেতরে অধৈর্য বোধ করছিল বিদিশা। ঝপ করে ডালাটা বন্ধ করে দিল,—এটা আমি নিয়ে যাব।

—কী করবি নিয়ে? ভারতী আরও অবাক।

—আমার জিনিস আমার কাছে থাকবে।

—সব নিয়ে যাবি?

—আপত্তি আছে? বিদিশা কায়দা করে হাসল।

—তা নয়। তবে... ভারতীর মুখ যেন সামান্য করুণ দেখাল,—ওখান থেকে আমি মাঝে মাঝে নিয়ে...। বুঝিসই তো, আমার আর কিছু নেই। এই রোদ্দুরের ক'গাছা চুড়ি, আর ওই ফঙফঙে এক জোড়া বালা।... কাজেকর্মের বাড়িতে গেলে গলা কান তো আর একেবারে ন্যাড়া করে যাওয়া যায় না...

বিদিশা ফাঁপরে পড়ে গেল। ভারতীর মলিন মুখ দেখে নয়, কাজটা কী করে সুষ্ঠু ভাবে সমাধা করা যায় সেই কথা চিন্তা করে। কটা ঠুনকো মাল, স্বচ্ছন্দে মাকে দিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তারপর বাক্সটা নিয়ে যাওয়া কেমন বেখাপ্পা দেখাবে না?

চটজলদি জবাবও এসে গেল মাথায়,—ঠিক আছে, তুমি এগুলো নিয়েই নিয়ো... আসলে এখানে বেশ কয়েকটা ভাল ডিজাইন আছে, ওগুলো দেখিয়ে দেখিয়ে আমি দু চারটে গয়না গড়াব।

—ও, তাই বল। ভারতীর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল,—মনে করে দিয়ে যাস কিন্তু। আমি চাইতে পারব না।

—দেব বাবা, দেব। চৌকির সামনে পড়ে থাকা ট্রাঙ্ক তলায় ঠেলে ঢুকিয়ে দিল বিদিশা, বিছানায় লম্বা হল আবার। অলস মেজাজে বলল,—কটা বাজে? চা খাওয়ার সময় হয়নি?

—খাবি?

—করো। কখন আবার গাড়ি নিতে এসে যায়।

ভারতীর নিষ্ক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বিদিশা তড়াং করে উঠে বসল। বাক্সের ডালা খুলে গয়নাগুলো ঢালল বিছানায়। নীচের ভেলভেটের আস্তরণ টেনে টেনে ওঠাতেই বেরিয়ে পড়েছে এক গুপ্ত খোপ। আছে আছে, চিঠিগুলো আছে। নীল খাম অর্কর, গোলাপি খাম মিহিরের। অরুণেরও আছে একটা কচি কলাপাতা। ভাস্করই চিঠি ফিঠি লেখেনি কোনও দিন, ও সব তার ধাতেই ছিল না।

খাম খুলে খুলে কয়েকটা চিঠিতে পাখির চোখ বোলাল বিদিশা। অরুণেরটা একেবারে আবেগে থিকথিক, কবিতার লাইন টুকে টুকে পাতা ভরানো। কী স্তুতি রে বাপস! —হে উর্বশী, তুমি একবার যদি আমার ওপর পোসেস্ হও, তালেই আমার জিবন ধন্য হয়ে যাবে। ...নিস্য আমি, রিক্ত আমি, কিছুই আমার নাই, আছে শুধু ভালবাসা, দিলেম তোমায় তাই...! তোমার জন্য একটা দার্জিলিং এস্টোন্ বসানো দুল রেখে দিয়েছি, কবে তোমার দর্শন পাব!... তুলনায় অর্ক যেন অনেক বেশি কাঠখোট্টা। —গতকাল রায়গঞ্জে পৌঁছেছি। ভেবেছিলাম সোমবার ফিরব, হয়ে উঠবে না। পাঁচিলটা ঝুরঝুরে হয়ে গেছে, মিস্ত্রি লাগাতে হবে। ভাইটা খুব ঘন ঘন জ্বরে ভুগছে, ওকে একবার ভাল করে ডাক্তার দেখানো দরকার...। ভালবাসার কথাও আছে, একদম শেষের লাইনে।—তোমাকে ছাড়া দিনগুলো এখানে বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বিশেষত বিকেলবেলায়। তোমারও কি তখন আমার কথা মনে পড়ে দিশা!... মিহিরের চিঠির ছত্রে ছত্রে শুধু শরীর! কান ঠোঁট ঘাড় গাল গলা চুমু...। মিহিরের ভাষাটাই সবচেয়ে জবরদস্ত ছিল, পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। আশ্চর্য, আজ তেমন কিছুই হচ্ছে না। ভাষা তো একই আছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার অভিঘাত কত ক্ষীণ হয়ে গেল।

চিঠিগুলো স্বস্থানে রেখে ভেলভেটের ঢাকা আবার চেপে আটকাল বিদিশা। গয়নাগুলো ভরতে ভরতে এসে গেছেন ভারতী, টুকটাক কথা হচ্ছে এলোমেলো। প্রভাকরও উঠে পড়লেন, চা খেয়েই উশখুশ করতে লাগলেন তিনি, বেরোবেন। ঘড়ি দেখছেন ঘন ঘন।

এক সময়ে বলেই ফেললেন,—হ্যাঁ রে বুলু, তোর গাড়ি কখন আসবে রে?

—কেন?

—আমাকে তাহলে একটু হাজরায় নামিয়ে দিতিস।

বিদিশা হাসল,—ও আচ্ছা, আজ তো রবিবার! তোমার রিহার্সাল আছে বুঝি?

—আর বলিস কেন, নতুন নাটক নামছে...

ছোট্ট একটা শৌখিন নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত আছেন প্রভাকর। বহুকাল। এটাই তাঁর নেশা, ব্যসনও বটে। তাঁদের দলের একটি দুটি প্রয়োজনা এক সময়ে মোটামুটি নাম করেছিল, ইদানীং গ্রুপের অবস্থা তেমন ভাল নয়। পুরনো সদস্য হিসেবে দলের প্রতি প্রভাকরের প্রগাঢ় আনুগত্য, ঝড় জল বৃষ্টি বন্যা কোনও কিছুতেই তাঁকে রবিবার বিকেলে রুখে রাখা কঠিন।

বিদিশা চোখ নাচাল,—কী নাটক করছ এবার?

—ছেঁড়া শিকল।... দারুণ লিখেছে, বুঝলি? একটা খারাপ লোক ভাল হতে চায়,

কিছুতেই পারছে না। কত ধরনের ফোর্স যে তাকে আবার জটিল আবর্তে টেনে নিয়ে যাচ্ছে...

—বুঝেছি বুঝেছি। বাবার উৎসাহকে থামাল বিদিশা,—তোমার কী রোল?

—মেন রোল। হিরোর সেকেন্ড ভয়েস। অল্টার ইগোও বলতে পারিস। ...অবশ্য আমাকে স্টেজে দেখা যাবে না...

—ওহ, বাবা আবার তোমার সেই বিহাইন্ড দা কার্টেন অভিনয়?

—ওটাই তো আসল রে। যাকে স্টেজে দেখা যায় না, সে যদি নিজের উপস্থিতিটা ঠিক ঠিক ফিল করাতে পারে...। প্রভাকরের খাড়া নাক আরও খাড়া হয়ে গেছে,—প্রভাকর ঘোষ উইল স্টিল দা শো, তুই দেখে নিস।...এই সেপ্টেম্বরেই তো ফার্স্ট শো হবে।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। রবি। ঝটপট তৈরি হয়ে নিল বিদিশা। কাঠের বাক্সখানা প্লাস্টিকে মোড়াতে গিয়েও মোড়াল না, থাক গাড়িতেই তো থাকবে। বেশি মোড়ামুড়ি করলে অর্চিষ্মানের আবার কী কৌতূহল হবে ঠিক কী।

বিদিশা বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। চিত্রভানু মোড়ের চায়ের দোকানে গজগজ করছে, টেরিয়ে টেরিয়ে দেখল বিদিশাকে, তবে প্রভাকর রয়েছেন বলেই বোধহয় কাছে ঘেঁষল না। মনে মনে হাসল বিদিশা, আজ লেডি ডায়না কম্যান্ডো পাহারায়।

ছুটির বিকেল, রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকা ফাঁকা। গাড়িঘোড়া চলছে বটে, তবে তাদেরও কেমন শিথিল মেজাজ। অনেক দিন পর দুঃখী মেঘেরাও আজ আকাশ থেকে ছুটি নিয়েছে, হলুদ রোদে ঝকঝক করছে বিকেল। বাতাসে যেন শরতের গন্ধ টের পাওয়া যায়।

প্রভাকরকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি চলেছে পার্ক স্ট্রিটের পথে। নিচু পর্দায় গান চালিয়ে দিল রবি, বিদিশারই নির্দেশে। চপল হিন্দি গান। সুরের দোলায় মাথা দোলাচ্ছে বিদিশা।

লঘু গলায় জিজ্ঞাসা করল,—তোমার দাদার নিলামঘরের হাতুড়ি ঠোকাঠুকি আজ এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল?

রবি বাড়ির পুরনো ড্রাইভার হলেও কথা বলে অত্যন্ত কম। সংক্ষেপে জবাব দিল,—আজ্ঞে, শেষ হয়নি তো।

—মানে এখনও নিলাম চলছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—খুব ভিড়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহলে এত তাড়াতাড়ি গাড়ি পাঠাল কেন?

রবি নিরুত্তর।

বিদিশা মনে মনে একটু বিরক্তই হল। নিলামঘরের ভিড়ভাট্টায় যাওয়া তার একদমই পছন্দ নয়। মাস কয়েক আগে একবারই নিলামের দিন গিয়েছিল বিদিশা, নেহাতই কৌতূহলের বশে। মিনিট পাঁচ দশ থাকার পরেই এমন মাথা ধরে গেল! একুশশো একুশশো, তেইশশো তেইশশো, পঁচিশশো পঁচিশশো পঁচিশশো... অসহ্য। আজ হয়তো

তেমনটা নাও হতে পারে। হয়তো আন্দাজ করেই গাড়ি পাঠিয়েছে অর্চিষ্মান, সে পৌঁছতে পৌঁছতেই ডাক শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তারপরই কি সঙ্গে সঙ্গে অর্চিষ্মান উঠবে? নিজেই তো বলে, আফটার অকশন হাজারো বখেড়া থাকে। অর্থাৎ কিনা এখন গিয়ে ঘট হয়ে বসে থাকো কখন বাবু উঠবেন। আজ অবশ্য অর্চিষ্মান বারের কাজ দেখতে ঢুকবে না, জলদি জলদি ফিরবে, তাকে কথা দিয়েছে। তবু...। টুকিটাকি কিছু মার্কেটিং সেরে গেলে কেমন হয়? বুধবার অর্চিষ্মানের ভাগ্নির জন্মদিন, তার জন্য একটা কিছু তো কিনতেই হবে। নিজেরও গোটা কয়েক কসমেটিকস দরকার। তিন চারটে শেডের লিপস্টিক, একটা ব্লাশ অন...। বুধবার ননদের বাড়ির পার্টির জন্যে একটা ডিপ ব্লু আই শ্যাডো কিনলে কেমন হয়? বিদিশার যদিও আলাদা করে রূপটানের কোনও প্রয়োজন নেই, তবু নানা রকম প্রসাধনী ব্যবহার করতে বিদিশার মন্দ লাগে না।

যা ভাবা তাই কাজ। বিদিশা হুকুম ছুড়ল, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির অভিমুখ ঘুরে গেছে ক্যামাক স্ট্রিটের দিকে। আলো ঝলমল সুসজ্জিত এক মার্কেটিং কমপ্লেক্সের দরজায় এসে থামল গাড়ি।

দোকানে দোকানে ঘুরছে বিদিশা। মূল জিনিস কেনার আগে বেশ খানিকক্ষণ উইন্ডো শপিং সারল। এও সুখ, চোখের আরাম। দেখতে দেখতে একখানা দামি শিফন কিনে ফেলল। দু তিনটে দোকান ঘুরে ভাগ্নির জন্য দেড়হাজারি লংস্কার্ট কিনল একটা। সাজগোজের দোকানে ঢুকে লিপস্টিকের রং বাছছে।

তখনই হঠাৎ পিছনে রবি। বছর পঁয়তাল্লিশের ছোটখাট চেহারার লোকটা কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছে। চোখ বিস্ফারিত, গলায় স্বর ফুটছে না,—বউদি... বউদি... বউদি, আপনি ঠিক আছেন?

বিদিশা বেজায় চমকাল, —কেন, কী হয়েছে?

—আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন না?

—আমি? অজ্ঞান? না তো।

—তবে যে লোকটা বলল...

—কোন লোকটা?

—ওই যে... একটা ড্রাইভার! বলল, আপনি নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন... গাড়ির নম্বর দিয়ে আমাকে নাকি ডেকে আনতে বলেছেন... আমি সব দোকান খুঁজতে খুঁজতে আসছি...

—কে ড্রাইভার? কোথায়?

—ওই তো বাইরে। ...শালা আমায় ঢপ মারল? রবি উত্তেজিত মুখে এগোল,—আসুন, দেখবেন আসুন। ...হারামি কাঁহিকা...

হতচকিত বিদিশাও বাইরে এসেছে। রাস্তা টপকে গাড়ির কাছে গেল,—কোথায় সে? কই?

রবি উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। বিড়বিড় করে বলল,—এই তো এই মাত্র এখানে ছিল।... গলির মুখটায় গাড়ি পার্ক করে ভেতরে ঢুকল, হঠাৎ বেরিয়ে এসে...। গাড়িটাও তো নেই।... একদম আমাদের কালারের গাড়ি! মারুতি!

বিদিশার শিরদাঁড়া বেয়ে হিমস্রোত বয়ে গেল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সহসা যেন চাবুক মেরেছে। লাফিয়ে গাড়ির জানলায় গেছে, ঝুঁকে দেখল ভেতরটা। পরক্ষণে আর্ত স্বর ঠিকরে এল,—আমার বাক্স?

অর্চিষ্মান হুঙ্কার দিয়ে উঠল,—তুই গাড়ি লক করে যাসনি?

রবি ভয়ে ঠকঠক কাঁপছে। ঢোঁক গিলে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ। ...আজ্ঞে না। ...মানে ঠিক মনে পড়ছে না।... লোকটা এমন ভাবে ছুটতে ছুটতে এসে ডাকল...

—করছিলি কী তখন?

—আজ্ঞে গান শুনছিলাম।

—তোমার গান শোনা আমি ছোটাচ্ছি। নম্বর দেখেছিস গাড়িটার?

—খেয়াল করিনি।

—ওয়ার্থলেস ওয়ার্থলেস। প্রায় শূন্য নিলামঘরে দাপাচ্ছে অর্চিষ্মান,—কে না কে এসে কী ভড়কি দিল, ওমনি বাবু গাড়ি খুলে রেখে...

বার-কাম-রেস্তোরাঁর ম্যানেজার অম্বরীশ পাকড়াশি পাশেই দাঁড়িয়ে। স্যুট বুট পরা তালসিড়িঙ্গে শরীরটা ঝুঁকিয়ে বলে উঠল—স্যার, একটা কথা বলব?

অর্চিষ্মান কটমট তাকাল।

—রবিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই স্যার। আজকাল কত ধরনের যে ছিঁচকে চোর গজিয়েছে, পুটপাট গাড়ির লক খুলে ফেলে। হয়তো ম্যাডামের বাক্সটাকে সিটে লক্ষ করেই লোকটা...। তাছাড়া স্যার, একটা মারুতির চাবি দিয়ে অন্য মারুতি গাড়ি তো ইজিলি খুলে ফেলা যায়।

—হুম, তা অবশ্য ঠিক।

বলতে বলতে বিদিশার সামনে এসে বসল অর্চিষ্মান। নিলামঘরের অফিসে বিদিশা এখনও মাথা ঝুঁকিয়ে বসে, তার দিকে ভুরু কুঁচকে দেখল একটুক্ষণ,—কী কী অর্নামেন্ট ছিল বাক্সতে?

চোখ তুলল না বিদিশা। নিরক্ত মুখে বলল—তেমন দামি কিছু না...

—তবু শুনি কী ছিল?

—চুড়ি হার দুল... সবই ইমিটেশান।

—ঠিক বলছ?

বিদিশা ঘাড় নাড়ল।

—যাক, জোর বেঁচে গেছ তাহলে। যে শালা নিয়েছে সে তোমার বাপ চোদ্দো পুরুষ উদ্ধার করছে। স্বভাববিরুদ্ধ ভঙ্গিতে হা হা হেসে উঠল অর্চিষ্মান,—আর মন খারাপ করে কী করবে? ওঠো।

বিদিশার পা সরছিল না। হাঁটু অবশ, গোড়ালি অসাড়, কোমর থেকে দেহের নীচের অংশটুকু বুঝি আর কোনও দিন নাড়ানো যাবে না। তবু টেনে টেনে তুলল নিজেকে। সত্যিই কি ছিঁচকে চোরের কাণ্ড এটা? নাকি এ কোনও গভীর ষড়যন্ত্র?

বিদিশা আর ভাবতে পারছিল না। তার মস্তিষ্ক পুরোপুরি অকেজো হয়ে গেছে।

[নয়]

ফিরতি পথে গাড়িতে নিশ্চুপ ছিল বিদিশা। কোনও কিছুই আর সুস্থিত ভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা নেই অসাড় মস্তিষ্কের। ভাবনারা ধেয়ে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে, তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে বার বার। কেন এমন দশা হল তার? মাত্র ছটা মাসও কাটল না, এর মধ্যেই কেন অমানিশার ছায়া পড়ছে জীবনে? গরিব কেরানির মেয়ে হয়ে জন্মে, রূপ যৌবনকে পুঁজি করে সে যদি একটু আনন্দ খুঁজেই থাকে, তা কী এমন গভীর অপরাধ? বিয়ের আগে কত মেয়ের জীবনেই তো কত পরপুরুষ আসে, তাকে নিয়েই বা বিধাতা নিষ্ঠুর খেলা শুরু করলেন কেন?

নিষ্ঠুর খেলা, নাকি নিছকই কৌতুক? তার পাপমন কি অহেতুক বেশি বেশি ভয় পাচ্ছে? হয়তো ফোন আসাটা ঠাট্টাই। অর্ক তো বলছিল এমন নাকি আখছার ঘটছে আজকাল। হয়তো আজকের চুরিও নেহাতই কোনও ছিঁচকে চোরের কাণ্ড। কিংবা কোনও কেপমারি দলের। তারা তো এমন বিলাসবহুল বাজারের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, নিত্যনতুন উপায়ে ঠগবাজি করে, হয়তো বিদিশাকেই টার্গেট করেছিল আজ, মাঝখান থেকে বেচারা রবি...। তবু মন সান্ত্বনা পায় কই? ঈশ্বর জানেন, বিয়ের আগে যাই করে থাকুক, বিয়ের পর থেকে বিদিশা অর্চিষ্মান ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পুরুষের কথা ভাবেনি। তবে এই শাস্তি কেন? অহর্নিশি এই দহনের হাত থেকে কি বিদিশার মুক্তি নেই?

চিন্তার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দি বিদিশা অর্চিষ্মানের গলা শুনতে পেল,—কী গো, এখনও শোকে মুহ্যমান?

—উঁ? বিদিশা আলগা ঘাড় নাড়ল,—নাহ্।

—বললেই হল? গুম মেরে বসে আছ, বাপের বাড়ির গপ্পো শোনাচ্ছ না...। বাক্সয় শুধু ঝুটো গয়নাই ছিল শুনে অর্চিষ্মানের উষ্মা চলে গেছে, সে এখন দিব্যি তামাশার মেজাজে। রঙ্গের সুরেই বলল,—তোমরা মেয়েরা পারোও বটে। কেয়ারলেসের মতো কাজ করবে, আর থপাস থপাস কপাল চাপড়াবে।

বিদিশা কষ্ট করে হাসল,—নাগো বিশ্বাস করো, গয়নার কথা ভাবছি না।

—তাহলে কী ভাবছ?

—ভাবছি...ভাবছি দুম করে কীরকম বোকা বনে গেলাম। পথেঘাটে হঠাৎ পিকপকেট হয়ে গেলে কেমন আপসেট লাগে না? কিংবা গলা থেকে যদি আচমকা একটা হার ছিনতাই হয়ে যায়...হোক না সে মেকি হার...

—বুঝলাম।

—কী বুঝলে?

—বোকা বনতে তোমার বেজায় আপত্তি। অর্চিষ্মান মৃদু হাসল,—কিন্তু ম্যাডাম, বোকা কারা বনে জানো?

—কারা?

—চালাকরা, অফকোর্স। বোকারা তো বোকা আছেই, তাদের বোকা বনার প্রশ্নই

নেই। সুতরাং মনোকষ্টে না ভুগে গর্ব অনুভব করো। তুমি চালাক বলেই কেউ একজন তোমায় বোকা বানাতে পেরেছে।

অন্য সময় হলে অর্চিষ্মানের যুক্তি শুনে হাসত বিদিশা। এখন হাসল না বটে, তবে কিছুটা সহজ হল। বলল,—তাই হবে।

—অমন করে বোলো না। আটার ইট উইথ এ স্মাইল। অর্চিষ্মান হাত রাখল বিদিশার পিঠে,—তোমার রিকোয়েস্টে আজ সন্ধেটা ফ্রি করে ফেললাম, এখন তুমিই যদি মুখ গোমড়া করে থাকো...চলো, নাইট শোয়ে একটা সিনেমা যাবে?

—সিনেমা?

—হ্যাঁ, সিনেমা। ফিল্ম। ছায়াছবি। চলো, গাড়ি ঘুরিয়ে এসপ্ল্যানেডের দিকে যাই। একটু ঘুরে টুরে, খেয়ে দেয়ে হলে ঢুকে যাব।

—বাবাকে যে বলা নেই! বাবা যে আমাদের জন্য বসে থাকবেন, খাবেন না।

—ফোন করে দিচ্ছি।...চলো, লাইটহাউসে তোমার হিচককের একটা বই এসেছে, দেখে আসি।

এমনিতে অর্চিষ্মানের সঙ্গ পাওয়াই দুর্লভ। আজ অর্চিষ্মান বিদিশাকে নিয়ে বাইরে খাবে, সিনেমায় যাবে, এমন লোভনীয় প্রস্তাবে বিদিশার লাফিয়ে ওঠার কথা, কিন্তু বিদিশার কিছুতেই কিছু ভাল লাগছে না। আলগা ভাবে জিজ্ঞাসা করল—কী ছবি?

—দা ম্যান হু নিউ টুউ মাচ। কলেজ লাইফে বইটার খুব নাম শুনেছিলাম। ট্রাম্পেট না কী একটা বাজনার সঙ্গে একটা গুলি চালানোর ঘটনাকে মিশিয়ে দারুণ সাসপেন্স আছে।...তুমি কি আগে দেখেছ?

—না।

—চলো তাহলে। হিচককের বই-এর মজাই আলাদা। রহস্য সব সময়েই এক্সপোজড, কিন্তু সারাক্ষণ একটা চাপা টেনশানে ছটফট করতে হয়, ঠিক কি না? ক্রাইমটা হব হব করছে, অথচ হচ্ছে না। কিংবা ক্রিমিনাল সামনে ঘোরাফেরা করছে, ধরা পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না। এটাই খুব ইন্টারেস্টিং, কি বলো?

পলকের জন্য অর্চিষ্মানের চোখে যেন দিঘার ঝলক দেখতে পেল বিদিশা। অস্বস্তি মাখা গলায় বলল,—আজ থাক।

—কেন, থাকবে কেন?

—দিদি কাল ফোনে বলছিল আজ সন্ধেয় আসতে পারে।

—অ।

অর্চিষ্মানের উচ্ছ্বাস নিবে গেল। মুখ ঘুরিয়ে রাস্তা দেখছে। পার্ক সার্কাস ছাড়িয়ে বাইপাস অভিমুখে ছুটছে গাড়ি, এলোমেলো ভিড় ফাঁকা হয়ে আসছে ক্রমশ। পথের দু ধারে নাগরিক সন্ধ্যার আবছায়া।

বিদিশার নতুন অস্বস্তি শুরু হল। হু-হু হাওয়া ঢুকছে জানলা দিয়ে, তবু যেন গাড়ির মধ্যে গুমোট ভাব কাটছে না। নৈঃশব্দ্যও বুঝি অনেক সময়ে বাতাসকে শুষে নেয়।

অর্চিষ্মানের দিকে সামান্য সরে এল বিদিশা। ঠাণ্ডা হাত রেখেছে স্বামীর হাতে,—এই, রাগ করলে?

অর্চিষ্মান চুপ।

—দিদি সেই শালকিয়া থেকে উজিয়ে আসবে, আমাদের কারুর সঙ্গে দেখা হবে না...

—হুম্।

—কোনও দিনই তো তোমাকে পাওয়া যায় না, একটা দিন নয় সারা সন্ধে বাড়ি থাকলেই।

—জো মর্জি। অর্চিষ্মান হাসল এতক্ষণে,—ওদিকে গেলে তোমারই লাভ হত। একটা নতুন জিনিস দেখাতাম। পছন্দ হলে আজই কিনে নেওয়া যেত।

—কী গো?

—আনসারিং মেশিন। টেলিফোনের। ফরেন মাল। আমার এক কাস্টমারের শোরুমে এসেছে। শুধু মেসেজ রেকর্ডই হয় না, কেউ রিং করলেই তার নাম্বার সঙ্গে সঙ্গে মেশিনে উঠে যায়। আর ভয়েস তো টেপ করাই যাবে।

—তাই?

চকিতে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠেছে বিদিশার মাথায়। যদি লোকটা আবার ফোন করে তার হদিশ তাহলে পাওয়া যাবে? গলাও তুলে রাখা যাবে টেপে? আর তো তাহলে লোকটা নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না!

সঙ্গে সঙ্গে আরেক চিন্তা এসে হাড় হিম করে দিল বিদিশার। লোকটা যদি তার অনুপস্থিতিতে ফোন করে? তখনও তো নাম্বারটা উঠে থাকবে? যদি অর্চিষ্মানের চোখে পড়ে যায়...?

অর্চিষ্মান কাঁধ ঝাঁকাল,—কী, চাই নাকি?

বিদিশা ঢোক গিলল,—আমাদের ও মেশিনে কী দরকার? তোমার বিজনেস ফোন তো বেশি সেলুলারেই আসে। ক্বচিৎ কখনও হয়তো দু চারটে,...সেও তো হয় সক্কালে নয় রাতে। তখন তো তুমি বাড়িতেই থাকো।

—আমার জন্য বলছি না। তোমারই লাভ হত।

—আমার! কেন?

—কোনও উড়ো ফোন ধরে ফেলতে পারবে।

—আমার উড়ো ফোন আসবে কেন? বিদিশার তালু শুকিয়ে গেল।

—সে কী! দেশের ফোন-রোমিওরা কি মরে গেছে? অ্যাম আই টু বিলিভ, তোমার মতো সুন্দরীকে কেউ কক্ষনও ডিসটার্ব করে না?

অতি কষ্টে উত্তেজনা চাপল বিদিশা। স্বর স্বাভাবিক রাখতে গিয়ে গলাটা ঘড়ঘড়ে হয়ে গেল,—উল্টোপাল্টা ফোন এলে আমার পাত্তা দিতে ভারী বয়ে গেছে।

—কেউ যদি বার বার জ্বালাতন করে তাও জানতে ইচ্ছে করবে না?

—আমার অত কৌতূহল নেই।

—তাহলে থাক, কিনো না।

কথায় কথায় বাইপাস বেয়ে লবণহ্রদ উপনগরীতে ঢুকে পড়েছে গাড়ি। বর্ষায় রাস্তায় প্রচুর খানাখন্দ। পথবাতিগুলো সব জ্বলছে না, কিছু কিছু আলো ঢাকা পড়ে আছে গাছের আড়ালে। রবি বেশ সামলে সুমলেই গাড়ি চালায়, তাও ঘটাং ঘটাং লাফাচ্ছে ইস্পাতনীল

মাকড়সার লম্বু তনু, অন্ধকার ঘন হচ্ছে অন্দরে।

নিজের ভেতর নিজেই সঙ্কুচিত বিদিশা বাড়ি ঢুকে দেখল অর্চনা আর পূষন এসে গেছে, দক্ষিণের বারান্দায় বসে কথা বলছে দিননাথের সঙ্গে। কী এক বীভৎস অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে হাওড়া ব্রিজে, একটা ট্যাক্সি কীভাবে থেঁতলে দিয়েছে এক যুবককে, তারই বিশদ বর্ণনা দিচ্ছে পূষন। সাড়ম্বরে।

বিদিশাকে দেখে পূষন আবার প্রথম থেকে শুরু করতে যাচ্ছিল, অর্চনা বলল—থাক, বাচ্চা মেয়েটার সামনে আর ওসব বলতে হবে না।

বিদিশা জিজ্ঞাসা করল—তোমরা চা খেয়েছ দিদি?

—তোর শ্বশুরমশাই খেতে দিল কই! আধঘণ্টা ধরে বসে আছি, খালি বলছে, একটু বোস এক্ষুনি আমার বেটি এসে পড়বে।

পূষন বলল—এক দিক দিয়ে ভালই হয়েছে। সুমতির সার্ভ করা চায়ে আমি টেস্ট পাই না। অন্তত বিদিশা আসার পর থেকে।

পূষনের সরস মন্তব্যে অর্চিষ্মান যেন তেমন প্রীত হল না। একটা দুটো নিয়ম রক্ষার কথা বলে চলে গেছে নিজের শিবিরে।

বিদিশা চা জলখাবার সাজিয়ে টেবিলে ডাকল সকলকে। বসতে বসতে অর্চনা জিজ্ঞাসা করল—তোরা তাহলে বুধবার কখন আসছিস?

স্মিত মুখে বিদিশা বলল—যখন তোমার ভায়ের সময় হবে।

—বুধবার তো নিলামঘর বন্ধ, দুপুরেই সবাই চলে যায় না। তোরা তো একদমই যাস না, তাও ভাশুরের নাম করে নয় কটা ঘণ্টা বেশিই কাটিয়ে এলি।

—দেখি।

—উহুঁ, দেখি নয়। অবশ্যই যাবি। বাবলু পরে যায় যাক, তুই আর বাবা আগে চলে যাবি। মুন্নি না হলে খুব দুঃখ পাবে।

দিননাথ চায়ের কাপ টানতে টানতে বললেন,—আমাকে বাদ দে না খুকি। অদূর ঠেঙিয়ে যাওয়া আমার আজকাল আর পোষায় না রে।

—বাজে কথা বোলো না তো বাবা। গান শুনতে রোজ হিল্লি দিল্লি ছুটছ, মেয়ের বাড়ি যেতেই যত আলিস্যি!

পূষন ফুট কাটল,—আপনার একমাত্র নাতনি এবার পঞ্চদশী হচ্ছে। এই অকেশানটা মিস করবেন না বাবা। পার্টিটাও এবার খুব জম্পেশ দিচ্ছি। প্রায় শ দেড়েক ইনভাইটেড।

—সে শো! জন্মদিনে?

—হ্যাঁ, তা তো হবেই। মুন্নির বন্ধুই আসছে জনা পঞ্চাশেক। স্কুল পাড়া নাচের ক্লাস...কিছু টিচারও আছে। তারপর ধরুন আমার ফ্যাক্টরির স্টাফরা, লোকাল সার্কল, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, আপনারা আছেন...

—এ কিন্তু অপচয়। দিননাথ গজগজ করছেন,—নিজেই বলো ব্যবসার হাল ভাল নয়...

—ব্যবসার ওঠা পড়ার জন্য আমোদ আহ্লাদ কি থেমে থাকবে বাবা?

পূষনের কথার মধ্যে যথারীতি কেয়ারফ্রি ভাব। বয়স বছর চল্লিশ, রীতিমত রূপবান,

পোশাক আশাকেও দেখনদারি আছে। অর্চনার সঙ্গে একই কলেজে পড়ত পূষন, একই ক্লাসে। অর্চনার গোলগাল মোটাসোটা চেহারা গিন্নি গিন্নি হয়ে গেছে বটে, পূষন এখনও দিব্যি লক্কা পায়রা।

দিননাথের সঙ্গে মেয়ে জামাই-এর কথোপকথনের মাঝে ফিরে এসেছে অর্চিষ্মান। ধরাচূড়ো ছেড়ে, পাজামা পাঞ্জাবি শোভিত হয়ে। তাকে দেখা মাত্র পূষনের আলাপের বিষয় বদলে গেল। নতুন একটা ব্যবসার মতলব এসেছে পূষনের মাথায়, চাল রপ্তানি করবে বাংলাদেশে, তারই লাভ ক্ষতির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হল অর্চিষ্মানের সঙ্গে। নামেই আলোচনা, কথা বলছে পূষন একাই, অর্চিষ্মান শুধু ঘাড় নাড়ছে মাঝে মাঝে। ব্যাংক, ওভারড্রাফট, এল সি, প্যাকেজিং...আরও যে কত শব্দ ফুটছে পূষনের মুখে!

বিদিশার ক্লান্ত লাগছিল। এক সময়ে টুক করে সরে এল নিজের ঘরে। শাড়ি বদলাল, মুখ হাত ধুল, গালে কপালে অ্যাসট্রিনজেন্ট মাখল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে নিজেকে। হঠাৎ হঠাৎ ধক ধক করে উঠছে বুক। বেশ তো ছিল বাক্সটা, কেন যে মরতে আজ মার কাছ থেকে নিতে গেল! ও বাড়িতেও তো পুড়িয়ে দিতে পারত চিঠিগুলো, মাকে কিছু একটা ভুজুং ভাজুং দিয়ে নিলেই হত।

—কী ম্যাডাম, আপনাদের আজকাল নাকি খুব চুরিচামারি হচ্ছে?

হঠাৎই আয়নায় ছায়া। পূষন একেবারে ঘরে ঢুকে পড়েছে। রীতি সহবতের ধার ধারে না লোকটা, জিজ্ঞেস না করেই অবলীলায় বিদিশার ঘরে চলে আসে। ভাবটা এমন, যেন এ বাড়ির প্রতিটি ইট কাঠ দেওয়ালে তারও একটা অধিকার আছে।

বিরক্ত ভাবটা প্রকাশ করল না বিদিশা। আলগোছে হাসল একটু।

পূষন সোজা খাটে গিয়ে বসল। চোখ বিদিশার স্থির,—একটা কথা বলব ম্যাডাম? কনফিডেনশিয়াল।

—বলুন।

—দোকানের চুরিটা নয় রাত্তিরে হয়েছে, কর্মচারীরা নেগলিজেন্ট, কিন্তু গয়নার ব্যাপারে আপনি এত ক্যাজুয়াল হলেন কী করে? এ তো মেয়েদের স্বাভাবিক ধর্ম নয়?

বিদিশা ঠোঁট বেঁকাল,—অর্চিষ্মান বলেনি গয়নাগুলো ঝুটো ছিল?

—বলল, কিন্তু...। পূষন দম নিল একটু। তারপর চাপা স্বরে বলল,—ব্যাপারটা এরকম নয় তো, গয়নাগুলো হয়তো আসলই, বাবলুকে ভয় পেয়ে আপনি ইমিটেশান বলে চালাচ্ছেন?

—যাহ্, ও রকম কেউ বলে নাকি?

—মেয়েরা গয়নার ব্যাপারে স্বামীকে সহজে সত্যি কথা বলে না। এই যে আপনার ননদ ইয়া ইয়া নেকলেস পরে ঘুরত, আট বছর পরে আমি আবিষ্কার করেছি ওগুলো সব ইউনিক না ফিউনিক কীসের যেন। আসল মাল সব লকারে চালান করে রেখেছে।

বিদিশা মনে মনে বলল, বেশ করেছে। তোমার মতো লুঠেরার কাছে সত্যি কথা বলে সব খোয়ায় আর কি!

মুখে বলল,—আমার অর্চিষ্মানকে মিথ্যে বলার প্রয়োজন হয় না।

—রিয়েলি? সব সত্যি বলেন?

—হ্যাঁ।

—জীবনের কোনও কথাই বাবলুর কাছে গোপন করেননি?

—মানে?

—এই দেখুন আপনি ভয় পেয়ে গেলেন। পূষন খ্যাক খ্যাক হাসল,—শুনুন, প্রাইভেটলি একটা কথা বলি আপনাকে। বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি। অর্চিষ্মান রুদ্র কিন্তু পূষন রায় নয়। ইউনিক আর সোনার পার্থক্যটা সে ঠিক বুঝে ফেলে।

বিদিশা আবার বলল,—মানে?

—বাবলু ইজ বেসিক্যালি সাসপিশিয়াস টাইপ। একবার যদি সন্দেহ হয় কেউ কিছু লুকোচ্ছে তো তার দফা রফা।

বিদিশার এবার বেশ রাগ হয়ে গেল। শালীনতার প্রলেপ রেখেই ঝাঁঝ ফোটাল গলায়,—আমি তার কাছে কিছু লুকোতে যাবই বা কেন?

—ভাল। তাহলেই মঙ্গল।

কথাটা শূন্যে ভাসিয়ে উঠে গেল পূষন। বিদিশা কাঠ। এ সব কী বলে গেল লোকটা? কেন বলল? পূষন রায়ের কথায় কিসের যেন প্রচ্ছন্ন ইশারা!

তুৎ, পূষনদা তো সব সময়েই এরকম রহস্য করে কথা বলে। খামোখা সে ভয় পাচ্ছেই বা কেন?

অর্চনা হলঘর থেকে চেঁচিয়ে বিদিশাকে ডাকছে। সাড়া দিতে স্বর ফুটছিল না বিদিশার। তবু তড়িঘড়ি ছুটল ও ঘরে, একা থাকলে ভাবনাটা তাকে পাগল করে দেবে।

একটা মাত্র টেলিফোনের এত শক্তি? এমন ভাবে লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে সব কিছু?

একটা নয়, টেলিফোনটা আবার এল। দ্বিতীয় বার। পর দিনই। দুপুরবেলা।

এবারের স্বর আরও শীতল। আরও ধাতব। আরও নির্মম।

[দশ]

—সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ এসে গেছি দিদি।

—উঁ?

—এবার কোন দিকে যাব?

—উঁ?

—বলছি, যাবেন কোথায় এবার? বাঁয়ে, না ডাইনে?

তৃতীয় বার প্রশ্নের পর হুঁশ ফিরল বিদিশার, ধড়মড়িয়ে তাকাল এদিক ওদিক। ট্যাক্সি গ্রে স্ট্রিটের ট্রাম লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে, ও ফুটপাথে শোভাবাজার মেট্রো স্টেশন। অর্থাৎ বিদিশা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে।

পিছনে অটো রিকশার পাল। গঁ গঁ করছে। মিটারে কত উঠেছে না দেখেই ব্যাগ হাতড়ে ঝটিতি একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট ড্রাইভারের হাতে গুজে দিল বিদিশা, খুচরো

ফেরতের অপেক্ষা না করে ট্যাক্সির দরজা খুলে নেমে পড়ল। এগোচ্ছে দক্ষিণমুখো, সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ ধরে...বিডন স্ট্রিটের দিকে। পড়ন্ত দুপুরে এখনও চড়া রোদের ঝাঁজ, চিড়বিড় করছে গা, ঘাম ঝরছে দরদর। বিদিশা হাঁটছে না, প্রায় ছুটছে, তবু পথ যেন ফুরোয় না। মাত্র তো শ দেড় দুই গজ গিয়ে রাস্তা পেরোবে, এইটুকু পথকেই কী অসীম মনে হচ্ছে এখন! অথচ এই পথে পরশুও...

অর্কদের গলির মুখে এসে বিদিশা পলকের জন্য থমকাল। নোংরা আবর্জনার স্তূপ বিশ্রি দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। নাকে আঁচল চাপতে গিয়েও চাপল না বিদিশা, এই গন্ধই যেন তার প্রাপ্য এখন। ওদিকে এক বাড়ির দরজায় দুটো মেয়ে উগ্র সাজগোজ করে দাঁড়িয়ে, তাদের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বিদিশা চোখ নামিয়ে নিল। অন্য দিনের মতো অস্বস্তিতে নয়, বুঝি বা আত্মধিক্কারে। সে কি ওই মেয়ে দুটোর চেয়েও হীন জীবনযাপন করে না? শ্রমহীন, পরগাছার জীবন? সেই পরভৃৎ জীবনের আয়েশটুকু টিকিয়ে রাখতেই না আজ তার এই আকুল ছোটাছুটি? কেন যে সে নিজেকে অন্যভাবে গড়ে তোলার কথা ভাবতে পারল না কোনও দিন? সমুদ্রে অর্চিষ্মান বলেছিল, তোমার পায়ের নীচ থেকে যদি কখনও মাটি সরে যায়...!

অসম্ভব। বিদিশা কিছুতেই তার সুখ হাতছাড়া করতে পারবে না। তার জন্য যে মূল্যই দিতে হোক না কেন, বিদিশা প্রস্তুত।

ক্ষণিকের সন্তাপ ক্ষণিকে উধাও। অর্কর দরজায় কড়া নাড়ছে বিদিশা। অধৈর্য হাতে।

অর্ক নয়, সামনে অর্কর মাসি। সুপ্রভা।

বিদিশাকে দেখেই সুপ্রভার কপালে ভাঁজ,—তুমি! কী ব্যাপার?

সুপ্রভা এ সময়ে ঘরে থাকবেন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি বিদিশা। ঝাঁকুনিটা সামলে নিয়ে অতি কষ্টে হাসল। ঈষৎ অপ্রতিভ স্বরে বলল,—অর্ক আছে মাসিমা?

—কেন? তাকে আর কী দরকার?

—দরকার নেই। এমনিই...। বিদিশা ঢোক গিলল,—অনেক দিন খোঁজ নেওয়া হয় না...কাছেই এসেছিলাম...

—তুমি তো পরশুও এসেছিল!

— হ্যাঁ...মানে...। বিদিশা আর কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। একটু একটু রাগও হচ্ছিল অর্কর ওপর। কী বেআক্কেলে ছেলে রে বাবা! পেয়ারের মাসিকে ব্যাক ব্যাক করে সব কথা না বললে কি ঘুম হয় না!

সুপ্রভার চোয়াল কঠিন হয়েছে,—আবার কেন অর্কর কাছে আসছো বলো তো? তোমার নাকি বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে...! আমার ভালমানুষ বোনপোটাকে তো অনেক কষ্ট দিয়েছ, আর কেন?

বিদিশা কাচুমাচু মুখে বলল,—বিশ্বাস করুন, বিয়েতে আমার কোনও হাত ছিল না। বাবা মা জোর করে...। আমি অর্কর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি।

—তাতেই বুঝি সব চুকে বুকে গেল? সুপ্রভা খরখর করে উঠলেন,—জানো, আবার এসে ছেলেটার কী দশা করে গেছ? পরশু সারা দিন ছেলেটা দাঁতে কুটোটি কাটেনি, সারা রাত ঘুমোয়নি...

বিদিশা এবার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করল। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। কান্নার সবটা বোধহয় অভিনয়ও নয়, ভেতরের জমাট উত্তেজনাও অশ্রু হয়ে গলে গলে বেরিয়ে আসছে।

সুপ্রভা সামান্য নরম হলেন। দরজা ছেড়ে দাঁড়িয়েছেন,—এসো, ভেতরে বোসো।

—আছে অর্ক? বিদিশার চোখ জ্বলে উঠল।

—এ ঘরের পাখাটা চলছে না, ভেতরের ঘরে ঘুমোচ্ছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই অর্ক এল ঘরে। বিদিশার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল একটুক্ষণ, বুঝি বা কিছু আন্দাজও করল।

প্যাসেজের দরজায় অটল সুপ্রভাকে বলল,—মাসি, দু কাপ চা করে দেবে?

সুপ্রভা সরতেই বিদিশা খপ করে চেপে ধরেছে অর্কর হাত। চাপা স্বরে আর্তনাদ করে উঠল,—অর্ক প্লিজ আমায় বাঁচাও।

এক মুহূর্ত বুঝি বিদিশার স্পর্শ অনুভব করল অর্ক। পরমুহূর্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে। মৃদু স্বরে বলল,—মাসি যখনই বলল তুমি আবার এসেছ, তখনই বুঝেছি...

—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমাকে মনে হয় আত্মহত্যা করতে হবে।

—আবার কী হল?

—সেই ফোনটা আবার এসেছিল। আজ। দুপুরবেলা।

—কী বলেছে?

—ওই সেই। টাকা চাই। পঞ্চাশ হাজার। বিদিশার গলা থরথর কাঁপছে,—এবার আর আমার নিস্তার নেই।

—কেন?

দরজায় সুপ্রভার ছায়া পড়ছে, সেদিকে চোখের ইশারা করল বিদিশা। ফিসফিস করে বলল,—সে অনেক কথা। এখানে কি বলা যাবে?

ইঙ্গিত বুঝল অর্ক। দেওয়ালের ব্র্যাকেট থেকে পাঞ্জাবি নিয়ে গলিয়েছে গায়ে। গলা উঠিয়ে বলল,—মাসি, চা করতে হবে না, থাক।

সুপ্রভার মুখ উঁকি দিল,—কেন রে?

—বিদিশার ফেরার তাড়া আছে, ওকে এগিয়ে দিয়ে আসছি।

—দেরি করিস না কিন্তু।

পথে নেমে বিদিশা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সুপ্রভা সদর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। কটমট চোখে দেখছেন বিদিশাকে।

মাথা নীচু করে হাঁটতে হাঁটতে বিদিশা বলল,—তোমার মাসি আজ অফিস যাননি?

—না। গা ম্যাজম্যাজ করছে বলছিল। আজকাল মাঝে মাঝেই কামাই করে। বয়স হচ্ছে তো, রোজ রোজ অফিস বোধহয় আর পেরে ওঠে না।

—মেজাজটাও আজ মাসির খারাপ মনে হল।

অর্ক যেন কথাটা শুনেও শুনল না। কেজো স্বরে বলল,—হ্যাঁ শুনি, কেন টাকা না দিলে তোমার নিস্তার নেই?

উত্তরটা মোটামুটি সাজিয়েই রেখেছিল বিদিশা। চিঠির বাক্স চুরির কাহিনীটা বলল,

তবে সেই বাক্সে যে মিহির অরুণের চিঠিও ছিল সে কথাটুকু সচেতনভাবে চেপে গেল।

অর্ক একটু ভেবে নিয়ে বলল,—টেলিফোনের সঙ্গে তুমি চুরিটাকে মেলাচ্ছ কীভাবে? ওটা তো কাকতালীয়ও হতে পারে।

—মোটেই না। লোকটা টেলিফোনে তোমার চিঠির লাইন পড়ে পড়ে শোনাচ্ছিল। ওর কাছে নাকি আমাদের ছবিও আছে।

—ছবি?

—হ্যাঁ, তাই তো বলল। প্র্যাকটিসের পর তুমি আমার সঙ্গে অনেক দিন রেড রোড ধরে ফিরতে না, সেই সময়কার। ...তোমার হাত নাকি আমার কাঁধে, আমার হাত নাকি তোমার কোমরে বেড় দিয়ে আছে...

—অসম্ভব। এরকম ছবি থাকতেই পারে না।

—আমিও তো জানি অসম্ভব। কিন্তু যদি সত্যি হয়? যদি কেউ শয়তানি করে আড়াল থেকে তুলে থাকে?

—কে হতে পারে? কে আমাদের এমন শত্রু ছিল? বলেই অর্ক হো হো হেসে উঠেছে,—সে জানলই বা কী করে তোমার সঙ্গে আমার বিয়েটা সত্যিই ঘটবে না?

—তুমি হাসছ?

—হাসব না? যে ছবি তুলেছে সে কি আগে ভাগেই জানত নাকি তোমার একটা বড়লোক বর হবে? আর তারপর সে তোমাকে ওই ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করবে?

—আমি জানি না। আমি কিচ্ছু জানি না। বিদিশা প্রকাশ্য রাস্তাতেই প্রায় ককিয়ে উঠল,—লোকটার ক'থা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমার কী হবে সেটা একটু ভাবো। চিঠিগুলো যে তার হাতে আছে এতে তো কোনও সন্দেহ নেই।

—হুঁ, তা অবশ্য ঠিক। অর্কর মুখ থেকে হাসি সরল,—লোকটা কি সত্যি সত্যি আমার চিঠি পড়ে শুনিয়েছে?

—না তো কি আমি বানিয়ে বলছি?

—তা নয়। ...আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলাম।

—কী কথা?

—লোকটা তার মানে জানত তুমি বাপের বাড়ি থেকে চিঠির বাক্স নিয়ে আসছিলে! আই মিন, তুমি যে ওই বাক্সতেই চিঠি রাখতে সেটাও লোকটার অজানা ছিল না।

—কী বলতে চাইছ?

—আমার মনে হয় লোকটা আননোন কেউ নয়। তোমারই ক্লোজ কেউ। এবং সে দেখেছে তুমি বাক্সটা নিয়ে চলে আসছ।

—তারপর সে আমায় ফলো করেছে?

—সোজা হিসেব তো তাই বলে। অর্ক চোখ সরু করল,—বাক্সটা নেওয়ার সময়ে তোমায় কে কে দেখেছে?

—মা ছিল।

—আর?

—বাবা।

—আর কেউ? ...ডোন্ট মাইন্ড, তুমি এক সময়ে তোমার দাদার নামে অনেক কিছু বলতে। বাই এনি চান্স...

—না, দাদা নয়। আমি শিয়োর। দাদা তার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছিল। তাছাড়া এই ব্ল্যাকমেলিং... পঞ্চাশ হাজার... না, এ কাজটা দাদার দ্বারা হবে না।

—কী করে শিওর হচ্ছ?

—আমি দাদাকে বাজিয়ে দেখেছি।

কথাটা যেন বুলেটের মতো বেরোল বিদিশার মুখ থেকে। অর্ক অবাক চোখে দেখল বিদিশাকে। তারপর ধীরে ধীরে এক বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠছে তার ঠোঁটে,—যেমন পরশু তুমি আমায় বাজিয়ে দেখছিলে?

বিদিশা চোখ নামিয়ে নিল।

অর্ক ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল,—তুমি বড় নিষ্ঠুর দিশা। প্রায় ওই ব্ল্যাকমেলটার মতোই।

—আমি প্র্যাকটিকাল। বিদিশা ঘড়ঘড়ে গলায় বলল,—তুমি আমায় সাহায্য করবে কিনা বলো? নয়তো।...

—নয়তো কী?

—আগেই তো বলেছি। সুইসাইড করব।

—প্র্যাকটিক্যাল মেয়েরা সুইসাইড করে না।

বিদিশা তর্কে গেল না। অর্কও নীরব। হাঁটছে পাশাপাশি। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ-এর চওড়া ফুটপাথ ধরে। প্রায় নিঃশব্দেই রাস্তা পার হল দুজনে, ছোট্ট একটা পার্কে ঢুকল। কোণের এক বেঞ্চে বসেছে। এই বেঞ্চ তাদের পরিচিত, এখানেও তাদের অনেক সঘন মুহূর্ত জমা আছে।

বিদিশার অবশ্য অত মনে টনে পড়ার সময় নেই। বসেই সে অর্কর মুখের দিকে তাকিয়েছে,—কী ভাবছ? কিছু সলিউশন পেলে?

অর্ক দু দিকে মাথা নাড়ল।

—তাহলে আমি এখন কী করব?

—বলব? বললে শুনবে?

—কী?

—ব্ল্যাকমেলিংটা খুব খারাপ চক্কর। এতে একবার যে গেঁথে যায় তার পক্ষে মুক্তি পাওয়া কঠিন। অর্ক গলা ঝাড়ল। ঘনায়মান প্রসন্ন বিকেলের দিকে তাকিয়ে উদাস স্বরে বলল,—তুমি বরকে সব কথা খুলে বলো। নিজের অতীত ভুলভ্রান্তির জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও। তোমার স্বামী তো খুব ভাল লোক, তুমিই বলেছ। একটা বোগাস বেকার ভ্যাগাবন্ডের সঙ্গে তোমার প্রেম হয়েছিল, এবং তাকে তুমি কীভাবে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছ, কেন দিয়েছ, সব খুলে বললে তিনি কি আর তোমার ওপর রাগ করতে পারবেন?

বিদিশার বুকটা ধকধক করে উঠল। মনে মনে বলল, তুমি যদি একা হতে তাহলে আমি নয় চেষ্টা করে দেখতাম। কিন্তু ভাস্কর আছে, মিহির আছে, অরুণ আছে...কত জনের কথা বলব আমি? ব্ল্যাকমেলার কি শুধু অর্কর কথাই বলেছে?

মুখে বলল,—ওটা হয় না। হলে তো আমি তোমার কাছে আসতাম না।

—কেন হয় না দিশা? যদি বলো তো আমি নিজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি। তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারি। সত্যের একটা নিজস্ব জোর আছে, মহা পাষণ্ডও তাকে অবহেলা করতে পারে না। কী, যাব আমি?... আমি স্পোর্টসম্যান, নিজের পরাজয়ের কথা বলতে আমার লজ্জা হবে না।

নীল আকাশ যেন পাঁশুটে হয়ে গেল হঠাৎ। বিদিশা সভয়ে বলল,— না না না। এমনটি কক্ষনও কোরো না। অর্চিম্যান ভীষণ সেন্সেটিভ। পজেসিভ। ছেলেমানুষ ধরনের। বউ-এর কোনও প্রেমিক ছিল এ সে সহ্যই করতে পারবে না।

ছোট্ট ন্যাড়া মাঠে বাচ্চা ছেলেরা ফুটবল পেটাচ্ছে। চর্মগোলক উড়ে আসছিল বিদিশার দিকে, অর্ক হাত বাড়িয়ে থামাল। বলটাকে ফের ছুড়ে দিল মাঠে। চোখ কুঁচকে বিদিশার দিকে তাকিয়ে বলল,—তাহলে টাকাটা দিয়েই দাও।

—বলছ?

—বলছি। আর কী বলতে পারি? তুমি তো আমার অন্য পরামর্শ শুনবে না। ব্ল্যাকমেলার তোমাকে কব্জা করে ফেলেছে।

কথাটা অমোঘ সত্যের মতো শোনাল। অর্ক যে শেষ পর্যন্ত এই কথাই বলবে, এও যেন জানত বিদিশা। ঠিকই তো, আর তো কোনও সমাধান নেইই। তবু কেন সে ছুটে এসেছে অর্কর কাছে? অর্কই একমাত্র টেলিফোনে ভয় দেখানোর কথাটা জানে, অর্ককে বলেই একমাত্র নিজেকে হালকা করা যায়, এই ভেবে? নাকি অর্ক কোনও মিরাকল ঘটিয়ে ফেলবে, এ রকম একটা দুরাশা ছিল বিদিশার?

অর্ক আবার বলল,—কবে যেন দিতে হবে টাকাটা?

—শনিবার। সামনের শনিবার।

—কীভাবে দিতে হবে কিছু বলেছে?

—বলেছে। বিদিশা একটু থেমে নিষ্ঠুর কণ্ঠটাকে স্মরণ করে নিল। ভার গলায় বলল,—চাকুরিয়া লেকের ধারে। সাঁতার ক্লাবে ঢোকার রাস্তাটায় একটা অ্যাম্বাসাডর দাঁড়িয়ে থাকবে। ডিকি খোলা। গাড়ির তলায় একটা লোক শুয়ে কাজ করবে। টাকাটা প্ল্যাস্টিক ব্যাগে ভরে ডিকিতে রেখে ডিকিটাকে বন্ধ করে দিতে হবে। নোটগুলো হতে হবে পঞ্চাশ টাকার। এবং পুরনো। টাকা গাড়িতে রেখে যে পথে এসেছি সে পথেই ফিরে যেতে হবে।

—বাহ্, তোফা বন্দোবস্ত। অর্ক হাত ওল্টালো,—যা বলেছে সে রকমই করো তাহলে। যদি চাও, আমিও তোমার সঙ্গে থাকতে পারি। অবশ্য তার একটা প্র্যাকটিকাল অসুবিধে আছে। তোমার বাবা মা ভাই তো নিশ্চয়ই তোমার সন্দেহের তালিকায় পড়ে না! তাহলে ব্ল্যাকমেলার এমন একজন লোক যে তোমায় আগাগোড়া ফলো করেছিল। চিঠিসুদ্ধ বাক্সটা সে বাই লাক পেয়ে গেছে!... এমনও হতে পারে সে হয়তো আজও ফলো করছে। হয়তো সেদিনও তোমায় কড়া ওয়াচে রাখবে। হয়তো কেন, রাখবেই। আমি সঙ্গে থাকলে...। অবশ্য আমি খুব সিক্রেটলিও থাকতে পারি। আলাদা ভাবে দূর থেকে ওয়াচ করতে পারি। যদি বলো...

বিদিশা সব কথা শুনছিল না। খানিকটা আত্মগত ভাবেই সে বলে উঠল,—কিন্তু টাকাটা আমি পাব কোত্থেকে।

[এগারো]

বুধবার বিকেল। বিদিশার বেরনোর প্রস্তুতি পর্ব শেষ হল প্রায় সাড়ে চারটেয়। সে আজ পরেছে রানি রং ঢাকাই জামদানি, শাড়ির সর্বাঙ্গে জরির কারুকাজ। দু হাতে চওড়া ব্রেসলেট, কানে ঝুমকো, গলায় সাতনরি হার। নাকে একটা ছোট্ট নাকছাবিও লাগিয়ে নিয়েছে, হিরে বসানো। পার্লার থেকে বেঁধে আসা ঢেউ-ঢেউ খোঁপায় গুঁজে দিয়েছে সাগরসেঁচা মুক্তোর ফুল। তীব্র এক গন্ধ বিচ্ছুরিত হচ্ছে রূপসী বিদিশার শরীর থেকে। মৃগনাভির ফরাসি সুবাস।

রুপো বাঁধানো ছড়ি হাতে বাগানে পায়চারি করছিলেন দিননাথ। একটু বুঝি অসহিষ্ণু ভাবে। পূর্ণ সজ্জায় উদ্ভাসিত বিদিশাকে দেখে তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল। চোখে যেন আর পলক পড়ে না।

বিমোহিত স্বরে বলে উঠলেন,—করেছিস কী রে বেটি? আমার নাতনিটার দিকে কেউ যে আজ আর তাকাবেই না!

প্রশস্তি বাক্যে বিদিশার দারুণ খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু ঠিক তেমনটা হল না। তবু লজ্জা-লজ্জা গলায় বলল,—হারটা আমায় মানিয়েছে বাবা?

—মানিয়েছে কী রে? দেখে তো মনে হচ্ছে ওই হার তোরই গলার জন্য তৈরি হয়েছিল।

—ঠাট্টা কোরো না, সিরিয়াসলি বলো মানিয়েছে কি না। এত ভারী হার...তোমার ছেলে তো আবার ভারী গয়না পরা পছন্দ করে না।

—ও ব্যাটা সৌন্দর্য আভিজাত্যের কী বোঝে? রুদ্রবাড়ির বউ ফঙফঙে হার পরে পার্টিতে যাবে? ছ্যা ছ্যা।

রবি গ্যারেজ থেকে অনেকক্ষণ গাড়ি বার করে অপেক্ষা করছে। শ্বশুর পুত্রবধূ ইস্পাতনীল মারুতিতে পাশাপাশি বসল। বিদিশা একবার দেখে নিল উপহারের প্যাকেটটা নেওয়া হয়েছে কি না। হয়েছে। পদ্মপাণি আগেই রেখে গেছে গাড়িতে। খুঁটিনাটি কাজে পদ্মপাণির কখনও ভুল হয় না।

কদিন পর আজ আবার বেশ মেঘ করেছে। খানিক আগে দু-এক পশলা ঝরেছিল, ভেজা ভেজা আছে রাস্তাঘাট। বাতাসে কিছুটা জোলো ভাব। মনে হয় বর্ষা এখনও শরৎকে জায়গা ছাড়তে রাজি নয়।

চলছে মারুতি। স্বচ্ছন্দ গতিতে। লবণহ্রদের এদিকটায় প্রচুর গাছপালা। দিননাথের চোখ জানলার বাইরে, সবুজ দেখছেন।

হঠাৎই বললেন,—এই হারটা কার ছিল জানিস?

বিদিশাও সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল,—জানি। এ হার মা পরতেন।

—হুম! আমার শাশুড়িঠাকরুন তাঁর মেয়েকে দিয়েছিলেন। বিয়ের সময়। তিনি আবার পেয়েছিলেন তাঁর মার কাছ থেকে।

—তা হলে তো এ হার দিদিরই প্রাপ্য ছিল।

—ছিলই তো। খুকি মুখ ফুটে চেয়েওছিল।

—দাওনি কেন?

—তার বিয়েটা যখন আমার ইচ্ছেয় স্থির হয়নি, তখন এ বাড়ির সেরা গয়নাগুলো সে পাবে কেন? তা ছাড়া আমি তখনই ঠিক করে ফেলেছিলাম বাবলুর জন্য আমি নিজে বউ খুঁজে আনব, তার গলাতেই শোভা পাবে এই হার।

বিদিশার মনে পড়ে গেল বউভাতের দিন অর্চনাই তাকে সাজিয়েছিল, অলঙ্কারে প্রায় মুড়ে দিয়েছিল বিদিশাকে, হিরে, জড়োয়া, সোনা...। এই হারটাই শুধু পরায়নি সেদিন। কেন পরায়নি? ঈর্ষায়? তাই হবে। অন্তত শ্বশুরমশাই যা বললেন, তার থেকে সে রকমই তো মনে হয়। সেই দিদিরই বাড়িতে আজ এই হার পরে যাওয়া কি শোভন হচ্ছে? মুখে কিছু না বললেও হয়তো মনে মনে আহত হবে অর্চনা!

কিন্তু উপায়ই বা কী? ভাগ্নির জন্মদিন বলেই না হারটা লকার থেকে বার করা অনেক সহজ হয়েছে, অর্চিষ্মানের মনেও সন্দেহ জাগার সুযোগ আসেনি! পঞ্চাশ হাজার টাকা জোগাড় করার একটাই তো রাস্তা এখন। কালই এই পনেরো ভরির সাতনরি কণ্ঠহার অর্কর হাতে তুলে দিয়ে আসবে বিদিশা। অর্কদের পাড়ায় প্রচুর স্যাকরার দোকান, বেচলেই কড়কড়ে নোট এসে যাবে হাতে। তার পর আর কী, শয়তান ব্ল্যাকমেলারটার মুখে টাকাটা ছুড়ে মারো, ব্যস নিশ্চিন্ত! অর্ক যাই বলুক, বিদিশা এই ভাবনাটাকে কক্ষনও প্রশ্রয় দিতে রাজি নয়, যে ব্ল্যাকমেলার তাকে আবার উত্ত্যক্ত করবে। শয়তানটা তাকে কথা দিয়েছে, ওই টাকাটা পেলেই সে চিরকালের তো চুপ হয়ে যাবে। চোর ডাকাতদেরও কথার দাম থাকে, বিদিশা জানে। শনিবারের মধ্যেই একটা অভিন্নদর্শন সোনার জল করা সাতনরি ঢুকে যাবে বিদিশার লকারে—অর্চিষ্মানের হিসেবও নিখুঁত রইল! ভাগ্যিস সে দিন পুষ্প ঝুটো গয়না আসল গয়না নিয়ে ঠাট্টা তামাশা জুড়ল, নইলে কি আর এই সাদাসাপটা অথচ নিশ্ছিদ্র প্ল্যানটা বিদিশার মগজে আসত!

আলগোছে সাতলহরীর গায়ে একবার হাত বুলিয়ে নিল বিদিশা। এত সুন্দর সমাধান পেয়ে গেছে সে, তবু যে কেন বুকটা চিনচিন করে? বহুমূল্য গয়না হারাতে হবে, এই শোকে? নাকি কোনও সূক্ষ্ম অপরাধবোধ জাগছে প্রাণে?

সল্টলেক পেরিয়ে উল্টোডাঙায় পড়তেই গাড়ি যানজটের কবলে। ঠেলাগাড়ির মতো চলছে। মানিকতলায় জ্যাম, পোস্তায় জ্যাম, হাওড়া ব্রিজে জ্যাম...ফোঁটা ফোঁটা ঘামের মতো। সর্বত্র জমে আছে গাড়িঘোড়া, ট্রামেরা যেন মৃতপ্রায় সরীসৃপ। শালকিয়া পৌঁছাতে পৌঁছাতে বিদিশাদের সন্ধে নেমে গেল।

সাবেকি আমলের বাড়িটার সামনে গাড়ি থামতেই ছুট্টে বেরিয়ে এসেছে অর্চনা আর মুন্নি। পলকের জন্য অর্চনার চোখ আটকেছে বিদিশার সাতনরিতে, অজান্তেই গায়ে আঁচল জড়িয়ে নিয়েছে বিদিশা, পরক্ষণেই সব স্বাভাবিক।

বিদিশার হাত ধরে অর্চনা ঠোঁট ফোলাল,—সেই তোরা এত দেরি করে এলি?

মুন্নি কলকল করে উঠল,—দাদু, তুমি মামাকে ধরে আনতে পারলে না?

দিননাথ সহাস্যে বললেন,—তোর মামিকে ছেড়ে মামা যদি তার সতিনে মজে থাকে, তার আমি কী করব বল?

বিদিশা অবাক হয়ে দেখল, কথাটা শুনে হঠাৎই যেন চোখ জ্বলে উঠল অর্চনার। নিমেষেই অবশ্য হাসি ফুটিয়েছে মুখে। হাসতে হাসতেই বলল,—যা বলেছ। বাইরের বউ-এর ওপর টান ঘরের বউ-এর থেকে একটু বেশিই হয়।... তা সে আসবে কখন কিছু বলেছে?

বিদিশা বলল,—বলেছে তো আটটার মধ্যে...। এই মুন্নি, তুমি তোমার মামাকে একটা ফোন করো না।

—আমার ভারী হয়ে গেছে। বলতে বলতে মুন্নি হিড়হিড় করে বিদিশাকে টেনে নিয়ে চলল,—তুমিই এসো, আমার বন্ধুরা সবাই তোমায় দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি ওদের বলেছি, আমার মামি একেবারে ডিটো মাধুরী দীক্ষিৎ।

বিশাল হলঘর খুব জমকালো করে সাজানো হয়েছে আজ। রঙিন কাগজের শিকল ঝুলছে, দেওয়ালে জরির চুমকি, বেলুন, সিলিং-এ সুন্দর এক ঝাড়বাতি। দেওয়াল ঘেঁষে পাতা হয়েছে লম্বা লম্বা সোফা, মাঝখানে শ্বেতপাথরের টেবিলে প্রকাণ্ড এক কেক। জাহাজকেক। টাইটানিক। বয়স্ক অতিথিরা কেউ তেমন আসেনি এখনও, হলময় কিশোর কিশোরীদের ভিড়। হইহল্লা চলছে জোর, গান বাজছে, হঠাৎ হঠাৎ অকারণ উচ্ছ্বাস ভেঙে পড়ছে হাসিতে। অনেকের হাতেই পানীয়র গ্লাস। শীতল নরম পানীয়।

বিদিশার আবির্ভাবে ছেলেমেয়েদের কলরব থেমে গেল সহসা। মুন্নি এদিক ওদিকে নিয়ে যাচ্ছে বিদিশাকে, একে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। সাময়িক আড়ষ্টতা কাটিয়ে বিদিশা ধীরে ধীরে ভিড়ে মিশে গেল। সিনেমার নায়িকাদের মতো স্তাবকপরিবৃত হয়ে ঘুরছে হলে, মেয়েরা তার গয়না দেখছে, শাড়ি দেখছে, ছেলেরা মুগ্ধ দৃষ্টি উপহার দিচ্ছে তাকে। এমন পরিবেশ আসন্ন বিপদকেও বুঝি ভুলিয়ে দেয়। বিদিশা স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল, উপভোগ করছিল।

একটু ফাঁক পেয়ে মুন্নিকে জিজ্ঞাসা করল,—তোমার বাবা কোথায়? তাকে দেখছি না যে বড়?

—কে জানে কোথায়! মুন্নি ঠোঁট ওল্টাল,—এই তো তখন কেটারারদের সঙ্গে কথা বলছিল, হয়তো ছাদেই আছে। ডাকব?

—না থাক। ...তুমি কেক কাটবে কখন?

—ঠিক সাড়ে সাতটায়।

—সাড়ে সাতটায় কেন? তোমার বন্ধুবান্ধবরা তো সব এসে গেছে।

মুন্নি লাজুক মুখে বলল,—আমি নাকি ঠিক ওই সময়টাতেই জন্মেছিলাম। প্রতি বছর তাই ওই সময়েই কেক কাটি।

বিদিশা হেসে ফেলল। কত রকম যে খেয়াল থাকে মানুষের! বিদিশা নাকি জন্মেছিল রাত সাড়ে তিনটেয়, অর্চিষ্মানকে ওই সময়ে পার্টি দিতে বললে কেমন হয়? আগে

কখনও সেভাবে জন্মদিনই হয়নি বিদিশার। নভেম্বরের কুড়ি তারিখটায় মা হয়তো একটু পায়েস করল, বাবা হয়তো একটু মিষ্টি আনল, ব্যস। এবার নিশ্চয়ই ছবিটা বদলে যাবে। অর্চিষ্মান না করলেও দিননাথ নিশ্চয়ই ঘটা করে করবেন তাঁর বেটির জন্মদিন। কাকে কাকে সেদিন ডাকবে বিদিশা? অর্ককে বললে হয়, ছেলেটা খুব নিঃস্বার্থ ভাবে সাহায্য করছে বিদিশাকে। উহুঁ, যদি অর্চিষ্মান দিঘায় অর্ককে দেখে থাকে...।

এলোমেলো ভাবনার মাঝে টুক করে একবার দোতলায় উঠে গেল বিদিশা, পূষনের মার সঙ্গে দেখা করে এল। করতে হয়। কর্তব্য। পূষনের মা আর্থারাইটিসের রোগী, সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে পারেন না, দিননাথ তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছেন, একটুখানি সেখানে বসে বিদিশা আবার পায়ে পায়ে নীচে। কেটারারের কর্মচারীর ট্রে থেকে কোল্ড ড্রিঙ্কসের গ্লাস তুলে নিয়ে বসেছে সোফায়, একটু একটু চুমুক দিচ্ছে। লোকজন আসতে শুরু করেছে এক এক করে, অর্চনা আর মুন্নি অভ্যর্থনা জানাচ্ছে তাদের। পূষনেরও দর্শন মিলল, ব্যস্ততার মাঝেও বিদিশার সঙ্গে নিয়মমাফিক ফষ্টিনষ্টি করে গেল পূষন।

কেক কাটা হবে এবার। মুন্নিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তার বন্ধুবান্ধব, বাবা মা, অতিথি অভ্যাগত, বিদিশা দিননাথ। সব আলো নিবিয়ে দেওয়া হল, হলঘর জুড়ে পনেরোটা মোমবাতির আবছায়া, মৃদু লয়ে ইংরেজি বাজনা বাজছে। সুর উচ্চকিত হল ক্রমশ, কেকে ছুরি বসিয়ে এক ফুঁয়ে মোমবাতি নেবাল মুন্নি। পলকের জন্য দমকা অন্ধকারে ঘুটঘুট চারদিক, পর মুহূর্তেই আলোর রোশনাই, হাততালিতে ফেটে পড়ছে ঘর।

আলো জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে বিদিশার শিরদাঁড়া বেয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। পূষনের পাশে কে এসে দাঁড়িয়েছে? ভাস্কর না? কখন এল? কোত্থেকে এল?

বিদিশার ননদের বাড়িতে ভাস্কর কেন?

ভাস্করেরও দৃষ্টি বিদিশায় স্থির। মুখের হাসি চওড়া হচ্ছে ভাস্করের। গলা নামিয়ে পূষনকে কী যেন বলল। পূষনও তাকাচ্ছে বিদিশার দিকে।

বিদিশার মুখ পাংশু। কানন ঘুরছে গোটা পাঁচেক পাখা, তবু যেন ঘর সহসা বাতাসহীন।

ভিড় কাটিয়ে ভাস্করকে নিয়ে এগিয়ে এল পূষন,—ম্যাডাম, মিট মাই ফ্রেন্ড। ভাস্কর চ্যাটার্জি। দারুণ ডায়নামিক ছেলে। আমার ছোট ভাইও বলতে পারেন। ...আর ইনি হলেন মিসেস বিদিশা রুদ্র। আমার একমাত্র শ্যালকের একমাত্র ওয়াইফ।

খাঁটি গ্রিক পুরুষের মতো দেহকাণ্ড ঈষৎ নেওয়াল ভাস্কর। কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে বলল,—আপনাকে যেন আগে কোথায় দেখেছি?

পূষন হো হো হেসে উঠল,—পুরনো কায়দা ছাড়ো। বিদিশা ম্যাডামকে যে দেখে তারই এরকমটা মনে হয়।

—তাই কি? ভাস্করের ঘুম ঘুম চোখ আরও ঢুলুঢুলু—আপনিই বলুন তো ম্যাডাম, আগে আমাদের কোথায় দেখা হয়েছে?

গত কয়েকটা দিন বিদিশাকে অনেক শক্তপোক্ত করে দিয়েছে। কয়েক মুহূর্তেই সামলে নিল নিজেকে। মুখে একটা ইলাস্টিক হাসি টেনে যথাসম্ভব নীরস স্বরে বলল,—সরি। আই কান্ট রিমেমবার।

—তা হলে হয়তো আমিই ভুল করছি। ভাস্করের হাসি বাঁকা হয়ে ঝুলছে,—স্মৃতি মাঝে মাঝে বড় বিট্রে করে ম্যাডাম। চেনা লোককে অচেনা লাগে, অচেনা মানুষকে চেনা মনে হয়...

ভাস্করের কথা শেষ হল না। মুন্নি ঘুরে ঘুরে কেক বিলি করছে, বিদিশার মুখে টাইটানিকের টুকরো গুজে দিয়ে গেল, সুযোগ বুঝে বিদিশাও সরে গেছে সামনে থেকে।

পার্টি জমে উঠেছে। হিন্দি গান চালিয়ে কোমর দোলাচ্ছে ছেলে মেয়েরা, বয়স্ক জনেরা তালি দিয়ে দিয়ে তাদের উৎসাহিত করছে। নব্য সংস্কৃতি। দিননাথ সোফায় একটু বিরক্ত মুখে বসে, ওই সব গান তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। বিদিশা সেঁটে গেল শ্বশুরমশায়ের পাশে। দিননাথই এখন তার আত্মরক্ষার বর্ম।

আটটা নাগাদ খাবার সার্ভ করা হল। বুফে সিস্টেম। পাশের ঘরে সাজানো রয়েছে টেবিল, প্লেট হাতে পছন্দসই আইটেম তুলে আনছে নিমন্ত্রিতরা, রকমারি সুখাদ্যের ঘ্রাণে হলঘর ম ম।

অর্চনা ঘুরে ঘুরে তদারকি করছিল। বিদিশাকে ডেকে বলল,—এই, বাবাকে খাবার এনে দে না। মিছিমিছি বসে বসে বোর হচ্ছে!

বিদিশাও এই কথাই ভাবছিল। অর্চিষ্মানের সময়জ্ঞান অত্যন্ত কম, তার অপেক্ষায় থাকতে গেলে শ্বশুরমশায়ের অনিয়ম হয়ে যাবে।

খাবার ঘরের দিকে এগোতে গিয়েও বিদিশা দাঁড়িয়ে পড়ল। ওফ, ভাস্করটা দাঁড়িয়ে আছে! ওখানেই!

নিচু গলায় অর্চনাকে জিজ্ঞেস করল,—ওই ভাস্কর চ্যাটার্জি লোকটা তোমাদের এখানে ভিড়ল কী করে দিদি?

—তুই চিনিস ওকে?

—পূষনদা আলাপ করিয়ে দিল। লোকটা খুব চালিয়াৎ টাইপ, তাই না?

—কামাচ্ছে দু হাতা, চাল তো একটু মারবেই।

—করেটা কী?

—কিছুই করে না। আবার অনেক কিছুই করে।

—বুঝলাম না।

অর্চনা চোখ টিপল। চাপা স্বরে বলল,—পলিটিকাল টাউট।

—মানে?

—রাজনীতির চাঁইরা তো সব সাধুবাবারও বাড়া, টাকাপয়সা স্পর্শ করলে তাদের হাতে ফোসকা পড়ে। তাই এদের হাত দিয়েই সব লেনদেন হয়। অর্চনা গলা আরও খাদে নামাল,—আগে নাকি হাজরা মোড়ে ফ্যা ফ্যা করে বেড়াত। এখন খুব সোর্স। তোর পূষনদা এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ব্যবসা করবে বলছে না, ওই ভাস্করই তো খুঁটি। ওই নাকি সব বন্দোবস্ত করে দেবে। ব্যাঙ্ক লোন ট্যাঙ্ক লোন সব। কমিশনও নেবে...

—পূষনদার সঙ্গে পরিচয়টা হল কী করে?

—বিজনেসের লাইন, কোথায় কার সঙ্গে কখন পরিচয় হয় তার কোনও ঠিক আছে?... যা যা, তুই বাবার খাবারটা নিয়ে আয়।

চোখ কান বুজে ভাস্করকে পার হয়ে গেল বিদিশা। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। প্লেটে ফিশফ্রাই তুলছে, পিছনে ভাস্কর।

ফিসফিস করছে,—মানুষ খুব তাড়াতাড়ি পাস্ট ভুলে যায়, তাই না?

বিদিশার হাত থেমে গেল। মুখ ফেরাল না, দাঁতে ঠোঁট চেপে বলল,—মনে রাখারও তো কোনও কারণ দেখি না।

—একেবারে অর্চিষ্মান রুদ্রর সতীসাধ্বী বউ বনে গেছ, অ্যাঁ?

বিদিশার হাতের প্লেট থরথর কেঁপে উঠল,—অর্চিষ্মানকে তুমি চেনো নাকি?

—অনেককেই আমায় চিনতে হয় ম্যাডাম। এটাই আমার পেশা।

ভাস্করের স্বরে এমন কিছু ছিল, বিদিশা ঘাড় ঘোরাতে বাধ্য হল। দেখল, ভাস্করের মুখে হাসির চিহ্নমাত্র নেই, ঘোলাটে চোখের কোণে অচেনা ধূর্ততা খেলা করছে।

একেবারেই অচেনা? নাকি চেনা চেনা?

[বারো]

বিদিশা ক্রমশ অস্থির হয়ে পড়ছিল। সেই কখন থেকে বাসস্টপে এসে দাঁড়িয়ে আছে, এখনও অর্ক আসে না কেন? অর্কর কোনও বিপদ হল না তো?

অদেখা শয়তানটার সব শর্তই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে বিদিশা। ঠিক সময়ে ছায়ামাখা রাস্তাটায় পৌঁছেছিল, প্লাস্টিকে মোড়া টাকার বাণ্ডিল যথাস্থানে রেখে নিশ্চল অ্যাম্বাসাডারের ডিকি বন্ধ করে দিয়েছে, একটি বারের জন্যেও পিছু ফিরে তাকায়নি, সোজা চলে এসেছে এই গোলপার্কে। অর্ক তখন ছিল অনেকটা দূরে, তাকে মোটেই কারুর লক্ষ করার কথা নয়।

লোকটা কি আরও ধড়িবাজ? অর্ককে দেখে ফেলেছিল? যদি লোকটা অর্ককে...?

না, বিদিশা আর ভাবতে পারছে না। একটু আগে পর্যন্ত একটা হিমেল ভয় মরাল সাপের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ছিল বিদিশাকে, সাপটা এখন আর নেই, তবু তার শীতল স্পর্শ বিদিশা এখনও বেশ অনুভব করতে পারছে। কেন যে আজ মিছিমিছি জেদ করে সঙ্গে এল অর্ক? বিদিশাকে সাহস জোগাতে এসে নতুন কোনও সমস্যা ডেকে আনল না তো? একবার কি গিয়ে দেখবে বিদিশা?

চিন্তায় চিন্তায় বিদিশা যখন পাগলপ্রায়, অর্ককে দেখা গেল। ফুটপাথ ধরে হনহনিয়ে আসছে।

ছুটে এগিয়ে গেল বিদিশা,—কী করছিলে এতক্ষণ? কোথায় ছিলে?

অর্ক হাঁপাচ্ছে,—শালাকে ধরে ফেলেছিলাম প্রায়। ইশ, একটুখানির জন্যে...

—সেকি! তুমি লোকটাকে ধরতে গেছিলে?

—পারলাম না। তুমি চলে আসার পরেও শালা গাড়ির তলায় শুয়েছিল অনেকক্ষণ। প্রায় আধ ঘণ্টা। আমিও তক্কে তক্কে ছিলাম। যেই না ব্যাটা বেরিয়েছে, দিয়েছি এক ডাইভ। পৌঁছতে পৌঁছতেই স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে গাড়িতে। তাও লাস্ট মোমেন্টে হাত বাড়িয়ে কলার চেপে ধরেছিলাম ব্যাটার, পিছলে বেরিয়ে গেল। শুধু এই রোতামটা

মুঠোয় রয়ে গেছে।

বিদিশা হাতে নিয়ে দেখল বোতামটা। মামুলি প্লাস্টিকের বোতাম। হলদেটে। কী ভেবে বোতামটা পুরে রাখল ব্যাগে।

ভার ভার গলায় বলল,—কী দরকার ছিল বীরত্ব দেখানোর? লোকটার কাছে যদি আর্মস থাকত?

—থাকলে থাকত। আমি পরোয়া করি না। অর্ক গলা ঝাড়ল,—যতই কালিঝুলি মেখে থাকুক, ও শালার মুখ আমি দেখে নিয়েছি।

—লোকটাও তো তোমায় দেখল। আবার যদি ফোনে থ্রেট করে?

অর্ক গোমড়া হয়ে গেল,—দ্যাখো দিশা, আমি তোমায় অনেক বার বলেছি, আমি স্ট্রেট গেমে বিশ্বাসী। কে না কে উল্টো পাল্টা ভুজুং ভাজুং দিয়ে তোমার কাছ থেকে টাকা কেড়ে নিয়ে যাবে, আর আমি সেটা পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব? আমায় যদি তুমি আদৌ কিছু না জানাতে তাও একটা কথা ছিল। আর থ্রেট করার কথা বলছ? কাকে থ্রেট করবে?

—আমাকে। আর কাকে?

—কী বলবে? সঙ্গে লোক নিয়ে গেছিলে, খেসারত স্বরূপ এই টাকা দাও? হাহ্। তোমাকে তো বলেইছি, ব্ল্যাকমেলাররা একবার টাকার গন্ধ পেলে জোঁকের মতো সেঁটে যায়। আমি আজ এখানে না এলেও সে তোমাকে ছাড়ত না। দেখো, এবার লোকটা আরও বেশি চাইবে।

শঙ্কাটা যত মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায় বিদিশা, অর্ক তত বুঝি স্মরণ করিয়ে দেবেই। তেতো গলায় বিদিশা বলল,—তুমি দেখছি ব্ল্যাকমেলারটার মনের নাড়িনক্ষত্র জেনে ফেলেছ?

অর্ক চুপ হয়ে গেল। অন্ধকার নামছে। স্ট্রিট লাইট জ্বলে উঠল একে একে। গোলপার্কের মোড় এখন জনারণ্য। বাস মিনিবাস ট্যাক্সি গাড়ির শব্দে কান পাতা দায়। বাতাসে পোড়া পেট্রল ডিজেলের কটু গন্ধ। ভিড়ের মধ্যেই নির্জনতা খুঁজে নিবিষ্ট ভঙ্গিতে গল্প করছে দুই তরুণ তরুণী। এই কেজো নাগরিক সন্ধ্যায় কোন স্বপ্নের কথা বলে ওরা?

অর্ক কপোতকপোতীকে দেখছিল। নিঃশব্দে। কোনও দীর্ঘশ্বাস পড়ল কি অর্কর?

নিষ্প্রাণ স্বরে কথা শুরু করল আবার,—তুমি এখন ফিরবে তো?

বিদিশা বুঝতে পারছিল অর্ক আহত হয়েছে। খারাপ লাগছিল বিদিশার। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে একটা কাজ করে ফেলেছে, তার জন্য অমন বাঁকা সুরে কথা না বললেই হত।

ঘড়ি দেখে বলল,—আর একটু থাকতে পারি। বাড়িতে বলে এসেছি ফিরতে দেরি হবে।

—মিছিমিছি দেরি করবে কেন? কাজ তো তোমার হয়ে গেল।

—রাগ করেছ? বিদিশা আলগা ছুঁল অর্ককে,—আমি কিন্তু কিছু ভেবে বলিনি। মাথার ঠিক নেই, কখন কী কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়...

—তোমার ওপর রাগ করার আমার তো কোনও অধিকার নেই দিশা।

—এটাও তো রাগের কথা। ...বড্ড গলা শুকিয়ে গেছে, একটু চা খাওয়াবে?

—আমি ফুটপাথের চা খাই। সে কি তোমার মুখে রুচবে?

—এবার কিন্তু তুমি আমায় কথা শোনাচ্ছ। বিদিশা হাসার চেষ্টা করল,—বড়লোকের বাড়ি বিয়ে হয়েছে বলে কি আমার সব অভ্যেস বদলে গেছে?

—চলো তাহলে।

পেট্রল পাম্পের উলটো দিকে খুপরি চা-দোকান। বাইরে মলিন বেঞ্চি। বসল দুজনে। ধূমায়িত চায়ের গ্লাস এসে গেল।

বিদিশা এদিক ওদিকে তাকাচ্ছে। একটু আড়ষ্ট ভাবে। অর্ক জিজ্ঞাসা করল—কী দেখছ?

—না, মানে...লোকটা আশেপাশে নেই তো?

—সে আর থোড়াই এ তল্লাটে আছে। যে ভাবে চোঁ চা রাসবিহারীর দিকে চম্পট দিল...

—কেমন দেখতে লোকটা?

—লম্বাও নয়, আবার বেঁটেও নয়।...মাঝারি হাইট। গায়ের রং ফর্সার দিকেই। মুখে অবশ্য প্রচুর কালি মেখে ছিল।

—হ্যাঁ, মোটামুটি ফর্সা। আমি এক ঝলক পা দুটো দেখেছিলাম।

—চেহারাটাও তেমন কিছু ষণ্ডাগণ্ডা নয়। তবে গায়ে বেশে জোর আছে। ফেসটা স্কোয়্যার মতো...না না, একটু বুঝি লম্বাটে।

হঠাৎই কী যেন মনে পড়ে গেল বিদিশার। উদ্ভাসিত চোখে বলল, —ও হ্যাঁ, আমি আরেকটা জিনিস দেখেছি। গাড়িটার নাম্বার। ডব্লু এম ডি, সেভেন নাইন ওয়ান জিরো।

—ফুঃ, ওটা কি আসল নাম্বার নাকি?

—নয়?

—কক্ষনও না। আসল নেমপ্লেট ঝুলিয়ে টাকা নিতে আসবে, ব্ল্যাকমেলার কি রামছাগল নাকি?

বিদিশা মেনেও মানতে পারল না। তর্ক জুড়ল,—অপরাধীরা তো অনেক সময় ভুলও করে। সিলি মিসটেক। তার জন্যই তো তারা কত সময় ধরা পড়ে যায়।

—তা ঠিক। অর্ক মাথা দোলাল। চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাস রেখে দিল পাশে। ভুরু কুঁচকে বলল,—কিন্তু এ লোকটা এত সামান্য ভুল করবে বলে মনে হয় না।...তোমাকে যে ভাবে বুদ্ধু বানিয়ে বাক্সটা হাতিয়েছে।

—তাহলে তো লোকটাকে আর ট্রেস করার কোনও উপায়ই নেই!

—আছে, আছে। বললাম না, লোকটার মুখ আমি দেখে নিয়েছি? ওই মুখ আমি ভুলব না। দিনে হোক, রাতে হোক, হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যে হোক, ট্রেনে বাসে ট্রামে যেখানে দেখি না কেন, আমি ওকে আইডেন্টিফাই করতে পারবই। এই শহর আমি চষে বেড়াই, আজ হোক, কি ছ মাস পরেই হোক...। অর্ক এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল। তারপর বলল,—শুধু একটা ব্যাপার আমার খুব স্ট্রেঞ্জ লাগছে, জানো?

—কী?

—টাকা ডিকিতে রাখার সঙ্গে সঙ্গে তো লোকটার চলে যাওয়া উচিত ছিল। তা না

করে আধঘণ্টা ওয়েট করল কেন?

—ভেবেছিল হয়তো আমি কাছেপিঠে দাঁড়িয়ে ওকে ওয়াচ করছি!

—তা কী করে হয়? তুমি তো সঙ্গে পুলিশ নিয়েও আসতে পারতে।... লোকটা নিশ্চিন্ত মনে গাড়ির তলায় শুয়ে রইল... ফিশি, ভেরি ফিশি! ইনফ্যাক্ট গাড়িতে ওঠার সময়েও ওর তেমন তাড়াহুড়ো ছিল না। তাই না আমি অতটা পথ কভার করে রিচ করতে পেরেছিলাম। প্রায় সত্তর আশি গজ। আমার কী মনে হচ্ছে জানো? আমার প্রিভিয়াস অনুমানটা কারেক্ট। দি পারসন, মানে দি ব্ল্যাকমেলার তোমার পরিচিত। সে তোমার স্বভাবের হাড়হদ্দ জানে।

—কী করে বলছ? বিদিশার মুখ সাদা হয়ে গেল।

—কারণ লোকটা অ্যাবসোলিউটলি সিওর ছিল, তুমি পুলিশে খবর দাওনি। সে মনের জোরও তোমার নেই। শুধুমাত্র, তোমার মুখোমুখি হতে চায় না সে, ব্যস।

বিদিশার হৃৎপিণ্ডের গতি আবার বেড়ে গেল। নিশ্বাসে আবার চাপা কষ্ট। বুধবার রাত থেকে যার দিকে সন্দেহের তির ছুটছে, সেই ভাস্করই কি তবে পর্দার আড়ালের খলনায়ক? সেদিন কথার ছলে বাজাচ্ছিল, বিদিশা তার কথা অর্চিষ্মানকে বলেছে কিনা। হঠাৎ তাকে দেখে বিদিশার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে কেন...রিয়েল রিচ ম্যানস ওয়াইফ হয়ে অগাধ টাকা নাড়াচাড়া করতে কেমন লাগে...! অর্চিষ্মান আসার পর ইচ্ছে করে অর্চিষ্মানের সঙ্গে গিয়ে গল্প জুড়ল, কিন্তু একটি বারের জন্যও বিদিশার ওপর থেকে চোখ সরায়নি। কী বিশ্রী চাহনি, এখনও যেন কাদার মতো লেগে আছে গায়ে। প্রথম ফোনটায় হয়তো এমনি এমনি ভয় দেখিয়েছিল ভাস্কর, বাক্স হাতানোর পর মিহির অর্কর কথা জেনে গিয়ে আরও জোর পেয়ে গেছে। হয়তো অনেকদিন ধরেই বিদিশাকে ফলো করছিল, সেদিনও যখন বিদিশা বাপের বাড়ি থেকে ফিরছে...!

অর্ককে কী বলে ফেলবে ভাস্করের কথা? উঁহু, বলা যায় না। বিদিশার দিকে দ্বিধাহীন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অর্ক, যথেষ্ট ছোটাছুটি করছে, হার কেনা, ডিজাইন মিলিয়ে নতুন হার গড়ানো, এও বেশ ঝঞ্ঝাটের কাজ, আজ একটু আগে অমন একটা বিপদের ঝুঁকি নিল কেন? অর্কর বুকে নিশ্চয়ই একটাই বিশ্বাস ধ্রুবতারার মতো জ্বলছে। অর্চিষ্মান বিদিশার স্বামী হতে পারে, কিন্তু এই পৃথিবীতে সেই বিদিশার একমাত্র প্রেমিক। কে না জানে, স্বামীর চেয়ে প্রেমিক এক কনা হলেও বেশি জায়গা দখল করে থাকে হৃদয়ে। এমন প্রেমিক বিদিশার প্রায় গণ্ডাখানেক ছিল, এই তথ্য জানার পর অর্ক কি তাকে অর্চিষ্মানের চেয়েও বেশি ঘৃণা করবে না? স্বামীকে প্রেমিক সহ্য করলেও করতে পারে, কিন্তু অন্য প্রেমিককে নয়।

বিদিশা উঠে দাঁড়াল। দূরমনস্ক ভাবে বলল,—কী জানি, আমার কিছু মাথায় ঢুকছে না। সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।

অর্কর চোখে মায়া ঘনাল। চায়ের দাম মিটিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল,—আর ভেবো না। হয়তো তোমার ধারণাই ঠিক লোকটা আর জ্বালাতন করবে না। ...তাছাড়া আমি তো আছি। কিছু হলে আমায় সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ো। বাই দা বাই, আমি কিন্তু বড় জোর সামনের হপ্তাটা বাড়ি আছি, তারপর থেকে আমার ক্যাম্প শুরু হয়ে যাবে।

—তাহলে যোগাযোগ করব কী করে?

—তোমার তো আরও সুবিধে হল। আমি তো সল্টলেক স্টেডিয়ামে থাকব। তোমার অনেক কাছাকাছি। পারসোনালিও দেখা করতে পারো, যদি বলো আমি তোমাকে ফোনও করতে পারি।

—ফোন?

—হ্যাঁ, ক্যাম্প থেকে।...কখন করলে তোমার সুবিধে?

—দুপুরে। আড়াইটে থেকে তিনটে।

নম্বরটা টুকে নিল অর্ক। ট্যাক্সি ডেকে তুলে দিল বিদিশাকে।

ফিরছে বিদিশা। জানলার বাইরে চোখ, অথচ দেখছে না কিছুই। না চাইতেও তালবেতাল ভাবনা আসছে মনে। দিদি সেদিন চলে আসার সময় বলছিল, হারটা খুব যত্ন করে রাখিস বিদিশা, এতে আমার মার স্মৃতি লেগে আছে। বলার সময় দিদির চোখের কোল চিকচিক করছিল। হারটা বেমালুম বেচে দেওয়া কি পাপ কাজ হল? দূর, তা কেন, এ হার তো এখন বিদিশারই, নিজের গয়না নিয়ে সে যা খুশি তাই করতে পারে।... ভাস্করের সঙ্গে পূষনদার অত খাতির কেন? পূষনদা ভাস্করের সঙ্গে যুক্ত নেই তো? হতে পারে, হতেই পারে। যতই মুন্নির জন্মদিনে পার্টি থ্রো করে শোম্যানশিপ দেখাক, টাকাপয়সার হাল পূষনদার মোটেই ভাল নয়। নতুন ব্যবসার ধান্ধা করছে, শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছু মিলবে না জানে, হয়তো তাই...! অর্ক যা চেহারার বর্ণনা দিল, তা অবশ্য পূষনদা বা ভাস্করের সঙ্গে মেলে না। অর্থাৎ ওরা কাউকে কাজে লাগিয়েছে, কে লোকটা? কোনও পেশাদার অপরাধী? পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে তাকে নিশ্চয়ই কিছু দিতে হবে...! উহুঁ, পূষনদাকে ব্ল্যাকমেলার ভাবা যায় না। যতই তেড়াবেঁকা কথা বলুক, পূষনদা ঠিক অমরীশ পুরী টাইপ নয়। তাহলে? তাহলে?

ভাবতে ভাবতে সল্টলেক এসে গেল। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মেটাচ্ছে বিদিশা, সামনে পদ্মপাণি। দোকান টোকান কোথাও যাচ্ছে।

বিদিশাকে দেখে এগিয়ে এল,—ও বউদিমণি, তোমার জন্য একটা লোক কখন থেকে বসে আছে গো।

বিদিশা বেশ চমকাল,—আমার জন্য? কে?

—চিনি না। বলছে, দাদা পাঠিয়েছে। তোমার সঙ্গে কী কাজ আছে।

চিন্তিত মুখে বৈঠকখানায় এসে বিদিশা দেখল, একজন বছর ষাটেকের লোক সোফায় বসে ঢুলছে।

বিদিশার পায়ের আওয়াজ পেয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল লোকটা। হাত জোড় করে বলল,—নমস্কার ম্যাডাম। আমার নাম সবিতাবরণ বাপুলি। আপনাকে একটা ফর্ম সই করানোর জন্য অনেকক্ষণ বসে আছি।

— কীসের ফর্ম?

—প্রোপোজাল ফর্ম। এল আই সির।

—কে এল আই সি করবে?

—আজ্ঞে, আপনার নামে হবে। মিস্টার রুদ্র তো তাই বললেন। বলতে বলতে

ব্রিফকেস খুলে একটা ছাপানো কাগজ বাড়িয়ে দিল লোকটা,—মোটামুটি সব ফিল আপ করাই আছে। মিস্টার রুদ্রই করে দিয়েছেন। আপনি শুধু জন্ম তারিখটারিখগুলো একটু চেক করে দিন। আর সইটা...

—এখনই করতে হবে?

—করলে ভাল হয় ম্যাডাম। মিস্টার রুদ্র চেকটা দিয়ে রেখেছেন, কাল তাহলে ফার্স্ট আওয়ারে অফিসে জমা করে দিতে পারব।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদিশা দেখল কাগজটা। এবং চমকাল।

তার নামে দশ লাখ টাকার পলিসি! তিরিশ বছরের মেয়াদ! নমিনি অর্চিষ্মান!

লোকটা হাত কচলাচ্ছে—কাইন্ডলি সইটা করে দিন ম্যাডাম। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। গড়িয়া ছাড়িয়ে। সেই বোড়াল।

থতমত মুখেই সইটা করে দিল বিদিশা। লোকটাকে বিদায় করে অবসন্ন পায়ে সিঁড়ি ভাঙছে। শরীর চলছে না আর, একটু শোবে এখন। দোতলা থেকে বাজনার সুর ভেসে আসছে। সেতার। দিননাথ রেকর্ড চালিয়েছেন।

শ্বশুরমশায়ের মহলের সামনে এসে বিদিশা দাঁড়াল একটুক্ষণ। ঘর অন্ধকার, একা মানুষটা আরও একা হয়ে ডুবে আছেন সুরের নির্জনতায়।

কী রাগ শুনছেন শ্বশুরমশাই? বিদিশা রাগ রাগিণী চেনে না কোনও, তবু সুরের মূর্ছনা তার বুকে গিয়ে বিঁধছিল। মাগোঃ, সুর কেন এত করুণ হয়!

বিদিশার কান্না পেয়ে গেল।

[তেরো]

অর্চিষ্মান ফিরল নটা নাগাদ। ঘর অন্ধকার করে বিছানায় শরীর ছেড়ে দিয়েছিল বিদিশা। আলো জ্বলতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

অর্চিষ্মানের চোখে বিস্ময়,—অসময়ে শুয়ে আছ যে?

বিদিশার ঝিমঝিম করছে মাথা, তবু দ্রুত ধাতস্থ করে নিল নিজেকে। বলল,—এমনি।

—উহুঁ, কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে। নইলে এখন তো তোমার বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে টিভি দেখার কথা! অর্চিষ্মান ভুরু কুঁচকোল,—শরীর খারাপ?

মানুষের মন কী বিচিত্র! অর্চিষ্মান যে লক্ষই করেনি বিদিশা কদিন ধরে টিভি চালাচ্ছে না, এতে তো বিদিশার স্বস্তি পাওয়ার কথা, কিন্তু হঠাৎই যেন বিদিশার বুকে সূক্ষ্ম অভিমানের ধোঁয়াশা! কেন সারাক্ষণ শুধু কাজের চিন্তায় ডুবে থাকবে অর্চিষ্মান? বিদিশা যে এত কষ্ট পাচ্ছে, দুর্ভোগ পোহাচ্ছে, হোক না তা তার নিজেরই কর্মফল, অর্চিষ্মান একবার ভুলেও নজর করবে না? প্রশ্নের উত্তরে হয়তো মিথ্যে বলবে বিদিশা, হয়তো এড়িয়ে যাবে স্বামীকে, তবু তো মনে হবে মানুষটা তার পাশে আছে, কথা ভাবে! মাত্র ক' মাসে বিদিশা স্বামীর কাছে এত পুরনো হয়ে গেল!

ম্লান হেসে বিদিশা বলল,—তেমন কিছু না, একটু মাথা টিপটিপ করছে।

—ওষুধ খেয়েছ কিছু?

—নাহ্। দেখছি... এমনিই কমে যাবে।

—দেখো বাবা, আবার জ্বর টর বাধিয়ে বোসো না। সিজন চেঞ্জের সময়...

হালকা শিস দিতে দিতে অ্যান্টিরুমে ঢুকে গেল অর্চিষ্মান। জুতো খুলছে, পোশাক বদলাচ্ছে। এই সময়টায় অর্চিষ্মানের পায়ে পায়ে থাকে বিদিশা, হাতের সামনে সব কিছু জুগিয়ে দেয়, বাথরুমে তোয়ালে রেখে আসে, বাইরে থেকে এলে অল্প গরম জলে হাত মুখ ধোওয়ার বাতিক আছে অর্চিষ্মানের, অন করে দেয় গিজার, এবং অবশ্যই গ্লাস বোতলও সাজায়। আজ কিছুই ইচ্ছে করছে না, সত্যিই যেন মাথাটা জমাট পাথর।

অর্চিষ্মান অবশ্য পরনির্ভর মানুষ নয়। নিজেই টুকটাক সারছে সব। একটু নিশ্চিন্ত হয়েই বিদিশা শুয়ে পড়ল আবার। শুয়ে শুয়েই কানে এল অর্চিষ্মান হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে বাথরুমে। দিঘার সেই গান! মনে করো শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর...। উফ, ওই বিদঘুটে গানটাই কেন যে এত পছন্দ অর্চিষ্মানের!

সুমতি দরজায় এসেছে,—বাবু খেতে বসে গেছেন। আপনি যাবেন না বউদি?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠল বিদিশা। না গেলে ঝঞ্ঝাট হবে, এক্ষুনি হয়তো ছুটে আসবেন শ্বশুরমশাই, সামান্য মাথার যন্ত্রণার জন্য হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন। বিয়ের মাসখানেকের মাথায় একদিন তলপেটে ব্যথা হচ্ছিল বিদিশার, মামুলি মেয়েলি ব্যথা, রাত্রে দিননাথের খাবার টেবিলে গিয়ে দাঁড়ায়নি—ব্যস, তক্ষুনি শ্বশুরমশাই ডাক্তারকে কল দেন আর কি। শেষে অর্চিষ্মানই ধমকে ধামকে নিরস্ত্র করেছিল বাবাকে। আজ সিন ক্রিয়েট করার কোনও মানেই হয় না, যত কষ্টই হোক।

দিননাথের নৈশাহারটি বেশ সংক্ষিপ্ত। তিনটে রুটি, দুটি সবজি দিয়ে, একটি দুধে ভিজিয়ে।

রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে দিননাথ বললেন,—বুঝলি বেটি, আজ লাহিড়িকে জব্বর টাইট দিয়েছি।

বিদিশা জোর করে কৌতূহল দেখাল,—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ রে, পর পর দুটো গেমেই লাহিড়ি মাত। রোজ রোজ আমায় হারিয়ে দেবে, তা কি হয়? দিন আমারও আসে।

—ও, সেই আনন্দেই বুঝি সেতার শুনছিল?

—তোর বুঝি কানে গেছে? দিননাথ মুখ তুললেন,—সেতারের সুরে সব সময় সুখ থাকে না রে পাগলি, কষ্টও থাকে।

—তোমার আবার কীসের কষ্ট?

—ওই যে, লাহিড়িটা রোজ রোজ জেতে, আজ হেরে গেল। বেচারার মুখটা যদি তখন দেখতিস! দিননাথ ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেললেন,—জিতেও সব সময়ে আনন্দ হয় না রে। হারার কষ্ট কী তা তো আমি বুঝি!

বিদিশা হেসে ফেলল। মানুষটা সত্যিই বড় সরল। প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাতেও চান, আবার হারিয়েও মনখারাপ হয়, এমনটা বোধ হয় একমাত্র শ্বশুরমশায়ের মতো মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

হাসি হাসি মুখেই বিদিশা বলল,—তাহলে কেন বড় মুখ করে বললে লাহিড়িকে টাইট দিয়েছ?

—ওটা তো আমার নিজের আনন্দ। তা বলে অন্য কারুর দুঃখে খারাপ লাগবে না?

—থাক, আর শোক আহ্লাদ করে কাজ নেই। কাল আবার হেরে এসো, সব কাটাকুটি হয়ে যাবে।

শ্বশুরমশায়ের কাছে আরও একটুক্ষণ থেকে ঘরে ফিরল বিদিশা। স্নান সেরে ফিটফাট হয়ে গেছে অর্চিষ্মান, ধোপদুরস্ত পাজামা পাঞ্জাবি চড়িয়েছে, কোলন ছড়িয়েছে গায়ে, গ্লাস বোতল নিয়ে সে এখন সোফায়। দিননাথের সঙ্গে কথা বলে বিদিশার মাথাটা সামান্য হালকা হয়েছিল, কোলন আর সুরার মিশ্র গন্ধে ব্যথাটা আবার চড়াং করে উঠল।

ড্রয়ার খুলে ওষুধ খুঁজছিল বিদিশা, অর্চিষ্মান বলে উঠল,—তোমার দাদা তো দিন দিন খুব ফান্টুস হচ্ছে গো।

বিদিশা ঘুরে তাকাল,—কেন?

—খুব বারে ঢুকে ফুর্তি চালাচ্ছে আজকাল।

—তোমার বারে?

—না, রয়াল ড্রাগনে। এক কাস্টমারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটছি, হঠাৎ দেখি দলবল নিয়ে টঙ হয়ে বেরোচ্ছে। অর্চিষ্মান গ্লাসে চুমুক দিল,—দু পয়সা রোজগার নেই, অথচ ওড়ানোর শখ আছে বাবুর!

দাদার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে অর্চিষ্মান, বিদিশাই বলেছে। তবু এই মুহূর্তে মন্তব্যটা বিঁধল বিদিশাকে। যতই হোক নিজেরই দাদা তো।

খানিকটা কৈফিয়ত দেওয়ার সুরে বলল,—ওই সাঙ্গোপাঙ্গোগুলোই যত নষ্টের মূল। তারাই আরও বেশি বখাচ্ছে দাদাকে।

—কেউ কাউকে বখায় না বিদিশা। বখার এলিমেন্টগুলো মানুষের নিজের মধ্যেই থাকে। বন্ধুরা বড় জোর ক্যাটালিস্ট হতে পারে।

প্রতিবাদ করল না বিদিশা। ইচ্ছেও নেই, শরীরে ক্ষমতাও নেই। ট্যাবলেট মুখে ফেলে ঢকঢক খানিকটা জল গিলল, বসল গিয়ে বিছানায়।

কথা ঘোরানোর জন্যই বলল,—তোমার কে এক ইনসিওরেন্সের লোক এসেছিল, সইসাবুদ সব করে দিয়েছি।

—সবিতাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে? গুড। পলকের জন্য কী যেন ভাবল অর্চিষ্মান,—তুমি বিকেলবেলা গিয়েছিলে কোথায় বলো তো?

বিদিশা ঢোক গিলল,—তুমি ফোন করেছিলে, না?

—একবার নয়, তিন বার। তিনটের সময় করলাম, সুমতি বলল, এই মাত্র বেরিয়েছে। চারটের সময় করলাম, কেউ ধরল না, বেজে গেল। সাড়ে ছটার সময়ে পদ্মপাণি বলল, তুমি নাকি বলে গেছ ফিরতে রাত হবে। ...এতক্ষণ ধরে কোথায় ছিলে? বাপের বাড়ি?

হ্যাঁ বললেই ল্যাটা চুকে যেত, তবু মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,—না, বন্ধুর বাড়ি। হাতিবাগান।

—গাড়ি নিয়ে যাওনি যে?

বিদিশা ফাপরে পড়ে গেল। ওষুধে কাজ হচ্ছে না, মাথার টনটন ভাব বেড়ে গেছে হঠাৎ। শ্বশুরমশাইকে যা খুশি বলে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু অর্চিষ্মান কঠিন ঠাঁই। গাড়ি ছাড়া বিদিশার বেরোনোর যদি অন্য কোনও মানে করে বসে!

মুখভাব যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে গলা নরম করল বিদিশা,—আমার বন্ধুদের তো সবার গাড়ি নেই!...ভাবলাম, যদি কিছু মনে করে... যদি ভাবে চাল দেখাচ্ছি...

—ভাবুক যা খুশি। অর্চিষ্মান রুদ্রর বউ গাড়ি ছাড়া ট্যাঙোশ ট্যাঙোশ করে ঘুরবে, দিস ইজ সিম্পলি আনবেয়ারেবল্। অর্চিষ্মানের গলায় হালকা ঠাট্টার সুর। ঠোঁট কুঁচকে হাসছে,—যদি আমার বউটাকে কেউ চুরি করে নেয়, তখন কী হবে?

বিদিশাও হাসল। কষ্ট করে। আবার কথা ঘোরানোর চেষ্টা করল,—চুরি হয়ে যাওয়ার ভয়েই বুঝি অত টাকার ইনসিওরেন্স করলে?

—হা হা, ভাল আইডিয়া দিয়েছ তো! তোমাকে প্রোটেক্ট করার জন্য একটা বার্গলারি ইনসিওরেন্স করে ফেলা যায়, কী বলো? বউটা কোন অ্যাসেটের মধ্যে পড়বে? মুভেবল, না ইমমুভেবল?

হায় রে, আজ বিদিশার মনমেজাজ চূড়ান্ত খারাপ, আর আজই কিনা খুশির জোয়ার এসেছে অর্চিষ্মানের প্রাণে!

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বিদিশা বলল,—তার মানে আমি তোমার কাছে অ্যাসেট?

— নও? স্ত্রীই তো স্বামীর সব থেকে বড় সম্পদ।

—দশ লাখ টাকা দামের?

—আরে দূর, ওটা তো তুমি মরে গেলে পাব। কথায় বলে না, মরা হাতি লাখ টাকা? আমার তেমন মরা বিদিশা দশ লাখ।

—তুমি চাও আমি মরে যাই?

—বউ তো মরে ভাগ্যবানের। আমার কপাল অত ভাল নয়।

নিছকই লঘু রসিকতা, তবু বিদিশার বুকটা চিনচিন করে উঠল। অকারণে জল এসে গেছে চোখে।

অর্চিষ্মান অত শত খেয়াল করল না। তার বরাদ্দ দু পেগ শেষ, বোতল তুলে রাখল কাচের আলমারিতে। কাকে যেন মোবাইলে ফোন করছে।

বোতাম টিপতে টিপতে পুট করে বলল,—কোন বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলে গো? বয়ফ্রেন্ড, না গার্লফ্রেন্ড?

বিদিশা কেঁপে গেল আবার। কাঁপুনিটা ছড়িয়ে যাচ্ছে শরীরে, হঠাৎ খুব শীত করে উঠল।

অস্ফুটে বলল,—মহুয়া। ...তুমি চেনো না।

—বিয়েতে এসেছিল? বলেই হঠাৎ বিদিশার দিকে চোখ পড়েছে অর্চিষ্মানের। ফোন ফেলে দৌড়ে এল,—কী হয়েছে তোমার? কাঁপছ কেন?

বিদিশা আরও কুঁকড়ে গেল।

বিদিশার গায়ে হাত ছুঁইয়েই চমকে উঠেছে অর্চিষ্মান,—এ কী, গা যে পুড়ে যাচ্ছে!

এইটুকু স্পর্শ, এইটুকু সহানুভূতিরই বুঝি প্রয়োজন ছিল এই মুহূর্তে। বিদিশা প্রায়

খামচে ধরেছে অর্চিষ্মানের হাত, চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। ক্রমশ শিথিল হয়ে এল শরীর।

ঘোর থেকে আরও ঘোরে ডুবে যেতে যেতে বিদিশা শুধু বলল,—মরে যাচ্ছি... আমি মরে যাচ্ছি...

টানা তিন দিন জ্বরে বেহুঁশ হয়ে রইল বিদিশা।

জ্বরটা একটু অদ্ভুত ধরনের। সারাদিন একশো এক একশো দুই-এর ভেতর ঘোরাফেরা করে, বিকেল হলেই বাড়তে থাকে, রাত্তির আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ একশো চারে পৌঁছে যায়। একটা দিন মোটামুটি সুস্থির ছিলেন দিননাথ, পরদিন থেকেই পাগলের মতো ছোটাছুটি শুরু করে দিলেন। এই ডাক্তার ডাকছেন, এই স্পেশালিস্ট কল করছেন, দশ মিনিট পর পর খবর নিয়ে যাচ্ছেন বিদিশার। একই দিনে তিন তিনটে ল্যাবরেটরিতে ব্লাড টেস্ট হল। ম্যালেরিয়া ডেঙ্গু এনসেফেলাইটিস কোনও কিছুই নেই, টাইফয়েডও না। কড়া কড়া অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে যাচ্ছে ডাক্তার, খেয়ে সারাদিন আচ্ছন্নের মতো শুয়ে আছে বিদিশা। কে ঢুকছে কে বেরোচ্ছে খেয়াল নেই, গোটা পৃথিবীটাই যেন আবছা পর্দার ওপারে, মানুষগুলো নড়াচড়া করে ভূতের মতো, ঘরের আলো বড় নিষ্প্রভ ঠেকে, জাগতিক সব ধ্বনি বড় ক্ষীণ মনে হয়। এরই মধ্যেই টের পেল বাবা এসেছে, কথা বলছে শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে, তার মাথায় হাত রাখল বাবা...।

চতুর্থ দিন থেকে একটু একটু করে কমতে শুরু করল জ্বর। সাত দিনের মাথায় পুরোপুরি ছাড়ল।

অসম্ভব দুর্বল হয়ে গেছে বিদিশা। হেঁটে বাথরুম অবধি যাবে সে ক্ষমতাও নেই, পা টলে যায়, সুমতিকে ধরতে হয় বার বার। মুখ ঘোরতর বিস্বাদ, কোনও খাদ্যই গলা দিয়ে নামতে চায় না। মান্দা যত্ন করে স্টু বানিয়ে দেয়, জিভে দিয়েই থু থু করে ফেলে দেয় বিদিশা, জোর করে গিলতে গেলে বমি উঠে আসে। শরীর শুকিয়ে কাঠি, দুধে আলতা রঙে ব্যাধির মলিন ছোপ। মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে থাকে সারাক্ষণ। কখনও যা করেনি বিদিশা, তাই করছে, কাজের লোকদের মুখ করছে কারণে অকারণে, খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে উঠছে।

দিননাথের মুখের হাসি উবে গেছে, অর্চিষ্মানের কপালে ভাঁজ। পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে বিদিশার প্রায় দশ এগারো দিন লেগে গেল।

এখন আবার স্বচ্ছ ভাবে চিন্তা করতে পারছে বিদিশা। হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায় টাকা দেওয়ার দিনটার কথা, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তবে সেই সাংঘাতিক আতঙ্কটা অনেক মরে এসেছে। কেমন যেন মনে হয় ওটা একটা দুঃস্বপ্ন ছিল। মন থেকে দুঃস্বপ্নটা ঝেড়ে ফেলতে চায় বিদিশা, তবু কোথাও একটা চিন্তাটা বুঝি রয়েই যায়। আটকে থাকা কাঁটার মতো। বিশ্রী আঁশটে গন্ধের মতো। অর্ক কি ফোন করেছিল এর মধ্যে? কিছু কি জানতে পেরেছে? খুঁজে পেল লোকটাকে?

অসুখ হয়ে একটা লাভ অবশ্য হয়েছে বিদিশার। নতুন করে অর্চিষ্মানকে যেন চিনল সে। কাজপাগল মানুষ দোকানে গিয়েও ঘড়ি ঘড়ি খবর নিয়েছে বিদিশার, সন্ধে না হতেই

বাড়ি, তারপর সারাক্ষণ লেপটে আছে বিদিশার গায়ে! ছায়ার মতো! দু পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর হাত ছোঁয়াচ্ছে কপালে, নাড়ি টিপছে, রাতে বিদিশা একটু উ আ করলেই জেগে উঠছে অর্চিষ্মান! মানুষটার আপাত কঠোর খোলসের মধ্যে যে এমন এক কোমলহৃদয় স্বামী লুকিয়ে ছিল, অসুখটা না হলে কি বিদিশা জানতে পারত!

আজ বিকেলেও অর্চিষ্মানের কথাই ভাবছিল বিদিশা। বারান্দার দোলনায় বসে। পাশেই টুলে বেদানার রস, গ্লাস তুলে চুমুক দিচ্ছে মাঝে মাঝে। আজ নিলামঘর বন্ধ, জলদি জলদি ফিরবে অর্চিষ্মান, ভারী সুন্দর কাটবে সন্ধেটা। নীচের লনে বেড়াবে দুজনে, কিংবা একটু রাস্তায়, তারপর ফিরে এসে একসঙ্গে টিভি দেখবে...

আকাশে এখন গাঢ় শরৎ। ঝকঝকে নীল চাঁদোয়ার নীচে উড়ে বেড়াচ্ছে শিমুল তুলো। ভাদ্র এখনও যায়নি, তবু গুমোটটা প্রায় নেই, হাওয়া বইছে ঝিরঝির। খানিক দূরের মাঠে উঁকি দিয়েছে কাশফুল, শরতের খুশি মেখে দুলছে।

রসটুকু শেষ করে বিদিশা ঘরে এল। বসেছে ড্রেসিংটেবিলের সামনে। কী শাঁকচুন্নির মতো চেহারা হয়েছে, দেখলে কান্না পায়! মহার্ঘ ভেষজ লোশন মুখে ঘষল বিদিশা, হাত বুলিয়ে বুলিয়ে মুছতে চাইল মুখের মালিন্য। সরু করে আইলাইনার টানল চোখে, উজ্জ্বল হয়ে উঠল আঁখি। ছোট্ট লাল টিপ লাগাল কপালে, লিপস্টিকে আলতো রাঙিয়ে নিল ঠোঁট। চুলটাকে নিয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। বিনুনি বাঁধবে, না খোঁপা? বিনুনিই ঝুলিয়ে দিল পিঠে। নাইটি হাউসকোট ছেড়ে শাড়ি পরেছে, অর্চিষ্মান এসে গেল।

আজ অর্চিষ্মান নীচে হাঁটতে রাজি নয়। বিদিশাকে নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে বেরিয়ে পড়ল। পক্ষীরাজের মতো উড়ে চলেছে গাড়ি, অনেক দিন পর মুক্ত পৃথিবীর হাওয়া লাগছে বিদিশার গায়ে, চোখ বুঝি শুষে নিচ্ছে বাতাস।

অস্ফুটে একবার বলল,—আঃ, এই তো সুখ।

অর্চিষ্মান জিজ্ঞাসা করল,—কিছু বলছ?

স্বামীর কাঁধে মাথা রাখল বিদিশা। হাসল আপন মনে,—কই, বলিনি তো কিছু!

অর্চিষ্মানও হাসছে,—তুমি কিন্তু একটু পাগল আছ।

বিদিশা এবার খিলখিল হাসল,—আছিই তো। তুমি এতদিনে টের পেলে?

—জ্বরের সময় যা করছিলে, বাপস! বাইপাসে গাড়ির গতি বাড়াল অর্চিষ্মান,—কী ডিলেরিয়াম বকতে গো?...

—আমি? ডিলেরিয়াম?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি। হঠাৎ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠছ....ধরো ধরো, ওই অ্যাম্বাসাডরটাকে ধরো! আবার কখনও কখনও বিড়বিড় করছ...শয়তান, তুই আমার সঙ্গে বজ্জাতি করে পার পাবি ভেবেছিস!... কে শয়তান? কোথাকার কোন অ্যাম্বাসাডার? কেউ তোমায় পথেঘাটে কখনও ভয় দেখিয়েছিল বুঝি?

বিদিশার শরীর শক্ত হয়ে যাচ্ছিল। কণ্ঠ তালু শুকিয়ে কাঠ।

খরখরে জিভ ঠোঁটে বুলিয়ে বলল,—জানি না তো কিছু! আ-আ-আর কী বলতাম?

—ওই সবই। ... না না না, আর একটা কথাও বলতে...ফোনটা ভেঙে ফ্যালো, ফোনটা ভেঙে ফ্যালো! অর্চিষ্মান শব্দ করে হেসে উঠল,—হঠাৎ ফোনটার ওপর তোমার

রাগ হল কেন, অ্যাঁ?

বিদিশার স্বর ফুটছিল না। আর কী কী প্রলাপ বকেছে সে? আর কতটুকু কী জানতে পেরেছে, অর্চিষ্মান? অর্ক ভাস্করের কথাও কি...?

তরল আঁধারে ভরে যাচ্ছে চরাচর। সন্ধে নামছে। অন্ধকারটা বিদিশার বুকেও নেমে আসছিল।

[চোদ্দ]

অন্ধকার যখন নামে, অন্ধকারই নামে। ঠুনকো বাতি জ্বালিয়ে অন্ধকারকে অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয় বটে, কিন্তু তাতে অন্ধকারের অস্তিত্ব মিথ্যে হয়ে যায় না। ক্ষণস্থায়ী আলোটুকু চলে গেলেই আরও প্রকট হয় আঁধার।

বিদিশার কদিনের অসুস্থতা, অসুখের সূত্রে স্বামীকে একটু নিবিড় করে পাওয়া, কয়েকটা সুখী উজ্জ্বল মুহূর্ত বড় তাড়াতাড়ি নিবে গেল। সে প্রলাপের ঘোরে কী বকেছে, কী বকেনি ঠিক নেই, হয়তো অর্চিষ্মান তাকে আদৌ সন্দেহ করেনি, নিছকই কৌতূহলের বশে প্রশ্ন করেছিল দু একটা, তবু বিদিশা নিশ্চিন্ত হতে পারছে কই! স্বামীর প্রতিটি কার্যকলাপেই, হাঁটা চলা তাকানো প্রেম হাসি বিরক্তি রাগ, সবেতেই অস্বাভাবিকতার ছায়া দেখতে পাচ্ছে বিদিশা। কারণে অকারণে হৃৎকম্প হচ্ছে। সে রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে টের পেল অর্চিষ্মান পাশে নেই, ধড়মড়িয়ে উঠে আবিষ্কার করল অর্চিষ্মান পায়চারি করছে বারান্দায়, ব্যস ওমনি বুক ধড়াস ধড়াস। দুটো দিন অর্চিষ্মান বেশি রাতে বাড়ি ফিরল, ফিরেই বিনা বাক্যব্যয়ে বোতল নিয়ে বসেছে, বিদিশাকে আদর করতে করতে দুম করে অর্চিষ্মান বলল, আজ পূষনরা দোকানে এসেছিল, পলকে শিথিল হয়ে গেল বিদিশার শরীর। অর্চিষ্মান কী বুঝল কে জানে, সঙ্গে সঙ্গে সরে গেছে, বলল, তুমি ঘুমোও এখন। ঘুম কি এল বিদিশার?

মনে পাপ থাকলে বুঝি এমনটাই হয়। অহর্নিশি মেঘ ডাকে বুকে। সেই শয়তানটা যে আর ফোন করছে না, তাতেও যেন এতটুকু স্বস্তি নেই। বিদিশার কেবলই মনে হয় ওই নীরব থাকাটা ছলনা, বুঝি বা প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের আগে নিথর হয়ে আছে সমুদ্র।

ঝড় ঠিক উঠল না, তবে চেনা বাতাস এল। দুপুরে কেব্‌লে একটা হিন্দি ফিল্‌ম দেখছিল বিদিশা, নাচগানের মায়ায় আচ্ছন্ন হয়েছিল সামান্য, তখনই হ্যান্ডসেটে পিক পিক।

—কে, দিশা? আমি অর্ক।

বিদিশা হ্যান্ডসেটটা খামচে ধরল,—ও, তুমি!

—আছ কেমন এখন? অর্কর স্বর সহজ,—শুনলাম খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে?

—কে বলল?

—ফোন করেছিলাম তো। এক মহিলা ধরেছিল, বোধহয় তোমাদের কোনও কাজের লোক টোক হবে। সেই বলল, খুব বাড়াবাড়ি, তুমি নাকি বিছানা থেকে উঠতেই পারছ না...! কী হয়েছিল দিশা?

শেষ বাক্যটা কানেই গেল না বিদিশার, মস্তিষ্কে টোকা পড়েছে। কে ধরেছিল ফোন? সুমতি? আশ্চর্য, একবারও বলেনি তো!

স্নায়ু টনটন হল বিদিশার,—এক বারই করেছিলে?

—হ্যাঁ। খেটেখুটে একটা খবর মিলেছিল, সেটাই জানাতে...তুমি এখন ঠিক আছ তো দিশা?

একবারও শেষ বাক্যটা কানে গেল না বিদিশার। অস্ফুটে বলল—কী খবর?

—আমার অনুমানই ঠিক, বুঝলে? অর্ক হাসল,—গাড়ির নম্বরটা বোগাস।

—কী করে জানলে?

—ইজি প্রসেস। মোটর ভেহিকলসে গিয়ে খোঁজ করলাম। ওখানে আমার একটা চেনা লোক আছে, ওই ফাইল টাইল ঘেঁটে বার করে দিল। ডব্লু এম ডি সেভেন নাইন ওয়ান জিরো গাড়ির মালিক একজন ক্রিকেটার। এয়ারলাইনসে কাজ করে। ঠিকানা-টিকানা নিয়ে তার বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম আমি তাকে ভালভাবেই চিনি। ক্রিকেট মাঠেই আলাপ হয়েছে। জেনুইন জেন্টলম্যান। ও কালপ্রিট হতেই পারে না।

—ও।

—আরও আছে। আমি ওখানেই থামিনি। নিজের চোখে গাড়িটাও দেখে এসেছি। এবং সেটা মোটেই সাদা নয়, নেভি ব্লু। ওই ক্রিকেটার গাড়িটা কিনেছিল সাম মুখার্জির কাছ থেকে। প্রায় পাঁচ বছর আগে। সে ভদ্রলোক এখন থাকেন বিদেশে। কানাডায়।

—ও। বিদিশা চুপসে গেল,—তার মানে লোকটাকে ট্রেস করার আর কোনও উপায়ই নেই?

—তা কেন, উপায় তো আছেই। লোকটা নিজেই তো ট্রেসেবল। অর্ক ঝুপ করে গলা নামাল,—লোকটাকে বোধহয় আমি পেয়েও গেছি।

—কোথায় পেলে? বিদিশা হকচকিয়ে গেল,—কী করে পেলে?

—সে অনেক কথা। লোকটাকে সাডেনলি দেখতে পেয়ে আমি ফলো করেছিলাম।...আমার চোখের ভুল করার কথা নয়...যাই হোক, বাড়িটা দেখে এসেছি। পাড়া থেকে ইনফরমেশানও কালেক্ট করেছি কিছু।

—কী ইনফরমেশান?

—এক্ষুনি বলা যাবে না। আর একটু সময় দাও, অন্তত আজকের দিনটা। অর্ক একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল,—তুমি আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারবে?

অজান্তেই ঘামতে শুরু করেছে বিদিশা। জড়ানো গলায় বলল,—কবে? কোথায়?

—আমি তো এখন সল্টলেকেই আছি। ক্যাম্পে। কাল আসতে পারবে?

—কখন?

—সন্ধেবেলা? কাল আমার সকালে প্র্যাকটিস আছে, দুপুরে ক্লাস, বিকেলে একটা ট্রায়াল কম্পিটিশন...

—কোথায় আসব?

—স্টেডিয়ামের ইস্ট গেটে। এই ধরো সাতটায়?

—ঠিক আছে।

—এসো কিন্তু। আমি অপেক্ষা করব।

—আচ্ছা।

টেলিফোনটা রেখে দিয়েই বিদিশার মনে হল, অর্ক কোনখানে লোকটাকে দেখেছে জানা হল না তো? কবে দেখেছে? কোথায় বাড়ি লোকটার? খবর জোগাড় করেছে বলল, কী খবর? লোকটাকে কে লাগিয়েছিল জানতে পেরেছে কি? কী করে জানবে?

ভাবতে ভাবতে ভাবনারা তালগোল পাকিয়ে গেল। ঝিমঝিম করছে মাথা। টিভিতে ভয়ঙ্কর মারপিটের দৃশ্য চলছে। পাহাড়কিনারে মরণ-ঝাপটাঝাপটি করছে হিরো আর ভিলেন। উফ, কী আওয়াজ! বিদিশা রিমোট টিপে পর্দা ধূসর করে দিল। টলমল পায়ে বাথরুমে ঢুকেছে, জল ছেটাচ্ছে মুখে। হঠাৎ চোখ তুলতেই শিরদাঁড়ায় কারেন্ট। এক মুহূর্ত পরেই ভুল ভেঙেছে। আয়নায় নিজেরই মুখ দেখে এত ভয়!

স্খলিত পায়েই ঘরে ফিরে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল বিদিশা। অশান্ত নিশ্বাস স্বাভাবিক হচ্ছে ক্রমশ। চোখ ঘুরছে কড়িকাঠে, মাখন রং দেওয়ালে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের জানালা সব বন্ধ, দরজাও ভেজানো, শীতল আবহে এখন শুধুই আবছায়া। বাইরে সূর্য হেলে গেছে পশ্চিমে, ভেন্টিলেটার ফুঁড়ে তার এক কুচি আলো এসে পড়েছে দেওয়ালে, সরু সরু গ্রিলের ছায়াকে জেলের গরাদ বলে ভ্রম হয়। অসহায় বন্দিনীর মতো গভীর নৈরাশ্যে ছেয়ে যাচ্ছিল বিদিশার বুক। লোকটাকে ধরে মূল অপরাধীর সন্ধান যদি পাওয়াও যায়, কী লাভ হবে বিদিশার? ব্ল্যাকমেলারটার সে কী করতে পারে? পুলিশে দেবে? সে বুকের পাটা বিদিশার আছে? তাহলে অর্কর কাছে গিয়েই বা কী লাভ? কিল খেয়ে কিল হজম করাই তো তার ভবিতব্য। শুধু যদি লোকটা বিদিশাকে আর উত্ত্যক্ত না করে, মুক্তি দিয়ে দেয়...

সুমতি দরজায় টোকা দিচ্ছে,—বউদি, চা খাবেন না?

আচ্ছন্ন ভাব ছিঁড়ে গেল বিদিশার। দেওয়াল ঘড়ির দিকে চোখ গেল। চারটে পঁয়ত্রিশ। এত তাড়াতাড়ি বয়ে গেল সময়?

গলা তুলে বলল,—টেবিলে দাও, আমি যাচ্ছি।

হলঘরে গিয়ে একটু অবাকই হল বিদিশা, শ্বশুরমশাই এখনও আসেননি। জিজ্ঞাসা করল,—বাবা কোথায়?

—বাবু এখন চা খাবেন না বললেন। শরীরটা নাকি ভাল নেই।

—সে কী! কী হয়েছে বাবার?

—তা বলেননি। বারান্দায় বসে আছেন চুপ করে।

চিন্তিত মুখে দক্ষিণের বারান্দায় এল বিদিশা। ইজিচেয়ারে আধশোওয়া দিননাথ, আড়াআড়ি হাতে দু' চোখ ঢাকা।

বিদিশা গলা খাঁকারি দিল,—কী হয়েছে তোমার?

দিননাথ চোখ থেকে হাত সরালেন না। যেন জানতেনই বিদিশা তাঁর খোঁজ নিতে আসবে। বললেন,—কিছু হয়নি রে। এমনিই গাটা একটু গুলোচ্ছে।

—অম্বল হয়েছে?

—ওই রকমই।

—ওষুধ খেয়েছ?

—আমি কি কথায় কথায় ওষুধ খাই?

তা অবশ্য ঠিক। ওষুধ খাওয়াতে যে দিননাথের অনীহা আছে, দেখেছে বিদিশা। অল্প হেসে বলল,—এবার থেকে একটা কাজ করতে হবে। রান্নাবান্নায় মশলা কমিয়ে দিতে বলব। সরষে শুকনো লঙ্কা সব বাদ। বয়স তো হল, এবার একটু সেদ্ধটেদ্ধ খাওয়া অভ্যেস করো।

দিননাথ সোজা হলেন খানিকটা। ঘুরে তাকালেন বিদিশার দিকে। স্নেহময় দৃষ্টি ঘন হল,—তুই আমার জন্য খুব ভাবিস, না রে?

—আমি না ভাবলে কে ভাববে? তুমিও তো আমার জন্য ভাবো।

—তুই তো দেখছি তোর শাশুড়ির মতো করে কথা বলছিস। দিননাথের হাসিটা বড় দুঃখী দুঃখী দেখাল।

বিদিশার চোখে প্রায় জল এসে গেল। তাকে এত ভালবাসেন মানুষটা, কত আদরে যত্নে এ বাড়ির কর্ত্রীর আসনে বসিয়েছেন, প্রতিটি কথায় সেই কবে মারা-যাওয়া শাশুড়ির সঙ্গে মিল খুঁজে পান, বিনিময়ে প্রতারণা ছাড়া সে কী দিয়েছে এই পরিবারকে? শাশুড়ির হারটা পর্যন্ত বেচে দিয়ে এল নিজের দুষ্কর্ম ঢাকতে... ছিঃ।

মোড়া টেনে বিদিশা বসল শ্বশুরমশায়ের সামনে। মাথা নামিয়ে বলল,—তাঁর সঙ্গে আমার তুলনা কোরো না বাবা। আমি তাঁর মতো হব, সে যোগ্যতা আমার কই!

—কেন, তুই বা কম কীসে? দিননাথ বিদিশার মাথায় হাত রাখলেন,—আমি কি তোকে এমনি এমনি এ বাড়িতে এনেছি? এ সংসারটা তোকেই মাথায় করে রাখতে হবে রে বেটি। সব দায় বইতে হবে তোকেই। আমি মরে গেলে আমার ছেলেটাও তো তোরই জিম্মায় থাকবে।

—এসব আবার কী অলুক্ষণে কথা? হঠাৎ মরে যাওয়ার কথা আসছে কেন?

—ঠিকই তো বলছি। জীবন তো অনিত্য, কবে আছি, কবে নেই...

—বললেই হল? তোমায় মরতে দিচ্ছে কে?

—ওরে পাগলি, সময় হলে সবাইকেই যেতে হবে। এই পৃথিবীতে কেউ কাউকে আটকে রাখতে পারে না রে।

—থামো তো। সামান্য একটু অম্বলেই আবোল তাবোল শুরু করে দিলে? দিননাথকে লুকিয়ে টুক করে চোখের জল মুছে নিল বিদিশা,—যাও, উল্টোপাল্টা কথা না বলে একটু হেঁটে এসো তো।

—হুঁ, যাই।

শ্বশুরমশাইকে রওনা করিয়ে দিয়ে বিদিশা নিজের মহলে এল। দুঃখী মানুষের সান্নিধ্যে থাকার একটা মহৎ গুণ আছে, তারা আরও দুঃখী মানুষের মনোকষ্ট কিছুটা লাঘব করে দেয়। বিদিশারও একটু হালকা লাগছিল নিজেকে। দু পাঁচ মিনিট টিভি দেখল, ঘুৎতেরি বলে উঠে গিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ব্যালকনিতে, আবার ঘরে ফিরে বৈকালিক প্রসাধন সেরে নেমে এল একতলায়, মানদা সুমতির ওপর একটু

খবরদারি করল, পদ্মপাণিকে ডেকে ঝাড়পোঁছ করাল বৈঠকখানাটা, তারপর একা একা অনেকক্ষণ পায়চারি করল লনে। বাতাসে শরতের গন্ধ, বেশ লাগছিল। পুজোর যদিও এখনও মাসখানেক বাকি, তবু এবার পুজোয় কার জন্য কী কিনবে, তা নিয়ে পরিকল্পনাও করল মনে মনে।

বিকেলটা কেটে গেল। রাতটাও।

পরদিন অর্চিষ্মান বেরিয়ে যেতেই আবার বিদিশার শুরু হয়েছে চোরা টেনশান। যাবে কি আজ অর্কর কাছে? না গেলে কী হয়? অর্ক সত্যিই কি জানতে পেরেছে কিছু? ফোনেই তো বলতে পারত, ডেকে পাঠাল কেন? এই শহরে কোটিখানেক লোকের মাঝে ওই লোকটাকেই দেখতে পেয়ে গেছে অর্ক—কীরকম আষাঢ়ে গল্পের মতো শোনাচ্ছে না? রহস্যের অত কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েও স্বরে তো তেমন উত্তেজনা ছিল না অর্কর? বরং যেন বিদিশার সঙ্গে দেখা করার জন্যই বেশি ব্যগ্র মনে হচ্ছিল! অর্ক কি তবে তার সঙ্গ পাওয়ার জন্য উৎসুক? সবই সম্ভব, শেষ ক'টা দিন সে বোধহয় অর্ককে একটু বেশিই প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছে। অর্ক বিদিশার জন্য খেটেছে, প্রতিদানে বিদিশার কাছ থেকে আবেগমাখা নরম ব্যবহার তার প্রাপ্য ছিল, ব্যস, এখানেই লেনাদেনা শেষ—অর্ক বোধহয় জীবনের এই সরল হিসেবটা মানতে রাজি নয়। নতুন করে সম্পর্ক গড়ে ওঠা মানে নতুনতর জটিলতার সম্ভাবনা। হুঁহু, গাড়িটার হদিশ করতে পারল না, মানুষটাকে পেয়ে গেল! অত সোজা!

যুক্তিবুদ্ধি মানুষকে এক দিকে ঠেলে, নিয়তি টানে অন্য দিকে। দুপুরের পর থেকে মন বদলে গেল বিদিশার। এক অদম্য কৌতূহলে ছটফট করছে। অর্ক আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে অসৎ আচরণ করেনি, মিথ্যে বলাও অর্কর স্বভাববিরুদ্ধ, হয়তো অর্ক সত্যিই কিছু জানতে পেরেছে। লোকটা তাকে আর জ্বালাতন করুক আর নাই করুক, মেঘের আড়ালে মেঘনাদটা কে জানবে না বিদিশা?

সাতটার একটু আগে বিদিশা বেরিয়েই পড়ল। কপাল ভাল, রবি আজ তাড়াতাড়ি চলে গেছে, গাড়িটা বার করে নিল গ্যারাজ থেকে। পথ খুব বেশি নয়, ফাঁকা ফাঁকা অন্ধকার মাড়িয়ে অচিরেই পৌঁছে গেছে স্টেডিয়াম।

পুব দিকের গেটটায় কীসের যেন ভিড়! রাস্তার ঠিক মধ্যিখানে বেশ কিছু মানুষ জটলা করে আছে! একটু তফাতে গাড়ি থামাল বিদিশা। চোখ চালাচ্ছে এদিক ওদিক, অর্কর সন্ধানে।

এক উগ্র চেহারার যুবক গাড়ির দিকে এগিয়ে এল। কর্কশ স্বরে বলল,—গাড়ি এখান দিয়ে যাবে না, ঘুরিয়ে নিন।

বিদিশা ভুরু কুঁচকোল,—কেন?

—কেন কী! দেখছেন না অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে!

—কী অ্যাক্সিডেন্ট?

উত্তর না দিয়ে ছেলেটা ফিরে গেল জটলায়। সহসা বিদিশার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কী এক সিগনাল পাঠাল মস্তিষ্কে, মোহাবিষ্টের মতো নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে। পায়ে পায়ে

ভিড়টার দিকে যাচ্ছে। জটলার ফাঁক দিয়ে দৃশ্যটা চোখে পড়তেই টলে গেল মাথা।

দু হাত ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কে?...রক্তে ভাসছে...অর্ক না? অর্কই তো!

প্রায় চৈতন্যরহিত দশাতেও টুকরো টুকরো মন্তব্য কানে আসছিল বিদিশার।

—শালা। বড়লোকগুলো নিজেদের কী ভাবে মাইরি! তরতাজা ছেলেটাকে বেমালুম পিষে দিয়ে বেরিয়ে গেল...!

—গাড়িটাকে দেখেছেন দাদা? নাম্বার নোট করেছেন?

—আর নাম্বার! রাস্তার অর্ধেক আলো জ্বলে না...

—কাল্টু বলছিল অ্যাম্বাসাডার...

—দূর মশাই, ও জেনে কী হবে? বডিটা ওঠান আগে, হাসপাতালে নিয়ে চলুন...ওই তো ওই মারুতিটা আছে...

—কাকে ওঠাবেন দাদা? ছেলেটা তো অলরেডি ডেড।

—ইশ, ঘিলু একেবারে ছেতরে দিয়েছে গো!

বিদিশার পায়ের নীচে কি ভূমিকম্প হচ্ছে? দুলছে গোটা পৃথিবী? বিস্ফারিত-চোখ বিদিশা কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল। তারপর হঠাৎই ছুট লাগিয়েছে। স্টিয়ারিং-এর ওপর থরথর কাঁপছে হাত, অ্যাক্সিলারেটারে উল্টোপাল্টা চাপ দিচ্ছে পা, মাতালের মতো দৌড়চ্ছে গাড়ি।

বাড়ি ফিরে গাড়ি গ্যারাজে ঢোকানোর কথাও মাথায় এল না বিদিশার। উদভ্রান্তের মতো ঘরে পৌঁছে গেল। কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে পাঁজরে গজাল ঠুকছে কেউ। ঠং ঠং...

ঠিক তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠল। হ্যান্ডসেট বিছানায় পড়ে, ঝাঁপিয়ে সেটাকে তুলে নিল বিদিশা।

আর্তনাদ করে উঠেছে,—কে? কে?

অনেক দিন পর আবার সেই পুরনো ধাতব স্বর,—কেমন লাগছে এখন, বিদিশা?

দ্বিতীয় পর্ব

[এক]

বাজার থেকে ফিরেই অভ্যাসমতো খবরের কাগজ নিয়ে বসে পড়েছিল পার্থ। হাতে পেনসিল, ঘন ঘন আঙুল ঠুকছে কপালে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল,—ইউরেকা! ইউরেকা!

মিতিন শোওয়ার ঘরে। বুমবুমকে স্কুলের জন্য তৈরি করছে। ছেলের ঘোঁটি চেপে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে গলা ওঠাল, —কী হল চেল্লাচ্ছ কেন?

—পেয়ে গেছি। চশমখোর।

ও, শব্দজব্দ! আপন মনে ভ্রূভঙ্গি করল মিতিন। ইদানীং এই খেলাটা নিয়ে খুব মেতেছে পার্থ, সারা সকাল ধরে চলে শব্দ খোঁজার পালা। ঠেলে ঠেলে ওঠানো যায় না, কাজে পাঠানো যায় না, কী ঝকমারি! বললেই ওমনি বাবুর গোঁসা হবে, কেন আমি কি কাজ করি না!

হ্যাঁ, কাজ পার্থ করে বটে! এগারোটা নাগাদ হেলে দুলে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে টানা দেড় মিনিট হেঁটে ঢাকুরিয়া স্টেশন, অন্তত খান দুই ট্রেন ছেড়ে তৃতীয় ট্রেনে আরোহণ, শেয়ালদা নেমে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে শ আড়াই গজ দূরে নিজস্ব প্রেসে পদার্পণ, কর্মস্থলে পৌঁছেই স্ট্যান্ডফ্যানের সামনে জামাটি ঝুলিয়ে দিয়ে তুড়ি মেরে হাই তোলা, কম্পোজিটার মেশিনম্যানকে আলগা নির্দেশ বিতরণ, এবং পাঁচটা বাজলেই শখের প্রাণ গড়ের মাঠ, তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাবু চললেন নাটকের রিহার্সালে— সব কটাই তো কাজ! এমন টিকিস টিকিস বরটাকে যে কী করে শোধরায় মিতিন!

বুমবুম নিজে নিজেই জুতো পরছে। বয়স চারও ছোঁয়নি, এর মধ্যেই সে ঘোরতর স্বাধীনচেতা। মা চুল আঁচড়ে দিয়েছে বলে এখনও এক রাশ বিরক্তি তার কপালে। ছেলে ব্যাগ পিঠে ঝোলানোর আগে মিতিন টুক করে টিফিনবাক্সটা খুলে দেখে নিল একবার। আঙুর ডিমসেদ্ধ বিস্কুট সন্দেশ। নাহ, বিমল্ল ঠিকই গুছিয়ে দিয়েছে। দানবীর ছেলে আঙুর আর সন্দেশ বিলোবেই, অন্তত বাকি দুটো যদি মুখে তোলে!

পার্থ আবার চেঁচাচ্ছে,—আচ্ছা, যার দাড়ি জন্মায়নি, এক কথায় কী হবে গো?

বুমবুম গটগট বেরোচ্ছে ঘর থেকে, পিছন পিছন এল মিতিন। স্বামীকে আলগা দেখে নিয়ে বলল,—এও জানো না? মাকুন্দ।

—আহ্, তিন অক্ষর নয়, ছ অক্ষর।

বিমলা সেন্টারটেবিলে চা নামাচ্ছে। তার হাতে ছেলেকে জিম্মা করে দিয়ে মিতিন বসল সোফায়। কাপে একটা চুমুক দিয়ে বলল,—অজাতব্যঞ্জন হতে পারে।

—কী ব্যঞ্জন?

—অজাত। অর্থাৎ যার ব্যঞ্জনা জন্মায়নি। ব্যঞ্জনা অর্থ গোঁফদাড়িও হয়।

সন্দিগ্ধ চোখে স্ত্রীকে একবার দেখল পার্থ। দাড়ি চুলকে পূর্ণ করল ছক। পরক্ষণেই প্রশ্ন,—মহাভারতের শয়তান, যাকে বায়ু ছোঁয়...? তিন অক্ষর।

—কীচক।

—আর যার হাত বেঁকা? এটাও তিন।

—শুক্র কী দিয়ে?

—খ।

—ঠিক।

—যাক, এটা কমপ্লিট। পেনসিল নামিয়ে চায়ের কাপ টানল পার্থ,— তুমি রিয়েলি জিনিয়াস। এমন পটাপট বলে দিতে পারো...!

—মন দিয়ে লেখাপড়াটা করেছিলাম স্যার। তোমার মতো মেয়েদের পেছনে ঘুরে ঘুরে সময় কাটাইনি।

পার্থ চোখ পাকিয়ে তাকাল,—ডোন্ট ফরগেট, মেয়েটা কিন্তু তুমিই।

—আরও কোথায় কোথায় ছোঁক ছোঁক করে বেড়াতে...আমি কি তোমাকে পাহারা দিতে গেছি!

—এবার কিন্তু মিথ্যে বললে। আমাকে পাহারা দিতে দিতেই তুমি মেয়েটিকটিকি হয়েছ।

মিতিন হেসে ফেলল। পার্থর রসিকতায় কণামাত্র হলেও সত্যি আছে বইকি। কলেজে দু দুবার আলাদা আলাদা বান্ধবী নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিল পার্থ, তাকে না জানিয়ে। নির্দোষ প্রমোদ। দু বারই ধরে ফেলেছিল মিতিন। বান্ধবীরা যে ফিল্মের গল্প বলে, পার্থর মুখেও সেই ফিল্মের কথা—ব্যস এইটুকু থেকেই জেরা শুরু, এবং আত্মসমর্পণ।

হাসতে হাসতেই মিতিন বলল,—তুমি কিন্তু একটা অফেনসিভ কথা বললে। আমি টিকটিকি?

—পাড়াপড়শিরা তো তাই বলে।

—আর তোমাকে কী বলে?

—কী আর... ! টিকটিকির আরশোলা।

কথাটা নেহাতই রঙ্গ করে বলা। তবু মিতিনের হাসি চুপসে গেল। ভার ভার গলায় বলল,—তোমার আজকাল কমপ্লেক্স আসছে মনে হচ্ছে?

—আমার! পার্থ হো হো হেসে উঠল,—এমন টিকটিকি পেয়ে আমার আরশোলা জনম সার্থক হয়ে গেছে। কটা লোকের বউ-এর মাথায় এত বুদ্ধি থাকে!

—থাক, আর ঠাট্টা করতে হবে না। মিতিন উঠতে গিয়েও কী ভেবে বসল আবার। ইতস্তত করে বলল, —দুপুরে আজ একটা কাজ করে দিতে পারবে?

নাটকীয় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল পার্থ,—আজ্ঞা করো দেবী...

—ফের কাজলামি? সিরিয়াসলি শোনো। একজনকে টেইল করতে হবে।

—কেন, তোমার শাগরেদরা কোথায়?

—অজয়কে আমি আজ ইনসিওরেন্স অফিসে পাঠাচ্ছি। সুভাষ যাবে মধ্যমগ্রাম। গয়না চুরির কেসটার টুকিটাকি কয়েকটা ইনফরমেশান দরকার।

—অ। সোফার ওপর বাবু হয়ে বসল পার্থ। সিগারেট ধরাল একটা, —বলো, কার পেছনে লাগতে হবে?

—একজন বিজনেসম্যানের। দীপক ভাল্লা।

—ব্যাটাছেলে?

—কেন, মেয়েছেলে হলে বুঝি খুশি হতে?

—মিথ্যে বলব না, হতাম। তবে মেয়েদের পিছু নেওয়ার অবশ্য একটা প্রবলেমও আছে। মেয়েরা সিমপলি আনটেইলেবল। মনে আছে তোমার মিসেস নীলিমা সিনহা আমায় কেমন ভুগিয়েছিল? পার্লারে ঢুকল তো ঢুকলই, বেরোল সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পর। কী সব চুনকাম করেছে, হেয়ারস্টাইল বদলে ফেলেছে, বয়স কমিয়ে ফেলে...। আমি তো চিনতেই পারতাম না, ভাগ্যিস শাড়ির কালার মনে ছিল!

মিতিন ঠোঁট টিপে হাসল,—দীপক ভাল্লাকে নিয়ে তোমার সে সমস্যা নেই। আমি ওর ছবি আর অ্যাড্রেসটা তোমায় দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক দুটোর সময় ওর অফিসের গেটে চলে যাবে। সওয়া দুটো থেকে আড়াইটের মধ্যে লোকটা অফিস থেকে বেরোবে, এবং পসিব্‌লি ধর্মতলার এক বারে যাবে। ওখানে দুজন লোক দেখা করতে আসবে ভাল্লার সঙ্গে, তুমি কাছাকাছি বসে ওদের কথাবার্তাগুলো শোনার চেষ্টা করবে। পারলে ভাল, না পারলে এটুকুনি শুধু নোট করবে, কথার মাঝে কোনও ঝগড়াঝাঁটি হয় কিনা। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে অফিস ফেরা পর্যন্ত দীপক কী কী করে তার ডিটেলটা আমার চাই।

—হু ইজ দিস ব্লাডি ভাল্লা? পার্থ সিগারেট নেবাল।

—ভাল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তিন মালিকের ছোট মালিক। অর্থাৎ বাবা ভাল্লার কনিষ্ঠ পুত্র। পিতৃদেবের সন্দেহ কোম্পানি থেকে টাকা সরাচ্ছে ছোট ছেলে, এবং কোনও আনহোলি বিজনেসে নেমেছে। পারহ্যাপস স্মাগলিং। আমার যা ফাইন্ডিং, তাতে বাবা ইজ হাফ ট্রু। ছেলেটা ফেঁসে গেছে। বিগড়েছিল, কিন্তু এখন নিজেকে শুধরে নিতে চায়। লোকগুলো টাইপ অফ ব্ল্যাকমেলিং করছে ওকে। টোটাল রিপোর্টটা বাবাকে দিয়ে আমি জলদি জলদি হাত ধুয়ে ফেলতে চাই। বুঝলে কিছু?

—বুঝলাম। ভাল্লা ওই ব্ল্যাকমেলারগুলোর সঙ্গে আজ মিট করছে।

—গুড। তুমি তো বেশ ইমপ্রুভ করছ দিন দিন! মিতিন আদর করে পার্থর থুতনি নেড়ে দিল,—একটা কথা বলে রাখছি মশাই। বারে গিয়ে নিজেই যেন সেঁটে যেয়ো না।

দু হাত জোড় করে মাথা ঝোঁকাল পার্থ,—নিশ্চিন্ত রহো দেবী, এ দাসের সুরার রুচি নাই।

কথাটা খাঁটি, তবু পুরোপুরি আশ্বস্ত হল না মিতিন। বারে শুধু সুরাই পাওয়া যায় না, অভিরুচিমতো সুখাদ্যও জোটে। পার্থ অত্যন্ত ভোজনবিলাসী, প্রিয় খাবার সামনে থাকলে তাকে নড়ানো কঠিন। সেবার এক প্রেমিক প্রেমিকাকে ফলো করে রেস্তোরাঁয় ঢুকেছিল পার্থ, কপোতকপোতী কখন হাওয়া, পার্থ বসে বসে কবিরাজি সাঁটাচ্ছে! মিতিনের বকাবকিতে এখন অবশ্য খানিক পরিবর্তন হয়েছে পার্থর, ওরকম পরিস্থিতিতে অর্ধভুক্ত খাবার পকেটে পুরে নিয়ে ধাওয়া করে টার্গেটকে। আজ যদি চাওমিন বা স্যুপ

অর্ডার দিয়ে বসে, তা হলে কী ঘটবে বলা মুশকিল। তাও ঝুঁকিটা নিতেই হচ্ছে মিতিনকে। হাতে কাজ জমেছে অনেক, এই সব ছুটকো ছাঁটকা কেস ঝটপট ঘাড় থেকে নামানো দরকার।

কেস এখন মিতিনের হাতে আসছেও বটে। সাত বছর আগে তৃতীয় নয়ন নাম দিয়ে যখন ডিটেকটিভ এজেন্সিটা খুলেছিল, তখন সারাদিন মাছি তাড়াত বসে বসে। যতই এখন নিন্দেমন্দ করুক, আর পার্থর ওপর চোটপাট করুক, ওই প্রেসই তখন ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে সংসারের। প্রথম কেস এল একটি মেয়ে, স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অভিযোগ, প্রমাণ জোগাড় করে দিতে হবে। খেটেখুটে করল কাজটা, তারপর আবার বসে রইল টানা দু মাস। বাবা এসেছে, মেয়ে লটঘট করছে, মেয়ের প্রেমিকের চরিত্র সম্পর্কে বাবা যথেষ্ট সন্দিহান, তার নাড়িনক্ষত্র জানতে চায়...। এ ভাবেই গড়িয়ে গড়িয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে চলছিল তৃতীয় নয়ন। কিন্তু মেয়েমানুষের শতেক বাধা। এজেন্সি পিক-আপ নেওয়ার আগে বুমবুম এসে গেল পেটে, ব্যস তৃতীয় নয়ন বছর দেড়েকের জন্য পুরোপুরি অন্ধ। তারপর আবার গা ঝাড়া দিল মিতিন, লেগে পড়ল নতুন উদ্যমে। গত বছর থেকে কারবার দিব্যি জমে উঠেছে, ফেব্রুয়ারিতে এক পাঞ্জাবি দম্পতির বাচ্চা চুরির রহস্য সল্‌ভ করে পুলিশ মহলেও মিতিন এখন রীতিমতো পরিচিত। তিন চারটে কেস তো হাতে থাকছেই সব সময়, কখনও কখনও বেশিও।

কত বিচিত্র কেসই যে আসে! বাবা ছেলের গোপন খবর জানতে চায়, ছেলে মায়ের, মা মেয়ের, মেয়ে শাশুড়ির...! আর স্বামীস্ত্রীর পরস্পরকে অবিশ্বাস করা তো আছেই। যুগের হাওয়া! সম্প্রতি ইনসিওরেন্সের কেসও জুটছে কিছু, ক্লেমের সত্যিমিথ্যে নিরূপণ করতে হয় মিতিনকে। দিনে দিনে কত কিছু শিখছে মিতিন, কত কিছু যে জানছে!

বুমবুমকে পৌঁছে বিমলা ফিরেছে। রান্নাঘরে গিয়ে তাকে কিছু সাংসারিক নির্দেশ দিল মিতিন, তারপর স্টাডিরুমে এসে বসল। তাদের এই দু কামরার ভাড়াবাড়িতে একটা চওড়া বারান্দা আছে। পিছন দিকটায়। বারান্দাটাকে ঘিরে নিয়েছে মিতিন, নিজস্ব কাজকর্মের জন্য। খুপরি জায়গাটুকুতে অনেক কিছুই আছে, মিতিনের চেয়ার টেবিল, ছোট সোফা, একখানা ফাইল ক্যাবিনেট, বেঁটে একটা স্টিল আলমারি, বইপত্র। গোপন নথিপত্রও থাকে আলমারিতে, নিজের পেশার প্রয়োজনীয় জিনিসও।

ক্যাবিনেট থেকে গয়না চুরির ফাইলটা পাড়ল মিতিন। বাড়ির সকলের জবানবন্দি রয়েছে, পড়ছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কর্তা আর গিন্নির স্টেটমেন্টে কোথায় যেন একটা ফাঁক আছে, মনে হচ্ছিল মিতিনের। কর্তা বলছেন স্লিপিং পিল খেয়েছিলেন নৈশাহারের ঠিক আগে, গিন্নির বক্তব্য সাড়ে দশটার সময়ে ট্যাবলেট খাওয়ার জল দিয়েছিলেন কর্তাকে। কাজের লোকের জবানবন্দি অনুযায়ী সাড়ে নটা থেকে দশটার মধ্যে বাড়ির লোকের খাওয়া দাওয়া সব চুকে যায়, কর্তা খুব টাইমের মানুষ, কোনও রকমেই বেনিয়ম পছন্দ করেন না...। সেদিন কি কোনও কারণে দেরি হয়েছিল? কেউ উল্লেখ করেনি তো! কর্তা গিন্নির মধ্যে কেউ একজন মিথ্যে বলছে। অথবা ভুল। কিন্তু কেন?

ফাইল বন্ধ করে মিতিন চোখ বুজল। ভাবছিল। তার থট প্রসেস রীতিমতো এক শারীরিক ক্রিয়া। গভীর চিন্তার সময়ে মিতিন অনবরত নাক মুখ কুঁচকোয়, কখনও

মিটিমিটি হাসে, কখনও অসম্ভব গম্ভীর। যে কেউ এখন বছর বত্রিশের এই শ্যামলরঙ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার রমণীটিকে দেখলে পাগল বলে ভুল করবে।

টেলিফোন বেজে উঠল। মূল ফোন ড্রয়িংরুমে, এখানে এক্সটেনশান লাইন। চোখ বুজেই মিতিন রিসিভার তুলেছে,—প্রজ্ঞাপারমিতা বলছি।

—আমি অনিশ্চয় তালুকদার। ডিসি ডিভি।...ম্যাডাম কী খুব বিজি নাকি?

মিতিনের মুখমণ্ডল হাসিতে ভরে গেল। ভদ্রলোকের সঙ্গে বছর দুয়েকের পরিচয়, হৃদ্যতাও আছে বেশ, তবু এখনও লোকটা ফোনে নামের সঙ্গে পোস্টের উল্লেখ করে। করবেই।

হাসিমুখে মিতিন বলল,—ওই আর কি। ফেঁসে আছি বলতে পারেন।

—তার মানে খুব কামাচ্ছেন, অ্যা?

—আপনাদের আশীর্বাদ দাদা।

—হুম।...তা কর্তাটি কোথায়? তিনিও কামাই-এ বিজি?

—আজ্ঞে না। তিনি এখন অক্ষরের ওপর গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছেন।

—সেটা কী কেস?

—ক্রসওয়ার্ড পাজল। বাংলায়।

—আছেন বেশ দুটিতে, হেঁ হেঁ হেঁ। কর্তার নাটকের পাস কিন্তু এখনও পেলাম না।

—ওদের গ্রুপের তো মাঝে মাঝেই শো হচ্ছে। আকাদেমিতে। চলে যান না যেদিন খুশি। আগে একটা রিং করে দেবেন, ও কাউন্টারে বলে রাখবে। মিতিন একটু থেমে গলাটাকে সামান্য আদুরে করল,—দাদা, আমার কাজটার কী হল?

—আরে, সেই জন্যই তো...। আপনি পরশু বিকেলে যখন ছবি আর ফিঙ্গারপ্রিন্টটা পাঠালেন, তখনই আমার নাকটা খুব শুলোচ্ছিল। বাড়ি ফিরেই কাত, কাল আর অফিস যেতে পারলাম না...

—ওমা, সেকী! জ্বর হয়েছে নাকি?

—ঠিক জ্বর নয়, জ্বর জ্বর। মনে হচ্ছে এই এল, কিন্তু টেম্পারেচার উঠছে না।

—তার মানে কাজটা হয়নি। তাই তো?

—ঠিক ধরেছেন, হেঁ হেঁ হেঁ...।

সাধে কি আর লোকে পুলিশকে ছেড়ে প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে ছোটে? মিতিন গলা ঈষৎ ভারী করল,—ইনফরমেশানটা আমার কিন্তু খুব আরজেন্ট ছিল দাদা। কাজের লোকটা এখনও পুলিশ কাস্টডিতে, পাস্ট রেকর্ডটা পেয়ে গেলে ওর সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।

—আরে দূর, বৃথা খাটছেন। ওই কাজের লোকটাই চোর। আপনারা গোয়েন্দারা অনর্থক সোজা ব্যাপার জটিল করেন। আর দুটো দিন কাটুক, স্কুলের গুঁতোয় ব্যাটা সব ব্যাকব্যাক করে বলে দেবে।

তর্কে গেল না মিতিন। কেজো স্বরে বলল,—আজ কি ওগুলো পাব দাদা?

—আজ যদি অফিস যাই, তো আজই পেয়ে যাবেন।

—যদি কেন দাদা?

—মানে যদি সব ঠিকঠাক চলে আর কী। যদি জ্বরটা না আসে, যদি অন্য কোনও ঝঞ্ঝাটে না আটকে যাই...

কথাতে এত 'যদি'। পিতৃদত্ত নাম সার্থক লোকটার। মিতিন টেলিফোন রেখে কয়েক মিনিট ঝুম হয়ে বসে রইল। সব গুলিয়ে দিল লোকটা, কোনও মানে হয়? তাদের পেশাটা এমনই, প্রতি পদে পুলিশের সাহায্য লাগবেই । আবার তাদের ওপর ভরসা করতে গেলেও বছর গড়াতে আঠেরো মাস লেগে যায়।

এ বাড়িতে বাংলা ইংরিজি মিলিয়ে অনেকগুলো খবরের কাগজ আসে। আন্দাজ মতো বিভিন্ন দরকারি খবরের কাটিং রাখতে হয় মিতিনকে। এখন আর একটা বাংলা কাগজ নিয়ে পড়েছে পার্থ, শব্দ হাতড়াতে হুশ হুশ সিগারেট টানছে। বিমলার মাছ কোটা সারা, মশলা বাটছে শিলে। মিতিন রান্নাঘরে এল, কড়া বসাল গ্যাসে। মাছের ঝোলটা নিজেই রাঁধবে। খুন্তি নাড়তে নাড়তে মিতিনের মাথাটা খোলে ভাল।

সবে কড়ায় মাছ ছেড়েছে, দরজায় বেলের ঝংকার। পার্থর নড়ার লক্ষণ নেই, মিতিন ঝামরে উঠল,—দ্যাখো না কে এসেছে!

—জ্বালালে। পার্থ বিরক্ত মুখে উঠে দরজা খুলছে। সামনেই এক সুবেশ ভদ্রলোক। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, গাট্টাগোট্টা চেহারা, নিখুঁত কামানো গালে নীলচে আভা।

পার্থ কায়দা করে তাকাল,—কাকে চাইছেন?

—আমি কি একটু পি মুখার্জির সঙ্গে দেখা করতে পারি?

—আমিই পি মুখার্জি। বলুন।

—না মানে...প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়...

—ও আচ্ছা। আসুন। ...আপনার নামটা জানতে পারি কী?

লোকটা পকেট থেকে কার্ড বার করে বাড়িয়ে দিল। পার্থ কার্ডে চোখ বোলানোর আগে নিজেই বলে উঠল,—আমার নাম অর্চিষ্মান রুদ্র। আমি সল্টলেক থেকে আসছি।

[দুই]

বড় সোফায় আড়ষ্ট ভাবে বসেছে অর্চিষ্মান। আলগা চোখ চালিয়ে দেখে নিচ্ছে চারদিক। আড়চোখে ঘুরন্ত ফ্যানটাকে দেখল একবার। ঘামছে অল্প অল্প. নাকের ডগায় জমেছে স্বেদবিন্দু। একটু বুঝি বা অন্যমনস্ক মুখে রুমাল বের করল পকেট থেকে, মুখ মুছছে।

মিতিনও ঝলক পর্যবেক্ষণ করে নিল লোকটাকে। জুতো ছেড়ে ঘরে ঢোকেনি, অর্থাৎ সহবত বোধ কম। অথবা বিদেশি আবহাওয়ায় মানুষ। শার্টপ্যান্ট জুতো হালকা ডিওডোরেন্টের গন্ধ বলে দিচ্ছে লোকটা বেশ ধনাঢ্য। সোফায় খবরের কাগজ ছড়িয়ে রেখেছে পার্থ, সেদিকে মাঝে মাঝেই অস্বস্তিভরা চোখে তাকাচ্ছে লোকটা। খুব টিপটিপ থাকা পছন্দ করে কি?

কাগজগুলো গুছিয়ে তুলে সেন্টার টেবিলের নীচে চালান করে দিল মিতিন। স্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করল,—আপনি চা কফি কিছু খাবেন মিস্টার রুদ্র?

—নো থ্যাঙ্কস। অর্চিম্মান যেন সামান্য সহজ হল।

পার্থ উল্টো দিকের সোফায় বসেছে। ঝুঁকে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল,—চলবে?

—সরি, আমি স্মোক করি না।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজেই একটা সিগারেট ধরাল পার্থ। বলল,—বেশ, তা হলে আমরা কাজের কথাই শুরু করি।

—হুম। অর্চিম্মান একবার পার্থকে দেখল, একবার মিতিনকে,—কথাটা কিন্তু খুব কনফিডেনশিয়াল।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন মিস্টার রুদ্র। পার্থ লম্বা করে ধোঁয়া ছাড়ল,—আমাদের এখানে শুধু কনফিডেনশিয়াল কথাই হয়।

মিতিন চোখের ইশারায় চুপ করালো পার্থকে। হাসি হাসি মুখেই তাকাল অর্চিম্মানের দিকে,—আপনি কি একান্তে কথা বলতে চান?...ইনি আমার স্বামী, পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়। আমরা একসঙ্গেই কাজ করি।

অন্যমনস্ক মুখে মাথা নাড়ল অর্চিম্মান,—আমি খুব বিপদে পড়ে এসেছি...বিপদটা ঠিক আমার নয়, আমার স্ত্রীর।

—কীরকম?

—কেউ একজন তাকে ভয় দেখাচ্ছে। আই মিন ব্ল্যাকমেল করছে।

—কারণ?

—বিকজ...বিকজ...। অর্চিম্মান আবার রুমালে মুখ মুছল,—বিয়ের আগে শি হ্যাড অ্যান অ্যাফেয়ার। কেউ একজন উড়ো কল করে আমার স্ত্রীকে ভয় দেখাত, টাকা না দিলে সে আমাদের কাছে ওই অ্যাফেয়ারের কথা ফাঁস করে দেবে। ন্যাচারালি, পরিবারে নিজের সুনাম রক্ষার জন্যই হোক, লোকলজ্জার ভয়েই হোক, সে একবার পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছে। কিন্তু এখন সেই লোকটা আরও বেশি টাকা দাবি করছে। দু লাখ। আমার স্ত্রী একদম ভেঙে পড়েছে। যাকে বলে টোটাল নার্ভাস ব্রেকডাউন।

—ট্রেঞ্জ! পার্থ সিগারেট নিবিয়ে সোফার পিঠে হাত ছড়িয়ে দিল,—আপনাকে লুকোনোর জন্যই তো তিনি টাকাটা দিয়েছিলেন, এখন যখন আপনি জেনেই গেছেন, তখন আর ব্ল্যাকমেলিং-এর কোনও মূল্যই নেই। আপনার স্ত্রী তো এখন স্বচ্ছন্দে ইগনোর করতে পারেন।

—আপাতদৃষ্টিতে আপনার কথাই ঠিক। বাট ম্যাটার ইজ মোর সিরিয়াস নাউ। অর্চিম্মান কয়েক সেকেন্ড থেমে বড় করে নিশ্বাস নিল,—ওর মধ্যে এখন একটা মৃত্যু ঢুকে পড়েছে।

—মৃত্যু! মিতিনের গলা দিয়ে শব্দ ছিটকে এল।

—ইয়েস। পরশু হয়তো কাগজে দেখেছেন, রোড অ্যাক্সিডেন্টে সল্টলেকে একজন অ্যাথলিট মারা গেছে?

—দেখেছি তো। পার্থ বলে উঠল,—অর্ক রায়। স্প্রিন্টার। এবার বোধহয় ন্যাশনাল মিটে যাওয়ারও কথা ছিল ছেলেটার।

অর্চিষ্মান মাথা নামাল,—ওই অর্ক রায়ই আমার স্ত্রীর...মানে ওর সঙ্গেই আমার স্ত্রীর অ্যাফেয়ার ছিল।

এতক্ষণে চোখ সরু হয়েছে মিতিনের,—আপনি বলতে চান ওই অর্ক রায়ের মৃত্যুটা নিছক অ্যাক্সিডেন্ট নয়?

—আমি নয়, আমার স্ত্রীর সেরকমই ধারণা। তাকে নাকি ব্ল্যাকমেলারটা শাসিয়েছে আবার। বলেছে, দু লাখ টাকা না দিলে তার দশা নাকি অর্ক রায়ের চেয়েও খারাপ হবে।

—অর্থাৎ প্রকারান্তরে ব্ল্যাকমেলার বলছে সেই অর্ক রায়কে খুন করেছে। তাই তো?

—ঠিক তাই। বিদিশা...আই মিন আমার স্ত্রী তাই বিশ্বাস করে।

—কিন্তু অর্ক রায়কে মেরে ব্ল্যাকমেলারের কী লাভ?

—লাভ আছে। আমার স্ত্রী যখন ব্ল্যাকমেলারকে টাকা দিতে যায়, অর্ক রায় তখন নাকি সঙ্গে ছিল। সম্ভবত সে সময়ে অর্ক রায় দেখে ফেলেছিল লোকটাকে। পরে আবার পথেঘাটে তাকে চিনতে পেরে...। সেই খবরটা দিতেই বিদিশাকে, মানে আমার স্ত্রীকে সে দেখা করতে বলেছিল।

—এবং তার আগেই ছেলেটি মারা যায়?

—না। অ্যাট দ্যাট ভেরি ডে, ঠিক দেখা করার সময়ে, এগজ্যাক্ট দেখা করার জায়গাতেই অর্ক রায় ওয়াজ রান ওভার। পুওর সোল।

একটুক্ষণের জন্য গোটা ঘর নিঝুম। বিমলা সেন্টার টেবিলে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল রেখে গেছে, অর্চিষ্মান বড় চুমুকে তৃষ্ণা মিটিয়ে নিল খানিকটা। নতমস্তকে বসে আছে।

মিতিনই বরফ ভাঙল, আপনি এত সব কথা জানলেন কোত্থেকে?

অর্চিষ্মান মুখ তুলল,—ওই অ্যাক্সিডেন্টের দিন, মানে রোববার, আমি বিজনেসম্যান, রোববারও আমার কাজ থাকে। আমি একটু দেরি করেই ফিরেছিলাম, এই ধরুন সাড়ে নটা নাগাদ। ফিরে দেখি আমার স্ত্রী কেমন জবুথবু মেরে বসে আছে বিছানায়। নড়ছে না চড়ছে না, ডাকলেও সাড়া দিচ্ছে না...। ঘাবড়ে গিয়ে একটু ঝাঁকুনি দিয়েছিলাম স্ত্রীকে, সঙ্গে সঙ্গে আছাড়ি পিছাড়ি কান্না শুরু হয়ে গেল। তার পরই ও আমাকে সব...

—হুঁ। আপনি ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানতেন না?

—প্রশ্নই আসে না। সেদিনই প্রথম...।

—ওই অ্যাফেয়ারের কথাটা কি আপনার জানা ছিল?

—নাহ্।

—চিনতেন অর্ক রায়কে?

—নাহ্।

মিতিন আবার চোখ সরু করল,—আপনি পুলিশের কাছে যাচ্ছেন না কেন?

—ওই যে বললাম, ব্যাপারটা কনফিডেনশিয়াল রাখতে চাই। চাই না ব্যাপারটা পাঁচকান হোক।...আমার বাবা বৃদ্ধ মানুষ, তিনিই বিদিশাকে পছন্দ করে এনেছেন, বউমা বলতে অজ্ঞান। এ সব শুনলেই তিনি ভয়ঙ্কর শক্‌ড্ হবেন। হার্ট অ্যাটাকও হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। বোঝেনই তো, পুলিশ কিছুই গোপন রাখবে না, শোরগোল তুলে এমন একটা কাণ্ড বাধাবে..

—বুঝলাম। মিতিন মাথা দোলাল,—কিন্তু আমার সন্ধান আপনি পেলেন কী করে?

—আমার এল আই সি এজেন্ট আপনার কথা বলছিল।

—কী নাম বলুন তো?

—সবিতাবাবু। সবিতাবরণ বাপুলি।

—ও হ্যাঁ, একটা কেসে ওঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল।...তাঁকে আপনি বলেছেন নাকি সব কিছু?

—না না। জাস্ট কথায় কথায়...আমি একজন পেশাদার গোয়েন্দার সন্ধান করছিলাম, তখনই উনি...। আমাদের পরিচিত একজন পুলিশে আছেন। ডি সি। দীপঙ্কর মুস্তাফি। তিনিও আপনাকে চেনেন দেখলাম...।

—চেনে মানে? পার্থ অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর কথা বলে উঠেছে,—জাপানি কনস্যুলেট থেকে কতগুলো ডকুমেন্ট চুরি হয়ে গিয়েছিল, কেসটা সল্‌ভ করার জন্য দীপঙ্করবাবু মিতিনেরই...। মুস্তাফিসাহেবের প্রেস্টিজ বাঁচিয়ে দিয়েছিল মিতিন।

মিতিন যেন সামান্য লজ্জা পেল। কথা ঘুরিয়ে বলল,—আমি এবার আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি?

—করুন।

—আপনার বাবা তো আছেন শুনলাম। তিনি ছাড়া আর কে কে আছেন বাড়িতে?

—আমার মা আমার খুব ছোটবেলাতেই মারা গেছেন। দিদির অনেক দিন বিয়ে হয়ে গেছে, এখন বাড়িতে আমি, আমার স্ত্রী, আর বাবা।

—আপনাদের কোনও ইস্যু নেই?

—আমাদের বেশি দিন বিয়ে হয়নি। এই মাস আষ্টেক।

—ও। ...আপনার কার্ডে দেখছি অক্‌শনিয়ার লেখা, আপনার নিলামঘরটা কোথায়?

—পার্ক স্ট্রিটে। নাম সম্ভবত শুনেও থাকবেন। ইম্পিরিয়াল এক্সচেঞ্জ। কলিন মিলার নামে এক সাহেবের ছিল অকশন হাউসটা, তিনি ভারত ছেড়ে যাওয়ার আগে বাবাকে নামমাত্র দামে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

পার্থ তড়বড় করে বলে উঠল,—ইম্পিরিয়াল এক্সচেঞ্জ তো আমি চিনি। মনে নেই তোমার, সুব্রতর অ্যানিভার্সারিতে আমরা একটা কার্টলারি সেট প্রেজেন্ট করেছিলাম?...ওটা তো ওই নিলামঘর থেকেই কেনা! বলেই অর্চিষ্মানের দিকে তাকিয়েছে,—আপনিই ইম্পিরায়াল এক্সচেঞ্জের মালিক? তাই আপনার মুখটা খুব চেনা চেনা লাগছিল! আপনার দোকানের গায়েই একটা বার আছে না?

—ইম্পিরিয়াল বার। আমারই।

মিতিন কথোপকথন শুনছিল। ঝপ করে বলল,—আমার আরও কয়েকটা প্রশ্ন আছে মিস্টার রুদ্র।

অর্চিষ্মান ঘুরে তাকাল।

—এক নম্বর, আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন? মানে আপনার চেনাজানা কেউ আছে এমন, যে এই কুকাজ করতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

—কাকে সন্দেহ করব?...নাহ্।

—দু নম্বর, আপনার স্ত্রী কবে প্রথম ব্ল্যাকমেলারের ফোন পেয়েছিলেন?

—নিখুঁত বলতে পারব না। মাস দেড় দুই হবে। দিঘায় আমরা একটা আউটিং-এ গিয়েছিলাম, সেখান থেকেই ফিরেই নাকি...

—এই দেড় দু মাসে আপনার স্ত্রীর মধ্যে কোনও পরিবর্তন দেখেছিলেন?

—আমি খুব বিজি মানুষ প্রজ্ঞাপারমিতাদেবী। দুটো ব্যবসা আমি একা চালাই, রোজই বাড়ি ফিরে এক্সট্রিমলি টায়ার্ড থাকি।

—অর্থাৎ লক্ষ করেননি?

—সেভাবে নজরে পড়েনি। হয়তো কোনওদিন একটু মুখভার থাকত, কি একটু উদাস...। সে তো নানা কারণেই হতে পারে। নয় কি?

—লাস্ট প্রশ্ন। ...আপনি ঠিক কী চান? আমার কাছে কী জন্য এসেছেন?

—আমি সেই ব্ল্যাকমেলারটাকে চাবকাতে চাই। অর্চিষ্মান চাপা স্বরে গর্জে উঠল,—সে আমার মেন্টাল পিস নষ্ট করে দিয়েছে।

—শুধু এটুকুই কারণ?

—আপনি আমার স্ত্রীর অবস্থা দেখেননি! ...সব সময়ে থরথর করে কাঁপছে, বিছানা থেকে উঠতে পারছে না...এরকম চললে যে কোনও দিন সে এমনিই মারা যেতে পারে।

পার্থ পুট করে বলে উঠল,—বউকে ডাক্তার দেখিয়েছেন?

—না...মানে এখনও...। অর্চিষ্মান আমতা আমতা করল,—বললাম না, ব্যাপারটা জানাজানি হতে দিতে চাই না! আমি নিজেই তাকে কনসোল করার চেষ্টা করছি।

—আর ওই টাকাটা দেওয়ার ব্যাপারে কী ভাবছেন?

—কোন টাকা? ওই দু লাখ?...যদি লোকটাকে ধরার কোনও বন্দোবস্ত না হয়, আমার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে আই অ্যাম ফোর্সড্ টু পে। এত বড় শয়তান, সে আমার স্ত্রীকে মেরে ফেলারও ভয় দেখিয়েছে! আমার স্ত্রীর প্রাণ আমার কাছে অবশ্যই আগে।

—কবে দিতে হবে টাকাটা?

—বলেনি এখনও। আজও ফোন আসতে পারে...। অর্চিষ্মান স্পষ্টতই বিচলিত। হঠাৎ ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল,—বদমাইশটাকে আপনি ট্রেস করে দিন প্রজ্ঞাপারমিতাদেবী। বিফোর এনি মোর সিরিয়াস মিসহ্যাপ। আই শ্যাল পে ইউ ফিফটি থাউজেন্ড ফর দ্য জব।

মিতিন তক্ষুনি কিছু উত্তর দিল না।

অর্চিষ্মান আবার বলল,—আপনাকে এখনই কি কিছু অ্যাডভান্স করে যাব? চেকবই আমি সঙ্গে এনেছি।

—না থাক। মিতিন সেন্টারটেবিলে পড়ে থাকা অর্চিষ্মানের কার্ডটা তুলে নিল। কার্ডে চোখ রেখেই বলল,—যদি কেসটা নিই, আমি আপনাকে জানিয়ে দেব।

—আপনি কেসটা নেবেন না? অর্চিষ্মানের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল,—খুব আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলাম। আমি শিওর ছিলাম, মহিলা হয়ে আপনি আর একটি মেয়ের প্রবলেম ঠিক ফিল করতে পারবেন।

—ফিল করছি না, এ কথা কিন্তু এখনও বলিনি মিস্টার রুদ্র। মিতিন আলতো

হাসল,—আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমি আগে একবার কথা বলতে চাই। তার পরে নেব কি নেব না, সেটা ভাবব।

—তাই হবে। অর্চিষ্মান ঘাড় নাড়ল,—কবে দেখা করতে চান বলুন?

—আজ হবে না। কাল...

—কখন যাবেন বলুন? আমি আপনাকে নিতে আসব...

—তার কোনও দরকার নেই। আপনার অ্যাড্রেস তো কার্ডে আছে, আমি চলে যাব। মিতিন সোজাসুজি অর্চিষ্মানে চোখের দিকে তাকাল,—আমি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে চাই, আপনিও সেখানে না থাকলে ভাল হয়। শুধু স্ত্রীকে জানিয়ে দেবেন, আমি অ্যারাউন্ড ইলেভেন তার কাছে যাচ্ছি।...বাই দা বাই, আপনার বাবাও তো ওখানে থাকেন, তাঁর কাছে নিশ্চয়ই আমার পরিচয় দেওয়া চলবে না?

অর্চিষ্মান অসহায় মুখে বলল,—না দিলেই তো ভাল। নয় কি?

—ঠিক আছে।

অর্চিষ্মান উঠে পড়ল। সে চলে যেতেই দরজা বন্ধ করে এসে পার্থ বলল,—তুমি কী গো? কড়কড়ে চেক দিয়ে যাচ্ছিল, ছেড়ে দিলে? ব্যাটা হেভি চালু, ব্ল্যাকমেলারকে দু লাখের বদলে তোমায় দিতে চায় পঞ্চাশ! নিট দেড় লাখ মুনাফা!

মিতিন কথাটা যেন শুনতেই পেল না। চিন্তিত মুখে বলল,—লোকটাকে তোমার কেমন মনে হল বলো তো?

—বড়লোকরা যেমন হয়। টাকার গরম আছে, টনটনে প্রেস্টিজজ্ঞান আছে, চিপ্পুসও আছে। জোর করেই চেকটা দিয়ে যেতে পারত! ...একটা জেন হাঁকিয়ে এসেছিল, যাওয়ার সময়ে দেখলাম।

—সে তো বুঝলাম। কিন্তু লোকটা কেমন? মানে মানুষ হিসেবে কেমন?

—এই তো মুশকিলে ফেললে। পার্থ মাথা চুলকোল,—ভালই তো মনে হয়। বউকে ভালবাসে, ফ্যামিলির সুনাম নিয়ে চিন্তা করে...

—সত্যিই কি ভালবাসে?...বউকে একটা ব্ল্যাকমেলার ভয় দেখাচ্ছিল, বউ প্রেমিকের সঙ্গে গিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকাও নাকি দিয়ে এসেছে...! তুমি খেয়াল করেছ, লোকটা প্রেমিক শব্দটা একবারও উচ্চারণ করছিল না, বার বার বলছিল অ্যাফেয়ার ..! বউয়ের অ্যাফেয়ার নিয়ে কোনও কমেন্টও করল না! জেলাসি? না বউয়ের প্রতি উদাসীন? বউটা ব্ল্যাকমেলারের ফোন পেয়ে নিশ্চয়ই আনন্দে নাচছিল না? মাত্র আট মাস বিয়ে হয়েছে, অলমোস্ট নিউলি ম্যারেড, বউ যে ডিসটার্বড্ রয়েছে, সে কিছুই আঁচ করতে পারেনি?

—হতে পারে বউটা খুব ঘুঘু মাল। ভাল অ্যাক্টিং জানে।

—তার মানে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা খুব গভীর নয়।

—হুম।...তুমি তা হলে কি কেসটা নেবে না?

—ভাবছি। এরকম ব্ল্যাকমেলিংয়ের কেস তো আগে করিনি। সঙ্গে আবার একটা খুন মতনও আছে। বলেই পার্থকে ঠেলতে শুরু করেছে মিতিন,—ওঠো ওঠো, বিমলার রান্না হয়ে গেছে, চান খাওয়া করে বেরিয়ে পড়ো।

—আজ আর প্রেসে যাব না। ধর্মতলার দিকে দুটো পেমেন্ট কালেকশান আছে,

অফিস দুটোতে ঢুঁ মেরে তোমার কাজে নেমে পড়ব।

—প্রেসেই যাবে না? তোমার কর্মচারীরা ফাঁকি মারবে না?

—আমি থাকলেই ওদের কাজের ডিসটার্ব হয়। হে হে করে হাসল পার্থ। ভুরু নাচিয়ে বলল,—তোমার ডিউটিতে যাচ্ছি, টিএ কিএ দেবে তো?

—ফিরে এসো, দেব।

—রাত্তিরে?

—কাজলামি হচ্চে?

কথা বলতে বলতেই রিসিভার কানে তুলেছে মিতিন। ডায়াল করছে টক টক।

ও প্রান্তে নারীকণ্ঠ। মিতিন জিজ্ঞাসা করল, —সবিতাবাবু বাড়ি আছেন?

—না তো। কিছু দরকার ছিল?

—আমি প্রজ্ঞাপারমিতা বলছি। উনি এলেই আমাকে একটা ফোন করতে বলবেন। আরজেন্ট।

ফোন রেখে দিয়ে কাগজ কলম নিয়ে বসল মিতিন। প্রশ্ন সাজাচ্ছে। বিদিশাকে ঘিরে।

[তিন]

প্রেসের দরজায় এসে থমকে গেল মিতিন। সামনে কী বিরল দৃশ্য! গভীর মনোযোগে কাজ করছে পার্থ। ঘুপচি ঘরখানার টেবিলে হুমড়ি খেয়ে, জোরালো বাতি জ্বালিয়ে! প্রুফ দেখছে মনে হয়। মাত্র তিন হাত দূরে মিতিন, এতই নিমগ্ন পার্থ যে মিতিনকে খেয়ালই করছে না!

মিতিন দু চোখ ভরে পার্থকে দেখল একটুক্ষণ। পার্থর এই ডুবে থাকা রূপটা তার ভারী প্রিয়। হয়তো ক্ষণস্থায়ী বলেই।

একটু পরে গলা ঝাড়ল মিতিন। বারেক তাকিয়েই পার্থ আবার মাথা নামাচ্ছিল, হঠাৎ যেন সম্বিতে ফিরেছে,—আরে প্রজ্ঞাদেবী যে! অসময়ে দেবী কেন দীনের দপ্তরে?

—অ্যাই, নো যাত্রা। মিতিন হেসে চেয়ার টেনে বসল,—আর প্রজ্ঞা প্রজ্ঞা আবার কী? কত দিন না বলেছি, ওই ডাকটা শুনতে আমার একটুও ভাল লাগে না।

—কী বলব তবে? পারু পারো?

—ছিঃ, তুমি কি দেবদাস নাকি?

—উহুঁ দেবীদাস। কলম টেবিলে ফেলে কাগজের তাড়া সরাল পার্থ। আড়মোড়া ভাঙল,—তারপর বলো, দেখা হল সেই বিদিশাদেবীর সঙ্গে?

—হল।

—কথাবার্তা?

—হয়েছে।

—কী বুঝলে?

—বলছি। আগে এক গ্লাস জল খাওয়াও তো। মিতিন আঁচল তুলে মুখ মুছল। কাঁধের ঝোলা ব্যাগখানা রাখল টেবিলে,—উফ, যা গরম আজ! সল্টলেক থেকে আসতেই ভাজা

ভাজা হয়ে গেলাম। কে বলবে আশ্বিন মাস!

পাশের বড় ঘরে ঘটাং ঘট মেশিন চলছে। পার্থর হাঁক শুনে ছুটে এল রঘু। বছর তিরিশ বয়স, কম্পোজি..র।

পার্থ চোখ টেরচা করে তাকাল,—কী রে অ্যাঁ, চাকরি বাকরি করার ইচ্ছে আছে, না কী?

রঘু মিচকে হাসল,—বউদিকে দেখেই আমি কালো চায়ের অর্ডার দিয়ে এসেছি।

—গুড। তোর বোনাস কে আটকায়! আদত জায়গায় লাইন করা শিখে গেছিস।...যা, এক গ্লাস জল নিয়ে আয়।

পলকে হুকুম তামিল করেছে রঘু। ছেলেটাকে একটা হাসি উপহার দিয়ে মিতিন ঢকঢক জল শেষ করল। আবার আঁচলে মুখ মুছছে। ধীরেসুস্থে।

পার্থ অসহিষ্ণু ভাবে বলল,—এবার বলো, কেমন দেখলে বিদিশাদেবীকে?

—রিয়েল রূপসী। দু আঙুলে মুদ্রা করল মিতিন,—যাকে বলে ডানাকাটা পরী।

—অ্যাহ্, মিস হয়ে গেল!

—আফসোস হচ্ছে? সঙ্গে গেলে পারতে।

—নিয়ে গেলে কই! আহা, কত দিন সুন্দরী মেয়ে দেখিনি!

—উঁ? মিতিন কড়া গলায় বলল,—আমি বুঝি সুন্দরী নই?

—তুমি সুন্দর কোত্থেকে হবে? তুমি তো বউ।

—দাঁড়াও, তোমার আজ হবে।

বলতে বলতে চট করে বাড়িতে একটা ফোন সেরে নিল মিতিন। নাহ্, বুমবুম ঠিকই আছে, ঘুমোচ্ছে। ছেলে ঘুম থেকে উঠলে তাকে জোর করে লেবুর রস খাওয়ানোর নির্দেশ দিল বিমলাকে, বিকেলবেলাতেও ছেলেকে চোখে চোখে রাখতে বলল। রিসিভার রেখে খুলল ঝোলা ব্যাগ, অর্চিষ্মানের কার্ড বের করে রাখল সামনে। আবার ডায়াল করছে।

—হ্যালো, মিস্টার রুদ্র আছেন?

—স্পিকিং।

—শুনুন, আমি প্রজ্ঞাপারমিতা বলছি। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার..

—জানি। বিদিশা আমায় একটু আগে ফোন করেছিল।

—আমি কেসটা নিচ্ছি।

—সো কাউন্ড অফ ইউ। আমি জানতাম আপনি বিদিশাকে দেখলে আর না করতে পারবেন না।

—শুনুন, আপনার সঙ্গে আমার আরও কিছু কথা আছে। অ্যাক্রস দা ফোন হবে না, আমি আপনাকে মিট করতে চাই।

—বেশ তো।...যদি বলেন, সন্ধেবেলা আপনার বাড়ি চলে আসতে পারি।

—তার দরকার নেই। আমি আপনার শোরুমে যাব।

—মোস্ট ওয়েলকাম। কটায়?

—এই ধরুন, অ্যারাউন্ড পাঁচটা। একটু লেটও হতে পারে।

—নো প্রবলেম। আমি আটটা অব্দি আছি।

পার্থ জুলজুল চোখে মিতিনের ফোনালাপ শুনছিল। মিতিন রিসিভার রাখতেই কৌতূহলী মুখে বলল,—কেসটা তা হলে নিয়েই নিলে?

—ইন্টারেস্টিং খুব, বুঝলে। অনেকগুলো গিঁট আছে...

—কীরকম?

—বলছি।...আগে কিছু খাওয়াও তো। পেট জ্বলে যাচ্ছে।

—কী আনাব?

—এখানে নয়, বাইরে চলো। অনেকদিন তুমি আমায় রেস্টুরেন্টে খাওয়াওনি।

—আমারই ঘাড় ভাঙবে? এটা তো তোমার কোম্পানি এক্সপেন্সে হওয়া উচিত।

মিতিন চোখ পাকাল। সংসারখরচের জন্য দুজনেই তারা মোটামুটি সমান টাকা দেয়, তার বাইরে হাতখরচ যার যার তার তার। যেহেতু ইদানীং মিতিনের রোজগার বেশি, পার্থ সহজে হাত উল্টোতে চায় না, এই নিয়ে স্বামীস্ত্রীতে খুনসুটিও চলে জোর।

আজ মিতিনের কুপিত দৃষ্টি দেখে সঙ্গে সঙ্গেই শ্বেতপতাকা তুলে দিল পার্থ। চা এসে গেছে, দু চুমুকে ভাঁড় শেষ, উঠে পড়েছে স্বামীস্ত্রী। প্রেসে এখন কাজ আছে বিস্তর, ছোট ছোট দুটো পত্রিকার পুজোসংখ্যা ছাপা চলছে, খান তিনেক স্যুভেনিরও। মেশিনম্যান কম্পোজিটারদের সঙ্গে টুকিটাকি দু চারটে দরকারি কথা সারল পার্থ, তারপরই মিতিনকে নিয়ে বড় রাস্তায়। পুজো এখন হপ্তা তিনেক দূর, শারদীয়া কেনাকেটা শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে, ভিড় ঠেলে দুজনে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল। অর্ডারও দিয়েছে চটপট। রুটি মাংস। খিদের মুখে কোনও শৌখিন খানা মিতিনের পছন্দ নয়।

ঘোর দুপুরেও রেস্তোরাঁ জমজমাট। ঠক ঠক দুটো জলের গ্লাস টেবিলে বসিয়ে দিয়ে গেল বেয়ারা। পার্থ পথেই সিগারেট ধরিয়েছিল, অ্যাশট্রে টেনে নেরাল সিগারেট।

জলে একটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে বলল,—লোকটার কাছে পাঁচটায় যাবে বললে কেন?

—এখান থেকে একবার লালবাজার যাব। তারপর...মিতিন সামান্য দূরমনস্ক,—মেয়েটা যেন কেমন কেমন, বুঝলে...! শকটা ওর জেনুইনই মনে হল। কিন্তু কী যেন একটা গোপন করছে!

—মাঝখান থেকে বোলো না, গোড়া থেকে শুরু করো। পৌঁছলে কখন?

—সওয়া এগারোটা। সল্টলেকে বাড়ি খুঁজে পাওয়া...!

—বাড়িটা কেমন? খুব পয়সাওলা, না?

—সে তো বটেই। একতলার ড্রয়িংরুমখানা দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। যা অ্যান্টিকের কালেকশান!

—নিলামঘরখানা দেখলে আরও চোখ ধাঁধাবে। ভেতরে পুরো একটা ক্রিকেট প্র্যাকটিস করার জায়গা আছে। এখনকার বাজারে ওই দোকানের ভ্যালুয়েশান কোটি টাকার কম হবে না।

—বাপ রুদ্রর সঙ্গে আলাপ হল?

—হয়েছে। কোথায় যেন বেরোচ্ছিলেন ভদ্রলোক...

—খানদানি রইস, না?

—নিশ্চয়ই তাই। তবে দেখে বোঝা যায় না। কথাবার্তায় খুব অ্যাফেকশান আছে।

—তুমি তাকে কী পরিচয় দিলে?

—সে বেশ মজা হয়েছে। চাকরটা তো প্রথমেই আমায় হাঁকিয়ে দিচ্ছিল, বউদির শরীর খারাপ, দেখা হবে না...! ভদ্রলোক ঠিক তখনই সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। আমি টিপ করে একটা প্রণাম করে বললাম, আমি বিদিশার বন্ধু মেসোমশাই, বিদিশার বিয়ের দিন আপনাকে দেখেছিলাম...। ব্যস, ওমনি চাকরটাকে কী দাবড়ানি! তোর এত বড় সাহস, বউদিমণির বন্ধুকে ফেরত পাঠাচ্ছিস...! উনিই আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। সরবত মিষ্টিও দিয়ে যেতে বললেন ঘরে।

—মহিলা তোমায় দেখে চমকায়নি?

—মহিলা কী গো! মেয়ে। বাচ্চা মেয়ে। হার্ডলি চব্বিশ পঁচিশ। আমার থেকে অন্তত সাত আট বছরের ছোট। বরের সঙ্গে বেশ ভালই বয়সের তফাত আছে।...তবে সে মেয়ে চমকানোর পাত্রী নয় । বর তো বলে রেখেছিলই, তিনিও অভিনয়ে দিব্যি পটু। শ্বশুরমশায়ের সামনে এমন ভাব করল যেন আমি সাত জন্মের সখী!

—শ্বশুরমশায়ের সন্দেহ হয়নি? তোমার মতো একটা দামড়া মেয়েকে সখী বলে মেনে নিল?

—পুরুষরা মেয়েদের বয়স বোঝে না। মিতিন খিলখিল হাসল,—আর আমিও এমন কিছু বুড়ি নই।

কথাটা অস্বীকার করার অবশ্য উপায় নেই পার্থর। এক ছেলের মা হয়েও মিতিনের শরীর বেতসলতার মতো ছিপছিপে। এক কণা মেদ নেই কোথাও। নিয়মিত ভোরবেলা যোগাভ্যাস করে মিতিন। কলেজে পড়ার সময়ে ভাল মতো ক্যারাটে শিখেছিল, যদিও ব্ল্যাকবেল্ট পাওয়া অবধি এগোনো হয়নি। এখন পাড়ার ক্লাবে সপ্তাহে দু দিন বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ক্যারাটে শেখায় মিতিন। চর্চাটাও থাকে, ব্যায়ামও হয়। মুখে একটা কিশোরীর লাবণ্য আছে মিতিনের, এই উত্তরতিরিশেও।

রুটি মাংস এসে গেছে। ক্ষুধার্ত মিতিনের আগে পার্থর হাতই চলতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে কথাও চলছে। বউকে একটু তোষামোদ করে নিয়ে আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনছে বিদিশা উপাখ্যান।

খেতে খেতেই মিতিন বলল,—মোদ্দা কথা যা বুঝলাম, মেয়েটা একেবারেই সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ির। বাপ সওদাগরি অফিসের হরিপদ কেরানি, দাদাটা কাঠবেকার, শুধু মাত্র রূপের জোরে বড়লোকের বাড়ির বউ হয়েছে। অর্ক বলে ছেলেটার সঙ্গে এক সময়ে চুটিয়ে প্রেম করত। হয়তো এমনও হতে পারে ব্ল্যাকমেলারটা অর্কই, সেই এইভাবে ঘটনাকে সাজিয়েছিল! যুক্তিটার সপক্ষে একটা বড় পয়েন্টও আছে। বিয়ের পর দিঘাতেই প্রথম অর্কর সঙ্গে দেখা হয় বিদিশার, এবং তার পরেই ফোনটা আসে। হয়তো গাড়ির তলায় শুয়ে থাকা লোকটাও অর্করই লোক!

—তা হলে অর্ক মরল কেন?

—হতে পারে অর্কর সঙ্গীটি খুব খতরনাক ছিল। হয়তো টাকা ঠিক পায়নি তাই..

—মেরেই দেবে?

—অর্ককে মেরেই দেওয়া হয়েছে কিনা এ ব্যাপারেও আমি শিওর নই। ওটা একটা মিয়ার অ্যাক্সিডেন্টও হতে পারে। মিতিন ন্যাপকিনে মুখ মুছল,—তবে অর্কর ফেবারে একটা পয়েন্ট আছে। অর্ক তো বিদিশার গয়নাই পেয়ে গিয়েছিল, সেটা নিয়েই কেটে পড়ল না কেন? তা না করে গয়না বেচে বিদিশাকে টাকা এনে দিতে গেল কেন? গয়না নিয়ে পালিয়ে গেলে বিদিশা কিল খেয়ে কিল হজম করত, কাউকেই কিছু বলতে পারত না...। অর্থাৎ অর্কই যদি ব্ল্যাকমেলার হয়, তার এত ঘুরপথে যাওয়ার কী প্রয়োজন ছিল?

—এটা প্রেমিকদের সাইকোলজি, তুমি বুঝবে না। পার্থ বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল,—মে বি, অর্ক হয়তো চেয়েছিল বিদিশার চোখে মহান হয়ে থাকতে। প্লাস, সোনার ডিম পাড়া হাঁসটা হাতে রইল! মাঝে মাঝে গলা টিপে ধরলেই কঁক করে একটা ডিম পেড়ে দেবে। তুমি যে বললে বিদিশার সামনে অর্ক সব চিঠি পুড়িয়ে দিয়েছিল, ওটাও হয়তো একটা ফলস্ শো! চিঠিগুলোর ফটোকপি সে রেখে দিতেই পারে।

—হুম। মিতিন তবু যেন সামান্য চিন্তিত।

—আর ভাবতে হবে না যাও। ওই অর্কটাই কালপ্রিট।...কেস সল্‌ভ করে দিলাম, কোল্ড ড্রিঙ্কসের অর্ডার দাও, আর রেস্টুরেন্টের বিলটাও পে করে দেবে।

—নিশ্চয়ই মিটিয়ে দেব। মিতিন সোজা হয়ে বসল. আগে বলো, বিদিশা এখন যে দু লাখ টাকাটা দেবে, কাকে দেবে?

—ধুস, সব গুলিয়ে দিলে। সত্যিই তো, অর্ক যখন আউটই হয়ে গেছে, তখন দ্বিতীয় বার টাকাটা চাইল কে? পার্থ সিগারেট ধরাল,—আচ্ছা, অর্কর সেই শাগরেদটা হতে পারে না?

—পারে। কিন্তু তাকে বিদিশা অর্চিষ্মান এখন পাত্তা দেবে কেন? অর্কর ব্ল্যাকমেলিং-এর হাতিয়ারগুলো ধরে নিলাম এখন তারই জিম্মায় আছে, কিন্তু তাতেই বা বিদিশাদের কী এল গেল? অর্চিষ্মানের কাছে তো এখন সব কিছুই ওপেন

—বা রে, কারণটা কাল অর্চিষ্মানই তো বলল! মৃত্যুর ভয়ে বউকে সে বাঁচাতে চায়। শয়তানটাকেও খুঁজে বার করে চাবকাতে চায়!

—আমারও ব্যাপারটা কাল এরকমই জলবৎ তরলং মনে হয়েছিল। কিন্তু...। মিতিন আপন মনে দুদিকে মাথা দোলাচ্ছে,—আমি অন্য দু একটা পয়েন্টও পেয়েছি। সেগুলোও ক্লিয়ার হওয়া দরকার।

—কী পয়েন্ট?

—বলব। মিতিন হাত উল্টে ঘড়ি দেখল,—এখন আর সময় নেই। তোমার কি আজ রিহার্সাল আছে?

—কেন?

—না থাকলে প্রেস থেকে সোজা বাড়ি ফিরে যাবে। [illegible] আছে। আর হ্যাঁ, চারটে নাগাদ একবার ফোন কোরো তো বাড়িতে। বিমলা বোধহয় ড্রাইভারটার সঙ্গে প্রেম করছে, বুমবুমকে আটকে রেখে বেরিয়েও যেতে পারে।

পার্থ হেসে ফেলল,—রিয়েলি, গিন্নিমা যদি টিকটিকি হয়, সে বাড়ির কাজের লোকদের জীবন দুর্বিসহ! বেচারা।

মিতিনও হাসল ফিক করে,—থাক, আর কাজের লোকের দুঃখে দুঃখী হতে হবে না। বিল মিটিয়ে বেরোও এখান থেকে।

রাস্তায় এসে একটা ট্রাম ধরে নিল মিতিন। সূর্য পশ্চিমে হেলেছে কিছুটা, তবে এখনও তার তেজ প্রখর। আকাশে উদাসী মেঘের কোনও চিহ্নই নেই। হাওয়া বইছে, প্রায় না বওয়ারই মতো। শম্বুক গতিতে চলছে ট্রাম, থামছে ঘন ঘন। মিতিন ঘামছিল।

লালবাজারে পৌঁছে মিতিন হতাশ। অনিশ্চয় তালুকদার রুমে নেই। লোকটা তাকে ভোগাচ্ছে, এখনও ছবি আর ফিঙ্গারপ্রিন্টের রিপোর্ট দিল না। আজ মিতিন ছাড়ছে না, দেখা করেই যাবে।

অপেক্ষা করতে করতে মিতিন ব্যাগ খুলে পকেটবুকটা বার করল। অর্কর ঠিকানা টুকে নিয়েছে, ছেলেটার মাসির সঙ্গে দেখা করতে হবে। নিজেই যাবে। অর্কর মৃত্যুর জায়গাটাও একবার দেখে আসা দরকার। সুভাষকেই না হয়...। টুকরো টুকরো চিন্তা আসছে মাথায়। বিদিশাদের বাড়ি- বিদিশা, তার শ্বশুরমশাই, কাজের লোকজন...। একের পর এক মুখ ভেসে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে, নতুন নতুন ছবি আসছে চোখে। চাকরটার কী যেন অদ্ভুত নাম? পদ্মনাভ...না না না, পদ্মমণি। কাজের লোকদেরও এমন কায়দার নাম হয়...

চারটে নাগাদ অনিশ্চয় তালুকদারের দর্শন মিলল। মিটিং সারছিলেন। কাজ শেষ পর্যন্ত হল বটে, তবে সময়ও গেল অনেক। অনর্গল কথা বলে অনিশ্চয়, বেশির ভাগই নিজের কথা এবং বাহ্যস্ফোট। প্রথম একটুক্ষণ মজা লাগে, তারপর বিরক্তি এসে যায়। লালবাজার থেকে মিতিন যখন বেরোল, তখন ছটা কুড়ি।

আশ্বিনের সন্ধ্যা বেশ ঘন হয়ে গেছে। অর্চিষ্মানের কাছে আর যাবে কি যাবে না ভাবতে ভাবতে পার্ক স্ট্রিটে নেমেই পড়ল মিতিন। সান্ধ্য পার্ক স্ট্রিট যথারীতি আলোয় আলোয় ঝলমল, গাড়িতে মানুষে শব্দময়।

ইম্পিরিয়াল এক্সচেঞ্জের সামনে এসে মিতিন দেখল কোলাপ্‌সিবল গেট প্রায় পুরোটাই টানা, ভেতরে আলো প্রায় নেইই। চলে গেছে অর্চিষ্মান?

গেট ধরে উঁকি দিচ্ছে মিতিন, এক দারোয়ান এগিয়ে এল, —আপনি কি সাহেবের কাছে এসেছেন?

—হ্যাঁ।

—সাহেব পাশেই বারে গেছেন। সসম্মানে দরজা খুলে দিল দিল লোকটা,—আপনি বসুন একটু, ডাকছি সাহেবকে।

ভেতরে পা রেখে গা ছমছম করে উঠল মিতিনের। প্রকাণ্ড নিলামঘরে মাত্র দুটো কি তিনটে বাতি জ্বলছে। কোথাও ফার্নিচার, কোথাও বা মূর্তি, কোথাও অসংখ্য কাচের সরঞ্জাম, ঝাড়বাতি। আবছায়ায় সব কেমন আধিভৌতিক লাগে! প্রাচীন আর নবীনের কী অলৌকিক সমন্বয় চারদিকে!

আচ্ছন্নের মতো হাঁটছিল মিতিন। জায়গাটা ভারী রহস্যময় তো!

[চার]

বিশাল নিলামঘরের একেবারে শেষপ্রান্তে অর্চিষ্মানের অফিস। কাচঘেরা জায়গাটি আয়তনে নেহাত ছোট নয়, আসবাবপত্রও আছে বেশ। মাঝারি সাইজের একখানা সেক্রেটারিয়েট টেবিল, হালকা গদিআঁটা ঘুরনচেয়ার, খান তিনেক হাতলঅলা কাঠের কুর্সি, দুটি স্টিল আলমারি, দেওয়ালে গাঁথা প্রাচীন সিন্দুক, টাইপিস্টের বসার ছোট্ট খোপ, চেস্ট অফ ড্রয়ার—সবই মোটামুটি ছিমছাম সাজানো। নিলামঘরের বাকি কর্মচারীদের বসার স্থান অন্যত্র, মালিকের কাচঘেরা ঘরের বাইরে।

এসি অন করে ঘুরনচেয়ারে বসেছে অর্চিষ্মান। দারোয়ানকে ডেকে দুটো কফির অর্ডার দিল। মৃদু হেসে মিতিনকে জিজ্ঞাসা করল, —আপনার জন্য কি কিছু স্ন্যাকস আনাতে পারি ম্যাডাম?

—নো, থ্যাঙ্কস। উল্টো দিকের চেয়ারে গুছিয়ে বসল মিতিন। অফিসঘরে নিয়নের চড়া আলো। বাইরে নিলামখানার ছায়া ছায়া অন্ধকার এখান থেকে গাঢ়তর লাগে। মিতিনের চোখ ওই আবছায়াতে ঘুরে গেল। খানিকটা স্বগতোক্তির ঢঙে বলে উঠল, —জায়গাটার বেশ একটা ক্যারেক্টার আছে। ঢুকলেই প্রাচীন কলকাতার গন্ধ পাওয়া যায়।

—পুরনো আমলের জিনিসপত্রও তো কম নেই এখানে। বাইরে একখানা প্লাস্টার অফ প্যারিসের মূর্তি আছে, প্রায় সওয়া শো বছরের পুরনো। কুইন ভিক্টোরিয়ার। বিক্রির জন্য এসেছিল, ভাল দাম ওঠেনি বলে আমরাই রেখে দিয়েছি।

—হুঁ, দেখলাম।...আপনাদের দোকানটার বয়স কত হল?

—একদম শুরু থেকে ধরলে সত্তর বছর। আমার বাবাই তো কিনেছেন প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেল।

—কী রকম দামে কিনেছিলেন?

—প্রায় জলের দরে। মাত্র আশি হাজার।

—সেও তো খুব কম নয়। আপনাদের কি পূর্বপুরুষের টাকা ছিল?

—ছিল মোটামুটি। একটু বুঝি ইতস্তত করল অর্চিষ্মান, তারপর বলল,—খুলেই বলি। আমার ঠাকুরদার ছিল মানিলেন্ডিং বিজনেস। হুন্ডিতে টাকা খাটাতেন, গয়নাপত্র বাঁধা রেখেও ধারকর্জ দিতেন। যুদ্ধের, আই মিন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের আগে, ব্যবসাটা বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। খুব বেশিদিন বাঁচেননি তিনি, বাবার যখন একুশ বছর বয়স তখন হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে...। বাবা ওই বিজনেস আর চালাতে পারেননি। প্রথমত অল্প বয়স দেখে অনেকে বাবাকে টাকা ফাঁকি দিয়েছিল, তা ছাড়া লোকের গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করতেও বাবা খুব দড় ছিলেন না। ওই ব্যবসাটা ছেড়ে দেবেন দেবেন করছেন, তখনই এই নিলামঘরটার অফার এল। সাহেবকে বেশ কয়েক বার বিপদে আপদে টাকা ধার দিয়েছিলেন ঠাকুরদা, কিছুটা সেই কৃতজ্ঞতাতেই বাবাকে সস্তায়...।

—আপনি ক বছর হল চালাচ্ছেন?

—দোকানে আসছি অনেক দিন। সেই বি.কম. পাশ করার পর থেকেই। বাবাকে বিশ্রাম দিয়েছি বছর আড়াই।

—হঠাৎ বাবাকে বিশ্রাম দিলেন কেন? তাঁকে তো এখনও যথেষ্ট ফিট দেখলাম!

অর্চিষ্মান হেসে ফেলল,—এসব প্রশ্নের সঙ্গে কি আপনার কেসের কোনও সম্পর্ক আছে ম্যাডাম?

—হয়তো নেই। তবু যাদের কেস করছি তাদের ফ্যামিলি-হিস্ট্রি একটু জানব না?

—ও. কে। অর্চিষ্মান কাঁধ ঝাঁকাল,—বাবাকে শুধু বয়সের জন্য বসিয়ে দিয়েছি, এটা পুরোপুরি ট্রু নয়। একটা সময় গেছে যখন বাবা এই ব্যবসাটাকে চড়চড় করে তুলেছিলেন। সাহেবরা দেশ থেকে চলে যাচ্ছে, দিশি সাহেবরা হুড়মুড়িয়ে তাদের মাল কিনছে...। তারপর সিচুয়েশান ক্রমশ বদলে গেল। আমি যখন থেকে আসছি, এই ধরুন তেরো চোদ্দ বছর, তখন আর ব্যবসার সেই রমরমা অবস্থা নেই। তারপর কাজকর্ম করতে গিয়ে দেখছিলাম হিসেবপত্রে প্রচুর ডিসক্রিপেন্সি আছে, পুরনো লোকজনেরা চুরি করে করে ফাঁক করে দিচ্ছে, বাবা কাউকে তেমন ভাবে বকাঝকাও করতে পারেন না...দেখে দেখে প্রায় জোর করেই একদিন এই ডিসিশনটা নিয়ে নিলাম। নিলামঘরেরই একটা পোরশান আলাদা করে ওই বার কাম রেস্তোঁরাটা খুললাম। বাবা মাথার ওপর থাকলে হয়তো এটাও সম্ভব হত না।

—আর আপনাদের বাড়িটার বয়স কত?

—ছাব্বিশ বছর।

—তার আগে কোথায় থাকতেন আপনারা?

—দর্জিপাড়া।

—নিজেদেরই বাড়ি ছিল নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ, মোটামুটি বড় বাড়িই ছিল। মা মারা যাওয়ার পরেই ও বাড়ি থেকে বাবার মন উঠে গিয়েছিল। সল্টলেকে সস্তায় জমি কিনেছিলেন। বছর পাঁচেক পর পছন্দসই বাড়ি করে ওখানেই...

—মা কবে মারা গেছেন?

—আমি তখন বছর চারেকের। কলেরা বা ফুডপয়জনিং মতো কিছু হয়েছিল। এক রাতেই ডিহাইড্রেশান হয়ে...। মার কথা আমার খুব পরিষ্কার মনে নেই।

কফি এসে গেছে। ধূমায়িত কাপে চুমুক দিল মিতিন। কথার ফাঁকে ফাঁকে জরিপ করছে অর্চিষ্মানকে। কাল লোকটার মধ্যে বেশ নার্ভাস ভাব ছিল, আজ কথাবার্তায় কোনও জড়তা নেই। বরং একটু বেশিই সপ্রতিভ। যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ও আছে বলে মনে হয়। হেলান দিয়ে বসেছে চেয়ারে, মাঝে মাঝে ডাইনে বাঁয়ে ঘোরাচ্ছে আসনটাকে।

হঠাৎই উল্টো প্রশ্ন ছুঁড়ল অর্চিষ্মান,—আপনি আসল কথা তো কিছু ডিসকাস করছেন না ম্যাডাম? বিদিশার সঙ্গে কথা বলে কী আইডিয়া হল?

মিতিন টেবিলে কাপ নামাল। অর্চিষ্মানের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল,—আপনি কিন্তু দুটো ইনফরমেশান আমায় দেননি মিস্টার রুদ্র!

—আমি! কী ইনফরমেশান?

—দুটো চুরির ইন্সিডেন্ট। একটা আপনার দোকানের, আর একটা আপনার স্ত্রীর গয়নার বাক্স...

মুহূর্তের জন্য থমকে গেল অর্চিম্মান। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল,—হ্যাঁ, গয়নার বাক্সের কথা আমার বলা উচিত ছিল। একদমই মনে ছিল না। কিন্তু ওই চুরির সঙ্গে ব্ল্যাকমেলিংয়ের কী সম্পর্ক? ওটা তো সিম্পলি একটা কেপমারি!

—আছে, সম্পর্কে আছে। আপনি আগে বলুন, আপনার এই দোকানের চুরিটা কবে হয়েছিল?

অর্চিম্মান খাড়া হয়ে বসল, —ওটার সঙ্গেও ব্ল্যাকমেলিংয়ের কো-রিলেশান খুঁজছেন? স্ট্রেঞ্জ!

—কিছুই খুঁজছি না মিস্টার রুদ্র, জাস্ট জানতে চাইছি।

—আমরা দিঘা বেড়িয়ে আসার পরে এগজ্যাক্ট ডেটটা...দাঁড়ান, এক সেকেন্ড। অর্চিম্মান উঠে আলমারি খুলে একটা ফাইল বার করল। দ্রুত কাগজ ওল্টাচ্ছে। থামল,—ডেটটা হল টেনথ অগাস্ট। ইট ওয়াজ আ ফ্রাইডে।

—আপনার স্ত্রীকে ব্ল্যাকমেলার প্রথম কবে ফোন করেছিল জানেন?

—কবে?

—ইলেভেনথ অগাস্ট।

—ইজ ইট? পলকের জন্য অর্চিম্মান আলমারি বন্ধ করতে ভুলে গেল। পায়ে পায়ে এসে বসেছে ঘুরনচেয়ারে। চোখ পিটপিট করল একটু। ঠোঁট কামড়ে বলল,—তাতেই বা কী এল গেল? ওটা তো একটা সিম্পল কো-ইন্সিডেন্সও হতে পারে।

—হওয়াই সম্ভব। তবু একটু নেড়েচড়ে দেখতে দোষ কি! মিতিন আলগা হাসল,—আপনার দোকানের চুরিটাও তো খুব নরমাল ছিল না। কী, ঠিক বলছি?

—হ্যাঁ, বেশ পিকিউলিয়ার ঘটনা ঘটেছিল! কিছুই খোয়া যায়নি, অথচ এক কাঁড়ি আলমারি ভাঙল...! সিন্দুকটাকেও ড্যামেজ করে দিয়েছিল। তবে টাকাপয়সা তেমন...। বলতে বলতে দুম করে যেন সামান্য সতর্ক হয়ে গেল অর্চিম্মান। গলা ঝেড়ে বলল,—হাজার বিশেক মতো গেছে তাও। অথচ চোর কিন্তু অবলীলায় লাখ টাকার মাল সরিয়ে ফেলতে পারত।

—পুলিশ তো কিছুই করে উঠতে পারেনি, না?

—আমি এক্সপেক্টও করিনি। তবে সেদিনের দারোয়ানগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছি। একজন মাত্র পুরনো আছে, বাকি সব এখন প্রফেশনাল সিকিউরিটি।

—ভালই করেছেন। ...বাই দা বাই, কোন আলমারিগুলো চোর ভেঙেছিল?

—এই তো, এই স্টিলের দুটো। আর বাথরুমের ধারে একটা পড়ে আছে লঝ্ঝর...। ওটা যে কেন ভাঙল! বহুকালের রিজেক্টেড মাল..

মন দিয়ে কথাগুলো শুনল মিতিন, কোনও মন্তব্য করল না। অর্চিম্মানকে একটু ঝাঁকুনি দেওয়ার জন্য পুরনো প্রসঙ্গে ফিরল,—আপনার স্ত্রীর সেই গয়নার বাক্সে কী ছিল জানেন?

—জানি। ইমিটেশান কীসব।

—একটা জেনুইন জিনিসও ছিল। অর্কর চিঠি।

প্রতিক্রিয়াটা বেশ জোরই হল। হাঁ হয়ে আছে অর্চিম্মানের মুখ। কয়েক সেকেন্ডের

মধ্যেই বিস্ফোরিত হল,—এ কথা তো আমায় বলেনি বিদিশা! আশ্চর্য, কেন বলেনি?

—সম্ভবত ভুলে গেছে।

—এত বড় ভুল! আপনাকে বলার সময়ে মনে পড়ল, আর আমাকে... ! নো, দিস ইজ আনপার্ডনেবল্।

শেষ শব্দটা ভয়ঙ্কর কঠিন ভাবে উচ্চারণ করল অর্চিষ্মান, যেন কোনও দণ্ড ঘোষণা করল।

মিতিন তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—আপনি কেন এত উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন মিস্টার রুদ্র? আপনি একজন মহান মানুষ, উদার স্বামী, স্ত্রীর এত কিছু জেনেও তাকে মেনে নিতে পারছেন, আর সামান্য একটা ভুল...! এমনিতেই মিসেস রুদ্র মরমে মরে আছেন, আপনার কাছে তাঁর অপরাধের সীমা নেই..

অর্চিষ্মান কিছুক্ষণ গুম। কী যেন ভাবছে।

মিতিন সামনের পেপারওয়েটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল,—শুনুন মিস্টার রুদ্র, এখন আমাদের সামনে একটাই কাজ। ব্ল্যাকমেলারটাকে পাকড়াও করা। এ সময়ে আপনি ইমোশনাল হলে কিন্তু কাজে খুব অসুবিধে হবে।

অর্চিষ্মানের মুখ তবু থমথমে। কিছু একটা বলতে গিয়েও যেন থেমে গেল। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল,—না না, আমি ঠিক আছি। আপনার যদি আর কিছু প্রশ্ন থাকে, করে ফেলুন।

মিতিন মনে মনে হাসল। মুখে যাই বলুক, লোকটা এখনও স্ত্রীর দেওয়া জ্বালাতে ভেতরে ভেতরে জ্বলছে। যে কোনও পুরুষের পক্ষে এটাই তো স্বাভাবিক।

সামান্য গলা ঝেড়ে বলল,—ওই বাক্স চুরির ডিটেলটা কি আপনার মনে আছে?

—আছে। অন্তত যেটুকু আমায় বলা হয়েছে সেদিন।

—আপনার ড্রাইভারই তো মার্কেটে ঢুকে আপনার স্ত্রীকে ডেকেছিল, তাই না?

—হ্যাঁ, সেরকমই শুনেছি।

—আপনার ড্রাইভারটি কি বিশ্বস্ত?

—তাই তো জানতাম। অনেক সময়ে আমার অনেক টাকা নিয়ে ও যাতায়াত করে, কখনও এক পয়সা এদিক ওদিক করেনি।

—আপনি এটা বিশ্বাস করেন যে ব্ল্যাকমেলার সেদিন আপনার ড্রাইভারকে ধোঁকা দিয়েছিল?

—এতদিন তো তাই ভেবেছি। এখন আপনি যখন বলছেন, তখন নতুন করে ভাবতে হবে।

—ঝোঁকের মাথায় কিছু করবেন না মিস্টার রুদ্র। আমিই আপনার ড্রাইভারকে বাজিয়ে দেখব।...এবার আপনাকে কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি?

—কীরকম?

—কিছু মনে করবেন না, আপনি একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেছেন। কারণটা জানতে পারি?

—তেমন স্পেসিফিক কোনও কারণ নেই। বিজনেসে এমন ডিপ্‌লি ইনভল্‌ভড্

ছিলাম, বিয়ের চিন্তা মাথায় আসেনি।

—এখনই বা এল কেন?

—বলতে পারেন কিছুটা বাবার জোরাজুরিতে। আমিও ভেবে দেখলাম বাবাও রিটায়ার্ড লাইফ লিড় করছেন, সারাদিন বাড়িতে একা, সেকেন্ড একজন কেউ এলে বাবার ভাল লাগবে।

—শুধু এই কারণেই বাবার পছন্দ করা পাত্রীকে আদৌ না দেখে আপনি বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়লেন?

—বাবার পছন্দে আমার আস্থা ছিল।

—স্ত্রীর কথা বাদ দিন, শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে আপনি স্যাটিসফায়েড?

এবার অর্চিষ্মানকে বেশ দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল,—এ প্রশ্নের উত্তর কি খুব জরুরি?

—প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, আমার কিন্তু জানা দরকার।

এক মুহূর্ত সময় নিয়ে অর্চিষ্মান বলল,—শ্বশুরবাড়িতে আমি খুব কমই যাই। প্রথমত, সময় পাই না। দ্বিতীয়ত, ও বাড়ির অ্যাটমসফিয়ার আমার ভাল লাগে না।

—কেন? তারা আপনাদের থেকে অনেক গরিব বলে?

এতক্ষণে অল্প হাসল অর্চিষ্মান,—দেখুন ম্যাডাম, দারিদ্র্যকে তারাই ঘৃণা করে যারা সদ্য গরিব থেকে বড়লোক হয়েছে, অথবা একেবারেই বড়লোকদের এয়ারটাইট কম্পার্টমেন্টে বাস করে। আমি এর কোনওটাই নই। আমি সাধারণ স্কুলকলেজে পড়েছি, সাধারণ ঘরের প্রচুর বন্ধুবান্ধব আমার ছিল। ইনফ্যাক্ট কেউ কেউ এখনও আছে।

—তা হলে?

—বিদিশাদের বাড়ি একটু ডিফারেন্ট। শ্বশুরমশাই বড্ড বড়বড় কথা বলেন। কবে কোথায় তাঁদের জমিদারি ছিল প্রজারা তাঁদের দেখে কী ভাবে সেলাম করত...। অথচ আমি জানি, মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে তিনি কাবলিঅলার কাছ থেকে টাকা ধার করেছেন। যার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। আমার বাবা তাঁদের এক বস্ত্রে মেয়ে দিতে বলেছিলেন।

—আপনি এত সব কথা জানলেন কোত্থেকে? বিদিশা বলেছেন?

—এই প্রশ্নটা কিন্তু ছেলেমানুষের মতো হয়ে গেল ম্যাডাম। বিদিশা ছাড়াও তো কত ভাবে আমি জানতে পারি। আমার কলেজেরই এক বন্ধু শ্বশুরমশায়ের অফিসে চাকরি করে, আসে মাঝে মাঝে এখানে। আমি অবশ্য কথাটা আমার বাবা বা স্ত্রী কাউকেই কোনওদিন বলিনি।

—ও। তার মানে শ্বশুরকে অপছন্দ করাই আপনার শ্বশুরবাড়ি না যাওয়ার কারণ?

—শুধু তিনি নন, আমার শ্যালকটিও সুবিধের নয়। কুসংসর্গে পড়েছে, নেশাভাঙ করে, কাজকর্ম কিস্যু করে না, মুখের ভাষাও ভাল নয়, মানীর সম্মান রেখে কথা বলতে জানে না।...শাশুড়ি ঠাকরুণ নির্বিরোধী, কিন্তু গেলেই এত বেশি বাবা বাছা করেন, আমার খুব অস্বস্তি হয়।

—বুঝলাম।...এবার একটু আপনার বাড়ির সম্পর্কে প্রশ্ন করি। আপনার দিদি

জামাইবাবুর সঙ্গে আপনার রিলেশন কী রকম?

—ওদের কথাও বিদিশার কাছ থেকে শোনা হয়ে গেছে? অর্চিষ্মান আবার হাসল,—ঠিকই আছে সম্পর্ক। ওরাও আসে, আমরাও যাই।

—জামাইবাবুর তো ব্যবসা আছে শুনলাম, কীসের বিজনেস?

—ঢালাইঘর। হাওড়ায়। তবে জানেনই তো, বর্তমানে ঢালাইঘরগুলোর অবস্থা খুব কাহিল। পুষ্পদা, আই মিন আমার জামাইবাবু, ইদানীং অন্য বিজনেসের কথাও চিন্তা করছেন।

—ও। শেষ প্রশ্ন।...আপনার বাড়ির কাজের লোকগুলো কেমন? বেশ বিশ্বাসী?

অর্চিষ্মান উত্তর দিতে গিয়েও চুপ করে গেল। সিকিউরিটি গার্ডরা এসে গেছে, তাদের দুজন কাচের ওপার থেকে সেলাম ঠুকছে। অর্চিষ্মান হাত তুলল সামান্য, চলে গেল লোকগুলো, পিছনের কোলাপসিবল গেটের দিকে।

আবার কথায় ফিরল অর্চিষ্মান,—কাজের লোক তো আমাদের তিন জন। পদ্মপাণি, সুমতি, মানদা। পদ্মপাণি পুরনো লোক। চোদ্দ পনেরো বছর বয়সে এসেছিল আমাদের বাড়িতে, সেই দর্জিপাড়ায় থাকার সময়ে, তখন থেকেই আছে। বলতে পারেন, এখন মোটামুটি ঘরেরই লোক মানদা সুমতি খুব পুরনো নয়। সুমতি আছে বছর দুয়েক, মানদা আর একটু বেশি। বাড়িতেই থাকে দুজনে, এখনও তাদের অবিশ্বাস করার মতো কোনও কারণ খুঁজে পাইনি। মালী একজন আছে, পার্ট টাইম। সপ্তাহে দু তিন দিন আসে।...আর কিছু জানার আছে আপনার?

মিতিন হেসে ফেলল,—আজকের মতো এই যথেষ্ট।

—এবার আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

—বলুন।

—আপনি কি এদের মধ্যে কাউকে সন্দেহ করছেন ম্যাডাম? মানে এতক্ষণ যাদের কথা জিজ্ঞেস করলেন?

—না না, সেরকম কিছু নয়। এসব হল রুটিন প্রশ্ন। কাজ শুরু করার আগে জেনে নিতে হয়। মিতিন উঠে দাঁড়াল,—আজ তা হলে চলি।

—এক মিনিট বসুন। অ্যাডভান্সের চেকটা দিয়ে দিই।

—এখন থাক, আমি একঝরেই নেব।

—চলুন, তা হলে অন্তত আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—থ্যাঙ্কস, এখন আমার একা যেতেই ভালই লাগবে। মিতিন দরজায় গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল,—আর একটা কথা। আপনি যে আমায় অ্যাপয়েন্ট করেছেন, সেটা আপনি আর আপনার স্ত্রী ছাড়া তৃতীয় কেউ যেন না জানেন। অন্তত এক্ষুনি।

অর্চিষ্মান মাথা নাড়ল,—অবশ্যই। আমি তো আগেই বলেছি পাঁচ কান করতে চাই না।

পথে নেমে একটা ট্যাক্সি ধরে নিল মিতিন। দিনভর প্রখর উত্তাপের পর কোমল বাতাস বইছে এখন। ক্লান্ত চোখ জড়িয়ে আসছিল মিতিনের। সারাদিন ধরে আহরণ করা টুকরো টুকরো তথ্যগুলো গাঁথছে মনে মনে, ঝাড়াই বাছাই করছে। একটা কথা পরিষ্কার, ব্ল্যাকমেলার বিদিশার পরিচিত কেউ। অর্ক ছাড়াও আর কে কে হতে পারে?

বিদিশাই বা কী গোপন করল মিতিনের কাছে? মিতিন যা আন্দাজ করছে সেটাই কি ঠিক?

মিতিনের চোয়াল শক্ত হল। অঙ্কটা মেলাতে হবে।

[পাঁচ]

নাটকের শো না থাকলে শনিবারের দুপুরটা পার্থর অবিমিশ্র সুখের সময়। শুধু ওই দিনটাই সকাল সকাল হেভি ব্রেকফাস্ট সেরে কাজে বেরিয়ে যায় পার্থ, দেড়টার মধ্যে প্রেসের ঝাঁপ বন্ধ করে সটান বাড়ি, এবং ভরপেট খেয়ে নিপাট ভাতঘুম। অন্তত পাঁচটা পর্যন্ত। তারপর উঠে, চোখ কচলে, হাই তুলে, ঝোলা ব্যাগটি নিয়ে আড্ডা দিতে চলল নাটকপাড়ায়। পুজোর আগে প্রেসে এখন যথেষ্ট কাজের চাপ, কিন্তু তার জন্য রুটিনে ব্যত্যয় ঘটে না পার্থর। দেড়টায় ছাপাখানা বন্ধ করবে, তো দেড়টাতেই করবে। ওভারটাইম-নীতিতে পার্থ বিশ্বাসী নয়।

আজ সেই নিয়মেই গড়ানোর তোড়জোড় করছিল পার্থ, মিতিন বাধ সাধল,—অ্যাই, এখন নো ঘুম। চলো, আমার সঙ্গে একটু বেরোতে হবে।

—জ্বালালে। এই রোদ্দুরে কোথায় যাবে? পুজোর বাজার?

—আজ্ঞে না স্যার, তোমার প্রতীক্ষায় বসে থাকলে আমার মার্কেটিং হয় না। আমি টুকটাক সেরে ফেলছি।...অন্য কাজ আছে।

—যেমন?

—একটা নাটকে অ্যাক্টিং করতে হবে।

নিদ্রিত বুমবুমের পাশে শরীর ছেড়ে দিয়েছিল পার্থ, রহস্যের গন্ধ পেয়ে উঠে বসল,—কী রোল?

—রিহার্সালের সময় জানতে পারবে। চটপট রেডি হয়ে নাও।...আর হ্যাঁ, তোমার ক্যামেরায় ফিল্ম ভরা আছে না? ওটাও নিয়ে নিও।

পার্থর তন্দ্রা উবে গেল। পাঁচ মিনিটে জিনস টিশার্ট গলিয়ে তৈরি। মিতিন পরেছে চন্দন রঙের হ্যান্ডপ্রিন্ট সালোয়ার কামিজ, সঙ্গে একই রঙের ওড়না, চোখে সানগ্লাস। বুমবুমকে বিমলার জিম্মায় দিয়ে সাড়ে তিনটে নাগাদ বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে পার্থকে সব ভাল করে বুঝিয়ে দিল মিতিন। চাপা উত্তেজনায় ছটফট করছে পার্থ। এরকম অভিযানে মিতিনের সঙ্গী হতে সে ভালইবাসে।

ভবানীপুর পৌঁছে গলিটা খুঁজে বার করতে সময় লাগল একটু। চায়ের দোকানের গা ঘেঁষে এক সরু রাস্তা। যত্রতত্র খানাখন্দ। নম্বর ধরে এগিয়ে এক জায়গায় থামল দুজনে। সামনে এক জীর্ণ বাড়ি, ইটখসা ঘা ঘা দেওয়াল। সদর দরজা আধখোলা, দেখে মনে হয় ভেতরে লুকোছাপা কিছু নেই।

কড়া নাড়তেই বেরিয়ে এসেছে এক যুবক। অলস গলায় বলল,—কাকে খুঁজছেন?

মিতিন পলকে জরিপ করে নিল ছেলেটাকে। পরনে হাঁটুঝুল জিনস, খালি গা, উড়ু উড়ু চুল। ঢুলুঢুলু চোখ। ঘুমোচ্ছিল, না নেশা করেছে? একটু বেঁটে বটে, তবে দেখতে

মন্দ নয়। টকটকে ফর্সা রং, মুখে বেশ একটা ফিল্‌মস্টার ফিলম্‌স্টার ভাব আছে।

এই তবে বিদিশার দাদা চিত্রভানু!

মিতিন হাত জোড় করে নমস্কার করল,—বিদিশা কী আছে?

—বিদিশা? এখানে? চিত্রভানু একবার মিতিনকে দেখল, একবার পার্থকে।

মিতিন মুখে কৃত্রিম বিস্ময় ফোটাল,—এটা কি সতেরোর দুই মহিম হালদার লেন নয়? বিদিশা দত্ত থাকে না এখানে?

—সবই ঠিক আছে, তবে সে পাখি উড়ে গেছে।

—বুঝলাম না।

চিত্রভানু চোখ টেরচা করল,—কদ্দিন বিদিশার সঙ্গে দেখা হয়নি?

সত্যি ভারী অমার্জিত বাচনভঙ্গি। মিতিন বলল,—তা প্রায় দেড় বছর।

—তাই বলুন। বিদিশার বিয়ে হয়ে গেছে।...আপনারা আসছেন কোত্থেকে?

উত্তর দেওয়ার আগেই অন্দর থেকে মহিলাকণ্ঠ,—কে রে ভানু? কে এসেছে?

মিতিন-পার্থকে আর একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে চিত্রভানু গলা চড়াল,—এই যে দ্যাখো না কারা সব বুলুকে খুঁজছে।

ভারতী দরজায় এলেন। গায়ের রংটি ফ্যাটফেটে ফর্সা, মুখচোখ ফোলা ফোলা, অ্যানিমিক ধরনের।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই সানগ্লাস খুলে টুপ করে একটা প্রণাম করল মিতিন,—আমার নাম চন্দ্রিমা হালদার মাসিমা, বিদিশার সঙ্গে পড়তাম। স্কুলে। এ আমার স্বামী, সুপ্রকাশ হালদার। আমরা বিদিশার কাছে একটা জরুরি কাজে এসেছিলাম।

পার্থ মাথা নোওয়াল সামান্য, ভারিক্কি ভঙ্গিতে।

ভারতীর চোখ পার্থকেও ছুঁয়ে গেল,—কিন্তু বিদিশার তো গেল মাঘে বিয়ে হয়ে গেছে। তুমি জানতে না?

—না মাসিমা। মাঝে আমরা বম্বে চলে গিয়েছিলাম তো।...কোথায় বিয়ে হল বিদিশার?

—সল্টলেকে। শ্বশুরবাড়ি খুব বড়লোক। হঠাৎ যোগাযোগ হয়ে গেল...। ভারতীর মুখে এক গাল হাসি।

—ঠিকানাটা একটু দেবেন?

—ঠিকানা? বি সি না সি বি কী যেন...! ভারতী ছেলের দিকে তাকালেন,—নম্বরটা কত যেন রে?

চিত্রভানু উদাস হয়ে গেল,—দরকারটা বলে যান, খবর দিয়ে দেব।

—বলছি। মিতিন ওড়নায় মুখ মুছল,—এক গ্লাস জল হবে মাসিমা?

—এমা ছি ছি, তোমরা বাইরে কেন? এসো, ভেতরে এসো।

চরম অবিন্যস্ত ঘর। রঙজ্বলা চাদরটা টেনেটুনে বসার জায়গা করে দিলেন ভারতী ভেতরে গেলেন জল আনতে। চিত্রভানু পাহারাদারের মতো দাঁড়িয়ে আছে, কী যেন খোঁজার ভান করছে কাচভাঙা শোকেসে। কী অসভ্য ছেলে রে বাবা, গায়ে একটা জামা গলিয়েও এল না!

চাপা অথচ চিত্রভানু যেন শুনতে পায় এমন স্বরে পার্থ বলল,—এই চলো, শ্বশুরবাড়ির ঠিকানাটা নিয়ে কেটে পড়ি।

প্রত্যাশা মতোই চিত্রভানুর ঘাড় ঘুরেছে,—প্রয়োজনটা কি আমাদের বলার অসুবিধে আছে?

ছদ্ম অস্বস্তিতে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল পার্থ আর মিতিন।

ভারতী দুজনের জন্যই জল এনেছেন। সঙ্কুচিত মুখে বললেন,—শুধু জল দিলাম কিন্তু।

—তাতে কী আছে। মিতিন দ্রুত জলটা শেষ করে ফেলল। দম নিয়ে বসল গুছিয়ে,—হ্যাঁ, যে জন্য আসা...। আমার স্বামী বেশ কয়েকটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তুলেছে। এখন টিভি সিরিয়াল স্টার্ট করছে একটা। আশা নিরাশা। হিরোইনের জন্য ও একটা নতুন মুখ খুঁজছিল। ফ্রেশ, সুন্দরী...

পার্থ গলায় ওজন আনল,—হ্যাঁ, আমি ফ্রেশ কেসই লনচ করতে চাই। আমরা বিদিশার কথা ভাবছিলাম।

চিত্রভানু ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল,—বিদিশা কি আপনাদের বলেছিল সিরিয়ালে নামতে চায়?

—অনেক দিন আগে একবার বলেছিল। মানে সেই বছর দেড়েক আগে দেখা হয়েছিল যখন। আমার স্বামী ফিল্ম করে শুনে আগ্রহ দেখিয়েছিল খুব। তখন তো উপায় ছিল না, ও তখন চিংড়ি চাষের ওপর একটা ডুকমেন্টারি করছিল...। এখন যখন চান্স এসেছে...

—কিন্তু বুলু কি আর এখন ওসব করতে পারবে? ভারতীর কপালে ভাঁজ,— দাঁড়াও ওর বাবাকে ডেকে আনি।

—মেসোমশাই আছেন?

—আজ তো হাফ ডে, শনিবার। এই মাত্র অফিস থেকে ফিরে শুয়েছেন...

চিত্রভানু আড়ে আড়ে পার্থর কাঁধের ব্যাগটাকে দেখছিল। ভারতী চলে যেতেই বাঁকা স্বরে বলে উঠল,—আপনাদের কেসটা কী বলুন তো? আমি তো জানি সিরিয়ালে নামার জন্য মেয়েরা ডিরেক্টর প্রোডিউসারদের পায়ে পায়ে ঘোরে, আর আপনারা নায়িকা খুঁজতে বেরিয়েছেন?

পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল,—আমি সব খুঁজছি। নায়ক ভিলেন সাইডহিরো...। সব নতুন মুখ ইনট্রোডিউস করব।

—বাজেট কম বুঝি?

—বাহ্, এই লাইন সম্পর্কে তো বেশ জানেন! এক্সপিরিয়েন্স আছে কিছু?

—কেন? থাকলে রোলটোল দেবেন নাকি?

—করবেন? আপনার চেহারাটা বেশ একটু ডিফারেন্ট টাইপ। রোমান্টিক না, রাগেডও না...

ওষুধ ধরে গেল। চিত্রভানুর স্বর তলতল করছে,—অভিনয় একেবারেই করিনি তা নয়। বলতে গেলে অভিনয় আমাদের ব্লাডেই আছে। আমার বাবা একজন গ্রেট অ্যাক্টর,

আমিও স্কুল কলেজে মাঝে মধ্যে...

—ব্যস ব্যস, তা হলেই চলবে। বাকিটা তো আমার হাতে...। গায়ে একটা ইয়ে গলিয়ে আসবেন, একটা ছবি নিই?

মুহূর্তে অন্তর্হিত হল চিত্রভানু।

পার্থ আলগা ঠেলল মিতিনকে,—কেমন দিলাম?

মিতিন নিচু গলায় বলল,—একটু রয়ে সয়ে। কথা কম বলো, নইলে সন্দেহ করবে। সত্যি সত্যি তো আর ডিরেক্টররা বাড়ি গিয়ে গিয়ে ছবি তুলে বেড়ায় না!

—আরে ছাড়ো, কমন পাবলিক ওসব থোড়াই জানে।

চিত্রভানু ফেরার আগে প্রভাকর ঘরে এলেন। লুঙ্গির ওপর এক্ষুনি হাফপাঞ্জাবি চড়িয়েছেন বোঝা যায়, হাত দিয়ে পাঞ্জাবিটাকে টানছেন ঘন ঘন। চেয়ারে বসে স্মিত মুখে বললেন,—তোমাদের মাসিমার কাছে শুনলাম সব।...কিন্তু একটা সমস্যা আছে যে বাবা। বুলুর শ্বশুরবাড়ি খুব বনেদি ফ্যামিলি, বাড়ির বউকে তারা অ্যাক্টিং করতে দেবে বলে মনে হয় না।

সুদখোর মহাজনের বংশধররাও বনেদি! মিতিন চোয়াল ফাঁক করল,—বিদিশার কিন্তু খুব ইচ্ছে ছিল মেসোমশাই!

—বুঝলাম। কিন্তু আমরা পাঠিয়েছি শুনলে জামাই রাগ করবে।

—বিদিশার বর বুঝি খুব রাগী?

—রাগী ঠিক নয়, মেজাজি। রইস বাড়ির রইস ছেলে তো...

ভারতী দরজা থেকে বলে উঠলেন,—ওসব থাক না মা। বিয়ে থা হয়ে গেছে, তোমার বন্ধু নয় এখন শুধু ঘরকন্নাই করুক।

প্রভাকর তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—আমি অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে অভিনয় খুবই ভালবাসি...

—সে তো বোধহয় আপনি করেনও। আপনার ছেলে বলছিল...

—পুরনো নেশা। আমি ছেড়ে দিতে চাই, গ্রুপ আমায় ছাড়ে না। বলে প্রভাকর দত্ত না থাকলে দর্শকদের ধরে রাখবে কে?

—আপনি কোন গ্রুপে আছেন? পার্থ নড়ে বসল।

—নিষাদ। চেতলার। নাম শুনেছ নিশ্চয়ই? এই তো আমাদের নেক্সড মানডে শো আছে। মুক্তাঙ্গনে। পারলে চলে এস।

চিত্রভানুর পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। ভালই ড্রেস করে ফেলেছে এর মধ্যে। লালসাদা হাফশার্ট, চুলে টেরি, শর্টস ছেড়ে ট্রাউজারস। পার্থ পটাপট কয়েকটা ছবি তুলে ফেলল। চিত্রভানুর তুলতে গিয়ে প্রভাকর ভারতীরও। তিন জনই আহ্লাদে আটখানা, চা পর্যন্ত এসে গেল। প্রভাকর ভারতী বিদিশার বিয়ে শ্বশুরবাড়ির গল্প করলেন বিস্তর, কিন্তু মেয়ের ঠিকানা দেওয়ার ব্যাপারটা কায়দা করে এড়িয়ে গেলেন।

পার্থই কথা বলছে বেশি, মিতিন লক্ষ করছিল তিনজনকে। চোখে পড়ল একটু বুঝি বা ছটফট করছে চিত্রভানু। কিছু যেন বলতে চায়। মিতিনরা উঠতেই এসেছে পিছন পিছন।

মোড়ে পৌঁছে বলল,—আপনাদের মাইরি ঘিলু শর্ট আছে। বুঝছেন বাবা-মা ঠিকানা দেবে না, তবু বসে বসে গেঁজিয়ে যাচ্ছেন!

মিতিন মৃদু হাসল,—বারে, মেয়ের শ্বশুরবাড়ি পছন্দ অপছন্দের কথাটা তাঁরা ভাববেন না?

—শ্বশুরবাড়ি নয়, বর। অর্চিষ্মানটা বহুৎ খোচো টাইপ আছে। টিভিতে নামার বাই চেপেছে শুনলে ওই বুলুকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে।

—বিদিশার বরের সঙ্গে আপনার বনিবনা নেই মনে হচ্ছে? মিতিন খোঁচাল সামান্য,—আপনাকে বুঝি পাত্তা দেয় না?

—কে চায় ওর পাত্তা। সঙ্গে সঙ্গে আগুনে ঘি পড়ল,—ব্যাটা টাকার কুমীর হয়ে বসে আছে বলে মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না, সব সময়ে সন্দেহে মটমট করছে...! পার্থ সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল, অবলীলায় তার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল চিত্রভানু। আগুন জ্বালিয়ে হুশ হুশ ধোঁয়া ছাড়ল,—জানেন কী রকম লোক? এই বছর দুই আগে...বিনা কারণে এক গণ্ডা লোককে দোকান থেকে ছাঁটাই করে দিল। বেচারারা এখন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরকম ছ্যাঁচড়া পার্টির সঙ্গে চিত্রভানু দত্ত সঙ্গত করে না।

—এত খবর জানলেন কোত্থেকে? বিদিশা গল্প করে বুঝি?

—পাগল! সে করবে পতিনিন্দা? সে তো এখন সতী নারীর ওয়ান। চিত্রভানুর ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি,—এসব খবর বাতাসে ওড়ে. চিত্রভানু ধরে নেয়। যাক গে থাক, আমার কথাটা কী ভাবলেন? দিচ্ছেন রোল? আরে ভাই, স্কোপ দিলে বুঝবেন চিত্রভানু দত্ত কিছু ফ্যালনা নয়।

—ছি ছি, আপনি ফ্যালনা হবেন কেন? পার্থ হাত রাখল চিত্রভানুর কাঁধে,—দেখেই বোঝা যায় আপনার মধ্যে কোয়ালিটি আছে। সত্যি বলতে কি, আপনার বোনের থেকে আপনি অনেক কম শাই। নেহাত ওর একটা আলাদা গ্ল্যামার আছে বলেই...

—ওই দেখিয়েই তো তরে গেল। চিত্রভানুর স্বরে ঝাঁজ,—তবে হ্যাঁ, রিয়েল লা· অ্যাক্টিংটা ও ভালই করে। বোনের কাদা আর ঘাঁটতে চাই না, আমায় একটু মনে রাখবেন তাহলেই হল।

চিত্রভানুকে কাটিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে পার্থ বলল,—ওক, দাদাটা একটা জিনিস বটে। পগেয়া মাল। আমি জন্মে কখনও কোনও দাদাকে বোন ভগ্নিপতির এমন কুচ্ছো গাইতে শুনিনি।

মিতিন সিটে হেলান দিল,—কিন্তু ছেলেটা খুব চালাক নয়। মনের ভাব গোপন করার ক্ষমতাও কম। বেসিকালি এটা ওস্তাদ ক্রিমিনালের লক্ষণ নয়।

—তার মানে সন্দেহের লিস্ট থেকে ছেলেটা বাদ?

—পুরোপুরি বাদ নয়। বিদিশা যে বাড়ি থেকে গয়নার বাক্সটা নিয়ে যাচ্ছিল, এটা যদি বাড়ির কেউ ব্ল্যাকমেলারকে জানিয়ে থাকে, তবে সে চিত্রভানুই। কারণ মা টা একেবারেই সাদামাঠা, মনে তেমন প্যাঁচপোঁচ নেই। বাপটাও মেয়ের শ্বশুরবাড়ি নিয়ে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগে। দুজনের কেউই মেয়েকে ইনসিকিওর দেখতে চায় না।

—মাকে দেখে তো মনে হল, বাক্সে মেয়ের প্রেমপত্র ছিল জানলে তক্ষুণিই পুড়িয়ে দিতেন।

—হুম! মিতিন মাথা নাড়ল,—তবে বাবাটাকে আর একটু কালচার করা দরকার। তুমি ভদ্রলোকের নাটকের গ্রুপটাকে চেনো?

—নামটা শোনা। ছোট গ্রুপ। বছরে একটা দুটো শো করে আর কি।...দুটো দিন সময় দাও, প্রভাকর দত্তের ঠিকুজিকুষ্ঠি আমি হাজির করে দেব। পার্থ আবার একটা সিগারেট ধরাল,—কিন্তু ভাইটার বোন ভগ্নিপতির ওপর এত রাগ কেন বলো তো?

—তলিয়ে দেখতে হবে আরও। সাইকোলজিটা স্টাডি করতে হবে।

—সে তুমি যা ইচ্ছে করো, একটা ব্যাপারে আমি কিন্তু ডেফিনিট। অর্ককে বাক্সের খবরটা ওই সাপ্লাই করেছিল। অত যার হিংসে...

—হয়তো দিয়েছিল। তবে অর্ককে নয়।

—কী করে শিওর হচ্ছ?

—কারণ কাল সন্ধেবেলা আমি অর্কদের বাড়ি গেছিলাম। ওর মাসির সঙ্গে দেখা করেছি।

—তাই? বলোনি তো?

—কাল তো তুমি রিহার্সাল থেকে ফিরলেই রাত এগারোটায়।...যাক গে শোনো, আমি গেছিলাম সাংবাদিক সেজে। বললাম, অর্ক রায় খুব প্রমিসিং অ্যাথলিট ছিল, ওকে নিয়ে নিয়ে একটা স্টোরি করব...। খুব ভেঙে পড়েছেন মহিলা, খালি কান্নাকাটি করছিলেন...। তবে হ্যাঁ, বললেন বিদিশা সত্যি সত্যি দু দিন অর্কর বাড়ি গেছিল। প্রথম যেদিন গিয়েছিল, তার পরের দিনটা ছিল রবিবার। সেদিন সকাল থেকে সন্ধে ঘরেই শুয়ে ছিল অর্ক, মাসিই তার সাক্ষী। এবং সেই দিনই গয়নার বাক্সটা চুরি হয়।

—ও নো। অর্ক তা হলে নির্দোষ?

—সেই সম্ভাবনাই বেশি।

—আচ্ছা, তুমি বিদিশার কথা ওখানে তুললে কী করে?

—একটু ঘুরপথে যেতে হল। জিজ্ঞেস করলাম, অর্কর অ্যাথলিট বন্ধুরা বলছে একটা মেয়ের সঙ্গে নাকি অর্কর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকেই অর্ক নাকি অ্যাথলেটিক্সে কিছুটা পিছিয়ে পড়ে...? ব্যস, শুনেই বিদিশার বাপবাপান্ত শুরু করলেন মহিলা। তখনই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে...

একটুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। বিকেল শেষ হয়ে এসেছে, খোকা খোকা যানজটের মধ্যে দিয়ে শ্লথগতিতে এগোচ্ছে ট্যাক্সি। সাদার্ন অ্যাভিনিউতে পড়তেই গাড়ির গতি বেড়ে গেল। কনে দেখা আলো মেখে অপরূপ হয়ে উঠেছে দু পারের গাছপালা। সুন্দর হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে, লেকের দিক থেকে। বাষ্প মাখা বাতাস।

মিতিন লেকের দিকে তাকিয়েছিল। আত্মগত ভাবে বলে উঠল,—চিত্রভানুই যে কাউকে খবর দিয়েছিল এমন কথাও কিন্তু জোর দিয়ে বলা যায় না। হয়তো ব্ল্যাকমেলারটা সত্যিই বিদিশাকে ফলো করছিল সেদিন। বাক্সটা পেয়ে যাওয়া চান্স অকারেন্স। আবার রবি যে সত্যি বলছে, তারই বা প্রমাণ কী?

পার্থ আলগা ভাবে বলল,—কী বিড়বিড় করছ?

—কিছু না। মিতিন হাসল,—ভাবছি সুতোটা কোন্ দিক দিয়ে টানব...

ঠাকুরিয়া এসে গেল। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মেটাচ্ছিল মিতিন, সহসা চোখ আটকাল সামনে দাঁড়ানো গাড়িটাতে। স্টিলব্লু মারুতি। আর্চিয়ানদের বাড়ির গাড়ি না?

[ছয়]

বাড়িতে পা রেখে আরও চমকে গেল মিতিন। স্বয়ং বিদিশা এসেছে। ছোট্ট সোফায় একটু গুটিসুটি মেরে বসে আছে। সাজগোজ মোটামুটি পরিপাটি বটে, কিন্তু মুখ একেবারে কাগজের মতো সাদা।

মিতিনকে দেখে বিদিশা প্রায় ডুকরে উঠল। স্থানকালপাত্র ভুলে আহত পক্ষিণীর মতো ডানা ঝাপটে উড়ে এল কাছে। মিতিনের হাত আঁকড়ে ধরে বলল,—আমায় বাঁচান দিদি, আমার আর রক্ষা নেই...

থরথর কাঁপছে মেয়েটা। মিতিন তাকে ধরে আবার বসিয়ে দিল,—আহ্, শান্ত হও। বলো, কী হয়েছে?

—আবার সেই ফোনটা এসেছিল।

—কবে? কখন?

—খানিক আগে। না না, দুপুরে। দুটো আড়াইটের সময়। সেই কখন থেকে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি...

নাটুকে দৃশ্যের দর্শকদের ওপর ঝলক চোখ বুলিয়ে নিল মিতিন। ড্রয়িংরুমের একদম মধ্যিখানে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে বুমবুম, মুখে তার অসীম বিরক্তি। সম্ভবত বিদিশার কারণেই কাজ বেচারার বেরনো হয়নি, তাই। বিমলা দরজা খুলে দিয়ে কৌতূহলী মুখে তাকিয়ে। হতচকিত পার্থ টেরিয়ে টেরিয়ে বিদিশাকে দেখছিল, মিতিনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সুড়ুৎ ভেতরে ঢুকে গেল।

বিমলাকে কফি বানাতে বলে বিদিশাকে নিয়ে সর্টান স্টাডিতে চলে এল মিতিন। মেয়েটাকে সোফায় বসিয়ে চালিয়ে দিল স্ট্যান্ডফ্যান। জিজ্ঞাসা করল,—জল খাবে?

—খেয়েছি।

পাশে বসে মেয়েটার পিঠে হাত রাখল মিতিন,—এবার ঠাণ্ডা মাথায় বলো তো লোকটা কী বলেছে?

—আরও বেশি টাকা চাইছে। পাঁচ লাখ।

—মিটার চড়ে গেল যে?

—কী জানি...বলছে এবার দিলে ছেড়ে দেবে। আর বিরক্ত করবে না।

—হুম। মিতিন উঠে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসল। পেনসিল দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটছে কাগজে। বিদিশার দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করল,—কবে দিতে হবে টাকা?

—শনিবার।

—সামনের শনিবার?

—হ্যাঁ। আপনার শেখানো মতো আমি অনেক কাকুতি মিনতি করেছিলাম, একটা দিনও সময় দিল না।

—কী ভাবে দিতে হবে? সেই আগের বারের মতো? গাড়িতে?

—বলেনি। শুধু বলল, গতবারের মতো আর চালাকি করার চেষ্টা কোরো না, ঠিক সময়ে জানিয়ে দেব। বিদিশা আবার মিতিনের হাত চেপে ধরল,—আমার কী হবে দিদি? পাঁচ লাখের কথা আমি অর্চিষ্মানের সামনে উচ্চারণ করব কী করে? ও আর আমায় ক্ষমা করবে না। আমার সর্বস্ব গেল—

—অত ভয় পাচ্ছ কেন? টাকা দেবে না।

—টাকা না দিলে আমায় ছাড়বে কেন?

—ক্ষতিটাই বা কী করবে?

—যদি মেরে ফেলে? অর্কর মতো?

—হুম।...গাড়িতে এসেছ দেখলাম, ড্রাইভার কোথায়?

—আমিই চালিয়ে এসেছি।

—ড্রাইভার নিয়ে এলে না কেন?

—রবি আজ আসেনি। ভীষণ কামাই করে।

মিতিনের ভুরু সামান্য কুঁচকে গেল। ভাবছে কী যেন। জিজ্ঞাসা করল,—রবি কাল এসেছিল?

—হ্যাঁ। শ্বশুরমশাই নিয়ে বেরিয়েছিলেন।

—কখন ফিরেছিল?

—বিকেল বিকেলই তো ফিরল। তারপর বাবা কর্নেল লাহিড়ির বাড়ি দাবা খেলতে চলে গেলেন।...ও হ্যাঁ দিদি, আর একটা কথা। যে ফোন করছিল, তার নাম্বার আমি পেয়ে গেছি। মানে টেলিফোন নাম্বার।

মিতিন এবার সত্যিই চমকেছে,—কী করে?

—অর্চিষ্মান কালই একটা আনসারিং মেশিন কাম কল রেকর্ডার এনে লাগিয়েছে টেলিফোনে। ওতেই উঠেছে নাম্বারটা। বলতে বলতে ছোট্ট পার্স খুলে একটা চিরকুট বের করল বিদিশা,—এই যে।

চিরকুটটা দেখল মিতিন। অফিসপাড়ার নম্বর। সঙ্গে সঙ্গে ডায়াল ঘোরাল। একবার দু'বার তিনবার...প্রতি বারই এনগেজড্। সম্ভবত কোনও পাবলিক বুথ। পরে যাচাই করে নিতে হবে। কিন্তু অর্চিষ্মান এরকম একটা মেশিন লাগিয়েছে, তাকে জানাল না কেন?

মিতিন টুকরো কাগজটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখল,—ওই মেশিনে ভয়েস রেকর্ড করা যায় না?

—যায়। তবে...আমি বাটন টিপতে ভুলে গেছি।

মিতিনের চোখের মণি স্থির হয়ে গেল—ভুলেই গেলে?

—না...মানে...লোকটার গলা শুনলেই এমন ভয় করে...আমাকে আজ অর্চিষ্মান খুব বকবে। বিদিশার গলা আবার কাঁপছে,—আপনি প্লিজ এবারকার মতো টাকাটা দিয়ে দিতে বলুন অর্চিষ্মানকে। লোকটা কথা দিয়েছে আর চাইবে না।

মিতিন বেশ বিরক্ত বোধ করল। গম্ভীর গলায় বলল,—তুমি কী চাও বলো তো? ব্ল্যাকমেলারটাকে ধরতে চাও? না টাকা দিয়ে মিটমাট করে নিতে চাও?

বিদিশা উত্তর দিতে পারল না। কেমন বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে।

মিতিন গলা আরও ভারী করল,—আমি তোমাকে যা বলতে বলেছিলাম, বলেছ? বলেছ, তোমার বর অর্কর কথা সব জেনে গেছে, তুমি আর তাকে ভয় পাও না?

বিদিশা দু দিকে মাথা নাড়ল।

—কেন বলোনি?

বিদিশা অস্ফুটে বলল,—মনে ছিল না।

—স্ট্রেঞ্জ! মিতিনের চোখ বড় বড়,—সত্যি করে বলো তো, লোকটা তোমায় প্রাণের ভয় দেখাচ্ছে, না অন্য কিছু বলছে?

চকিতে একবার মিতিনের দিকে তাকিয়েই মাথা নামিয়ে নিল বিদিশা,—আর কী বলবে?

—তুমি কিন্তু সত্যি কথা বলছ না বিদিশা। মিতিন ঢিলটা ছুড়ে দিল,—তুমি ব্ল্যাকমেলারটাকে আড়াল করতে চাইছ।

—আমি?

—ইয়েস, তুমি। আমি যেটা শিখিয়ে দিলাম, সেটা বলতে স্রেফ ভুলে গেলে, তোমার স্বামী তোমার জন্য রেকর্ডার কিনে আনলেন, ঠিক সময়ে চালানোর কথা তোমার মনে পড়ল না...! এক সপ্তাহ ধরে ভয়ে বাড়িতে বসে রয়েছ, নড়ছ না, অথচ ফোনটা পেয়েই দিব্যি সেজেগুজে নিজে গাড়ি চালিয়ে এতটা পথ চলে এলে শুধু বলতে, আমি যেন অর্চিষ্মানকে বলে ব্ল্যাকমেলারকে টাকাটা পাইয়ে দিই! নাহ্, আমার কেমন গণ্ডগোল লাগছে। এ কেস থেকে আমি হাত ধুয়ে ফেলছি। আমি এক্ষুনি তোমার বরকে সাফ জানিয়ে দিচ্ছি, স্ত্রীর প্রাণ বাঁচানোই যদি শুধু উদ্দেশ্য হয়, তা হলে তিনি পয়সা দিয়ে পাহারাদার পুষুন। নয়তো পুলিশে যান।

রিসিভারে দিকে হাত বাড়াতেই খপ করে মিতিনের হাত চেপে ধরেছে বিদিশা,—প্লিজ দিদি...

—তুমি সব কথা খুলে বলছ না কেন? মিতিন আবার একটা ঢিল ছুড়ল,—বলো আমায়। কথা দিচ্ছি তোমার স্বামী জানবে না।

বিদিশা নিস্পন্দ। নিথর। মাথা নিচু করে বসে আছে। কফি রেখে গেছে বিমলা, আপন মনে কাপ দুটো ধোঁয়া উড়িয়ে চলেছে।

মিতিন গলা একদম খাদে নামিয়ে ফেলল,—তুমি বড় নিষ্ঠুর মেয়ে বিদিশা। তোমার ভাল করতে গিয়ে একটা ছেলেকে মরতে হল, তুমি কি চাও না তার খুনি ধরা পড়ুক?

এবার বিদিশার গাল বেয়ে টপ টপ জল গড়াচ্ছে। ফুঁপিয়ে উঠল,—আমি খুব খারাপ মেয়ে...। আমি সব্বাইকে ঠকিয়েছি। আমার বরকে, শ্বশুরকে...। অর্চিষ্মান সব জানলে আমায় বাড়ি থেকে দূর করে দেবে।

—বলছি তো, কিচ্ছু জানবে না। তুমি শুধু আমায় বলো।

ধীরে ধীরে, থেমে থেমে, নিজেকে উন্মোচিত করল বিদিশা। শোনাল নিজের পূর্ব

ইতিহাস, অরুণ মিহির ভাস্কর সকলের কথা। বলল, কেন সে এখনও ভয় পাচ্ছে ব্ল্যাকমেলারকে। মিতিনও প্রশ্ন করে যাচ্ছিল। একটার পর একটা। মাঝের ফাঁকফোকরগুলো ভরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। ভাস্করের সঙ্গে সাম্প্রতিক সাক্ষাতের বিবরণ, ভাস্করের প্রতি বিদিশার সন্দেহ, পৃষ্ন অর্চিষ্মানের সঙ্গে ভাস্করের সম্পর্ক— কিছুই গোপন করল না বিদিশা।

মিহির অরুণকে সে তেমন ধর্তব্যের মধ্যে আনছে না জেনেও তাদের হদিশ কোথায় পাওয়া যেতে পারে জিজ্ঞাসা করে নিল মিতিন।

কাহিনী শেষ করে নাক টানছে বিদিশা, চোখ মুছছে হাতের পিঠে। ভয়ে ভয়ে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে মিতিনের দিকে, চোখ নামিয়ে নিচ্ছে।

মিতিন গুম হয়ে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর প্রশ্ন কর,—তোমার এসব অতীত কাহিনী তোমার বাপের বাড়ির লোকরা জানে?

—না।

—দাদাও জানে না? সে তো তোমার প্রায় পিঠোপিঠি?

—কিছু কিছু হয়তো জানতেও পারে, বলতে পারব না। দাদার সঙ্গে আমার সেরকম ইন্টিমেসি ছিল না।

—তুমি বলেছিলে তোমার দাদার ঘরেই ট্রাঙ্কে ছিল বাক্সটা, সে কি তোমার লাভলেটারগুলো দেখেছিল?

—না। বাক্সটা মা অনেকদিন আগে আলমারিতে তুলে রেখেছিল। তাছাড়া চিঠিগুলো যেখানে ছিল, সেখান থেকে আমি ছাড়া আর কেউ বার করতে পারবে না।

—তুমি শিওর কেউ দেখেনি?

—মনে হয় না। দাদা দেখলে দাদার কথায় ঠিক প্রকাশ পেয়ে যেত। আমার দাদা একটু বেশি কথা বলে।

—হুঁ। মিতিন মাথা দোলাল,—তুমি বাড়ি চলে যাও। পৌঁছেই মিস্টার রুদ্রকে ব্ল্যাকমেলারের কথা জানিয়ে দিয়ো।

—বলব?

—ফোন যখন এসেছে, বলতে তো হবেই।...আমাকে প্রথম এসে যা বলেছিল, তাই বোলো।

—আপনার কাছে এসেছিলাম, বলব কি?

—যেচে বোলো না। পারলে প্রশ্নটা এড়িয়ে যেয়ো।

—ঠিক আছে।

বিদিশাকে বিদায় জানিয়ে ড্রয়িংরুমের সোফায় এল মিতিন। বুমবুমের কার্টুনের খুব নেশা, বাপ ছেলে কার্টুন দেখছে টিভিতে। পার্থ অপাঙ্গে দেখল মিতিনকে। ঠোঁটের কোণে তার ইয়া বড় এক প্রশ্নচিহ্ন ঝুলছে, কিন্তু মুখে কিছু বলছে না।

মিতিন ভুরু নাচাল,—কী, আজ যে বড় আড্ডায় গেলে না?

পার্থ আড়মোড়া ভাঙল,—গা ম্যাজ ম্যাজ করছে।

—কী মিথ্যেবাদী গো তুমি। সুন্দরী মেয়েটাকে দেখে সেঁটে গেলে, এটা বলতেও

লজ্জা হচ্ছে?

পার্থ এতক্ষণে বিদিশা-প্রসঙ্গ তোলার ভরসা পেল। হাসছে,—যা বলেছ। অমন রূপসীকে দেখে আর নড়া যায়! এ যে একেবারে বসরাই গোলাপ।

—তুমি বসরাই গোলাপ দেখেছ?

—গল্প শুনেছি। তার নাকি যেমন গন্ধ, তেমন রূপ।

—হুঁ, গন্ধ আছে বটে। মিতিন মাথা দোলাল। সংক্ষেপে বিদিশা-উপাখ্যান শোনাল পার্থকে। বার বার কথাগুলো আওড়ালে তার একটা সুফলও আছে, কাহিনীর খুঁটিনাটিগুলো মস্তিষ্কে গেঁথে যায়।

পার্থর চোখ গোল গোল হয়ে গেছে। ছদ্ম আতঙ্কের সুরে বলল,—কী মেয়ের কেস করছ, ভাই? এ মেয়ে তো মেয়ে নয়, ডাকিনী নিশ্চয়।

—রূপ খুব সাংঘাতিক জিনিস, বুঝলে। রূপকে যদি কেউ পণ্য করে, তবে তার পরিণতি কখনই ভাল হয় না। এই মেয়ের ক্ষেত্রে আরও দুটো ফ্যাক্টর যোগ হয়েছে। অশিক্ষা আর লোভ।

—আহা, ওভাবে দেখছ কেন? বিদিশাদেবী তাঁর রূপকে নিবেদন করতে চেয়েছেন। নারায়ণ দেবতার কাছে...

—ব্যাপারটা সেই একই হল। নিজেকে ফুল বেলপাতা মনে করা, কিংবা কলা বাতাসা।...তবে হ্যাঁ, কেসটা এখন অনেক বেশি লজিকাল মনে হচ্ছে। ওই ব্ল্যাকমেলারকে এখনও ভয় পাওয়া, অর্চিষ্মানের সঙ্গে দূরত্ব...সবেরই জোরালো গ্রাউন্ড পাচ্ছি এখন।

—কিন্তু কেসটা একটু জটিল হয়ে গেল না? কতগুলো অচেনা চরিত্র এসে গেল! কাকে ছেড়ে কাকে ঘাঁটবে তুমি এখন? সব জায়গায় ট্যাপ করবেটা কী করে?

—হুঁ, ভাবছি...। মিতিন টিভির পর্দায় চোখ রাখল। এক ইঁদুরছানাকে তাড়া করছে একটা প্রকাণ্ড ভালুক। সম্ভাব্য অসম্ভাব্য অজস্র উপায়ে ভালুককে নাকাল করছে ইঁদুরছানা, একবার ভালুকের নাকের ভেতর ঢুকেও বেরিয়ে এল। বুমবুম হাততালি দিয়ে উঠল, হিহি হাসছে।

রাগে গরগর ভালুকটাকে দেখতে দেখতে মিতিন আনমনে বলল,—লুকোচুরিটা কে খেলছে জানতেই হবে। দেয়ার ইজ ওয়ান পার্টিকিউলার পারসন, এবং সে বিদিশার আদৌ অচেনা নয়...

—তুমি তো বললে বিদিশা কাকে সন্দেহ করছে! ওই ভাস্কর না কী যেন নাম? পার্থ টিভির সাউন্ড অল্প কমিয়ে দিল।

—হ্যাঁ, ভাস্কর। বিদিশার স্কুললাইফের প্রেমিক। তাকে তো বাজিয়ে দেখতেই হবে, কিন্তু কয়েকটা খটকা থেকে যাচ্ছে। যদি সে ব্ল্যাকমেলারই হয়, তা হলে দু দুবার ফোনে ভয় দেখানো, এমন কী টাকা দেওয়াটাও ফাইনালাইজড হয়ে যাওয়ার পর বিদিশাকে দেখা দিল কেন? অথবা বলা যায়, আদৌ তার দর্শনই বা মিলল কেন? তা হলে এমন কেউ কি আছে, যে ভাস্করকে শো করে বিদিশাকে বিভ্রান্ত করে দিতে চায়?

—তুমি কি পৃষনের কথা বলছ?

—আমি পৃষন অর্চনা দুজনের কথাই বলছি। অর্চনার সঙ্গে বিদিশার রিলেশনটা স্টাডি

করতে হবে। পুষনকেও।

—আর সেই বাকি প্রেমিকগুলোকে?

—তাদের খোঁজও নিচ্ছি। কারণ একটা ব্যাপার পরিষ্কার, তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও ব্ল্যাকমেলার অবহিত আছে। তাদের কারুর সঙ্গেও ব্ল্যাকমেলারের কানেকশান থাকাটা অসম্ভব নয়। এমন কী, তাদের কেউ ব্ল্যাকমেলার হলেও আমি অবাক হব না। ব্যর্থ প্রেমিকরা প্রতিহিংসা থেকে কী করতে পারে, আর কী যে না করতে পারে...! তবে হ্যাঁ, তাদের এখন খোঁজ করাটা কে কোন লোকালিটিতে থাকে বিদিশা মোটামুটি বলে দিয়েছে। সুভাষ আর অজয়কে পাঠিয়ে তাদের আগে একবার তালাশ করে নিতে হবে।

—যাহ্ বাবা, তুমি ওই বজ্জাত ছোঁড়াটাকে একেবারে হিসেবের বাইরে করে দিলে? ওই চিত্রভানুটাকে?

—আমি কাউকেই হিসেবের বাইরে রাখিনি। বলতে কি, অর্চিষ্মান রুদ্রকেও নয়।

—অর্চিষ্মান? যাহ্, সে কেন হবে?

—কেন নয়? মুখে অর্চিষ্মান যতই বলুক, সে আদৌ অর্কর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানত না, কথাটা সত্যি নাও হতে পারে। বিদিশার বক্তব্য অনুযায়ী অর্চিষ্মান অর্ককে দিল্লায় দেখে থাকলেও থাকতে পারে। কারণ তার পরই অর্চিষ্মানের আচরণে সামান্যতম হলেও পরিবর্তন ঘটেছিল। অন্তত দিদায়। মনে রেখো, দিদা থেকে ফেরার পরই প্রথম ফোনটা আসে। তা ছাড়া বিদিশা, তার দাদা, তার বাবা, মা, প্রত্যেকের কথা থেকেই একটি ব্যাপার স্পষ্ট, অর্চিষ্মান একজন অত্যন্ত রাগী, এবং অহংবোধসম্পন্ন মানুষ। অর্ককে দেখেই হয়তো সন্দেহের জ্বালায় ওই ইঁদুর বেড়াল খেলাটা শুরু করেছিল অর্চিষ্মান! বউকে হয়তো সে যন্ত্রণাই দিতে চায়...

—কিন্তু টাকা? সে নিজের টাকা নিজেই নিচ্ছে? আই মিন নিয়েছে?

মিতিন ঠোঁট টিপে হাসল,—শোন, অর্চিষ্মান রুদ্র খুব সহজ চিড়িয়া নয়। এই টাকা দেওয়া নেওয়াতে যেমন একজন কাল্পনিক ব্ল্যাকমেলারের অস্তিত্ব প্রমাণ হবে, তেমনি প্রবল মানসিক চাপে বিদিশার কিছু একটা ঘটে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিম্বা একটা কিছু ঘটে গেলে, এই যেমন অর্কর ঘটেছে, ওই ব্ল্যাকমেলিং ব্যাপারটাকে অ্যালিবাই হিসেবে খাড়া করতে পারবে অর্চিষ্মান। অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন, সে অনায়াসে সন্দেহের তালিকার বাইরে থেকে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু অর্থপ্রাপ্তিও ঘটবে অর্চিষ্মানের। মনে রেখো, মাত্র কদিন আগে বিদিশার নামে সে দশ লাখ টাকার একটা লাইফ ইনসিওরেন্স করিয়েছে।

—মাত্র দশ লাখ টাকার জন্য এত পয়সাঅলা একটা লোক বউকে হাপিস করে দেবে?

—খুবই সম্ভব। দুটো জোরালো গ্রাউন্ড আছে। টাকাপয়সার ব্যাপারে অর্চিষ্মান অতি ছ্যাঁচরা। সবিতাবাবু আমায় বলেছেন, দোকানের চুরির কেসটায় সে ইনসিওরেন্স কোম্পানি থেকে কুড়ি হাজার টাকা ক্লেম আদায় করেছে। অথচ সবিতাবাবু ডেডশিওর সেদিন ক্যাশবক্সে হাজারের বেশি ছিল না। কয়েকটা ফল্‌স ফার্নিচারের বিল এনট্রি করিয়ে...। মাত্র কুড়ি হাজারের জন্য যে এই কাজ করতে পারে, সে দশ লাখের জন্য

কোথায় নামবে? সেকেন্ডলি, যদি অর্ককে সে দিঘায় দেখে থাকে, তার মতো ইগোটিস্ট লোকের পক্ষে সেটা নির্বিবাদে হজম করা কঠিন। কী, ঠিক বলছি?

—তা বলে মেরেই ফেলবে? পার্থ মাথা নাড়ল,—আমার তো মনে হয়েছে অর্চিষ্মান বিদিশাকে ভালইবাসে।

—তো কী! ভালবাসা একটা জটিল সমীকরণ মশাই। ওথেলো কি ডেজডিমোনাকে ভালবাসত না?

বুমবুম কার্টনের ফাঁকে ফাঁকে বাবা মার কথা শুনছিল। পুট করে বলে উঠল,—মোনালিসা আমায় ভালবাসে না মা।

কথাটা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল মিতিনের। হাসি চেপে বলল,—কে মোনালিসা?

—আমার বন্ধু। আমাদের ক্লাসে পড়ে। মোনালিসা শুভমকে ভালবাসে।

—কী করে বুঝলি?

—মোনালিসা শুভমকে রোজ লজেন্স দেয়। আমায় দেয় না।

—অ। তো?

—আমি দুজনকেই স্লিপ থেকে ফেলে দেব।

মিতিন এবার সত্যি সত্যি গোমড়া হয়ে গেল। নীরস স্বরে পার্থকে বলল,—দেখেছ তো ভালবাসার মহিমা!

[সাত]

সকালবেলা ডাইনিং টেবিলে বসে ছেলেকে খাওয়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছিল মিতিন। চেষ্টা তো নয়, রীতিমতো যুদ্ধ। স্বহস্তে দুধে কর্নফ্লেক্স মিশিয়ে ছেলের মুখে চামচ ঠেসে ধরবে মিতিন,—বুমবুম প্রাণপণে থু থু করবে, ওমনি মিতিন ঠাস ঠাস চড় কষাবে বুমবুমকে, এটা মোটামুটি এক প্রাত্যহিক লড়াই।

আজ অন্য পন্থা নিয়েছে বুমবুম। মুখ টিপে আছে, কিছুতেই হাঁ করছে না।

মিতিন গনগনে চোখে তাকাল,—খুব খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু। তুমি ভীষণ খারাপ ছেলে হয়ে যাচ্ছ...

পার্থ এখনও বাজারে যায়নি। আজকের সব ক'টা কাগজ খুলে কালকের শব্দজব্দর উত্তর মেলাচ্ছে। মা ছেলের লড়াই তার গা-সওয়া, সে এতে অংশগ্রহণ করে না।

কী মনে হতে প্রশ্ন ছুড়ল,—কাল অত রাতে কে ফোন করেছিল গো?

মিতিন ছেলের নাক চেপে ধরে মুখে চামচ ঢুকিয়ে দিল,—রুদ্রমশাই, আবার কে।

—কী বলছিল? দু লাখটা পাঁচ লাখ হয়ে গেল কেন?

—ওই রকমই। খুব গজগজ করছিল। জিজ্ঞেস করছিল, টাকাটা রেডি রাখতে হবে কিনা।

—তুমি কী বললে?

—ব্ল্যাকমেলারটার মতোই বললাম। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, ঠিক সময়ে জানিয়ে

দেব।

—তোমারও কিন্তু এই মওকায় ফি বাড়িয়ে নেওয়া উচিত। দু লাখে যদি পঞ্চাশ হাজার হয়, পাঁচ লাখে সওয়া লাখ। নিদেনপক্ষে এক। অ্যাডভান্সটাও নিয়ে রাখো। ও যদি কালপ্রিট হয় আর কিচ্ছু জুটবে না।

মিতিন ছেলেকে আলগা ঠোনা মেরে আর এক ঢোক সদ্যুষ্ণ ভুট্টাকুচি খাওয়াতে যাচ্ছিল, ফোন বেজে উঠেছে।

পার্থ ধরল। মুহূর্ত পরেই রিসিভারে হাত চেপে বলল,—নাও, শয়তানের নাম করতেই শয়তানের গলা। তোমার রুদ্রমশাই।

আঁচলে হাত মুছে মিতিন এসে রিসিভার তুলল,—বলুন?

—আবার একটা ঝঞ্ঝাট পেকেছে ম্যাডাম। অর্চিষ্মানের স্বর বেশ উত্তেজিত।

—কী হল?

—রবি মিসিং।

মিতিন খুব একটা চমকাল না। ঠাণ্ডা গলায় বলল,—কখন থেকে?

—কাল তো ব্যাটা কাজে আসেনি। আজ সকালে ওর বউ এসে হাজির, বলছে, গতকাল নাকি কাজে যাচ্ছে বলে বেরিয়েও ছিল। এখানেও আসেনি, রাতে বাড়িও ফেরেনি। কী করি বলুন তো?

—কী আর করবেন! বউটাকে নিয়ে গিয়ে থানায় একটা ডায়েরি করুন।...আপনি তো রবিকে নিয়ে খুব একটা বেরোন না, তাই না?

—খুব কম। কখনও সখনও কাজ থাকলে দোকানে ডাকি। ও তো এখন আছেই শুধু বাবা আর বিদিশার জন্য।

—পরশু দিন তো কাজে এসেছিল। আপনার সঙ্গে তখন দেখা হয়েছে?

—ওই সকালে বেরনোর সময়ে একবার।

—তখন কিছু বলেছিলেন নাকি? গয়নার বাক্সর কথা...?

অর্চিষ্মান নীরব।

একটুক্ষণ থেমে আছে অর্চিষ্মান। তারপর গলা শোনা গাল,—হ্যাঁ...মানে...মানে জেরার মতো করেছিলাম আর কি।

—বকাবকি করেছিলেন? পুলিশের ভয় দেখিয়েছিলেন?

অর্চিষ্মান নীরব।

মিতিন বিরক্ত স্বরে বলল,—আপনাকে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে বারণ করেছিলাম মিস্টার রুদ্র।

—এ কী বলছেন? আমার চাকর, আমার ড্রাইভার...তাদের আমি প্রশ্ন করতে পারব না? আপনার কাজের সুবিধে করে দেওয়ার জন্যই তো...

—ব্যাপারটা আমার ওপরই ছেড়ে রাখা উচিত ছিল। যাক গে, যা হওয়ার হয়ে গেছে, আমি দেখছি কী করা যায়। আপনি এখন আছেন বাড়িতে?

—আধঘণ্টাটাক আছি। আজ রোববার, দোকানে যেতেই হবে। নিলামের দিন...। আমার থাকাটা কি জরুরি?

একটু তাবল মিতিন,—ন্যাহ্ আপনি ডায়েরি করে চলে যান।

—বাবা খুব উতলা হয়ে পড়েছেন।...মুস্তাফি সাহেবকে কি একবার জানিয়ে রাখব?

—এক্ষুনি প্রয়োজন নেই।

—আর একটা কথা। আমার একটু তাড়া আছে...বাবা যদি রবির বউটাকে নিয়ে থানায় যান?

—যেতে পারেন। তবে বউটা এখন যেন চলে না যায়। আপনাদের ওখানেই থাকে।

—ঠিক আছে।...রবি মিসিং হলে কি আপনার খুব অসুবিধে হয়ে যাবে ম্যাডাম?

—দেখা যাক। বাই।

টেলিফোন রেখে একটুক্ষণ থম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিতিন। তারপর ফোন তুলে পটপট ডায়াল ঘোরাল,—অনিশ্চয় তালুকদার আছেন?

—কে বলছেন?

—প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়।

কণপরেই দূরভাবে অনিশ্চয়-কণ্ঠ,—মর্নিং ম্যাডাম। সকাল সকাল...কী সংবাদ?

—আপনার একটু হেলপ চাই দাদা।

—সে তো বুঝেই গেছি। প্রয়োজন ছাড়া কি আমাকে স্মরণ করা হয়? কী কেস?

—একজনের বাড়ির ড্রাইভার গায়েব হয়েছে।

—আপনি কি আজকাল এই সব কেস করছেন?

—পেটের ধান্দা দাদা, কী করব বলুন?

—গাড়ি নিয়ে ভেগেছে? না গাড়ি ছাড়া?

—গাড়ি ছাড়া।

—গাড়ির পার্টস টাট্স সব যথাস্থানে আছে? ব্যাটারি? তেল?

—ওসব কিছু নয় দাদা। এটা একটা জটিল কেসের অংশ। মূল কেসটা আপনাকে পরে ডিটেলে বলব। মিতিন গলাটা আদুরে আদুরে করল,—আপাতত দাদা একটা কাজ আমার করে দিতেই হবে। আমার লোকের ড্রাইভার যে বাড়িতে চাকরি করত, সে বাড়ির লোকজনকে একটু ইন্টারোগেট করতে যাবে। লোকাল থানাকে বলুন কাইন্ডলি একজন কাউকে সঙ্গে দিতে।

—কোন থানা?

—সল্টলেক।

—বামেলা করলেন, সে তো আবার ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ।...ঠিক আছে, দেখছি। আপনার সেই ওই কেসটার কী হল? গয়না চুরি?

—ওটা শুক্রবারই মিটে গেছে। শুক্রবার গেছিলাম। মধ্যমগ্রামে। অপরাধীকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে এসেছি। বাড়ির গিন্নির বখা ভাইপোটাই গয়না সরিয়েছিল। গিন্নি গার্ড দিচ্ছিল ভাইপোকে।

—আপনি তো দেখছি কেলেঙ্কারি করে ফেলছেন। আমাদের ভাতরুটি গেল, হেঁ হেঁ হেঁ।

—কী যে বলেন দাদা? আপনারা শত কাজে বিজি থাকেন, আমরা একটু আপনাদের

কাজ হালকা করি মাত্র।...তা হলে দাদা সল্টলেকের ব্যবস্থাটা করে দিচ্ছেন তো? ড্রাইভারটার নাম রবি, মালিকের নাম অর্চিষ্মান রুদ্র...

—কী রুদ্র?

—অর্চিষ্মান।

—অর্চিষ্মান? সূর্যের নাম? মনে থাকবে।

টেলিফোন রাখতেই কাগজের আড়াল থেকে পার্থ বলে উঠল,—লোকটাকে খুব কে-কে থিয়োরি দিয়ে ম্যানেজ করে যাচ্ছ, অ্যাঁ?

—মানে?

—কামিনী-কাঞ্চন থিয়োরি। কাঞ্চন তো নেই, কামিনীটাই মারছ।

—বাজে কথা বোলো না তো। মিতিন চোখ পাকিয়ে তাকাল,—যারা উইথ ইনটিগ্রিটি কাজ করে, তাদের ওসব কোনও থিয়োরি অ্যাপ্লাই করার দরকার হয় না। ওঠো তো, কাগজ পেনসিল নিয়ে না বসে চটপট বাজার সেরে এসো। আমি চাউমিন বানিয়ে রাখছি, খেয়েই বেরিয়ে পড়বে।

—কোথায়? পার্থ আকাশ থেকে পড়ল।

—প্রথমে সল্টলেক থানা, সেখান থেকে বিদিশাদের বাড়ি। রবি হাওয়া। গাইডলাইন তৈরি করে দিচ্ছি, সেই অনুযায়ী ওদের বাড়ির সকলকে ডিটেল জেরা করবে। বিদিশা, বিদিশার শ্বশুর, কাউকে ছাড়বে না। গাইডলাইনের বাইরে প্রশ্ন করতে পারো, কিন্তু ব্ল্যাকমেলিং নিয়ে একটাও কথা নয়। আর মাথায় রাখবে, তুমি তখন পুলিশের লোক।

—রবিবারের সকালে পুলিশের লোক সাজাবে?

—অসুবিধে কি? তুমি তো নাটকে সব কিছুই সাজো।

বুমবুম খাওয়া ফেলে লাফিয়ে উঠল,—আমি পুলিশ হব। আমি বাবার সঙ্গে যাব।

—না। মিতিন আলগা ধমক দিল ছেলেকে,—তুমি এখন সবটুকু খেয়ে পড়তে বসবে। তোমাকে আমি সামনের রবিবার দিদার বাড়ি নিয়ে যাব।...আর মনে আছে তো, কাল স্কুলে গিয়ে আগে মোনালিসা আর শুভমের সঙ্গে ভাব করে নেবে? নইলে আমি কিন্তু কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাব না।

বুমবুমের মুখ বেজার হয়ে গেল। পার্থ অবশ্য বাধ্য ছেলের মতো উঠে পড়েছে, পাঞ্জাবি চড়িয়ে থলি হাতে বেরিয়ে গেল।

মিতিন রান্নাঘরে এল। জলে নুন ফেলে ডেকচি গ্যাসে বসাল, জল ফুটলে নুডল্‌স ছাড়বে। ছুরি দিয়ে বিন আর গাজর কুচি কুচি করছে।...রবিকে কি অর্চিষ্মানই সরাল? রবিকে দিয়েই কি চিঠিগুলো চুরি করিয়েছিল অর্চিষ্মান? কিন্তু তা হলে রবিকে জেরা করার কথাটা কেন চেপে গেল না? কথাটা হয়তো মিথ্যেও হতে পারে। হয়তো নিজেই কায়দা করে সরিয়ে দিয়ে এখন নিজের একটা বোকাচালাক ইমেজ খাড়া করতে চাইছে।...মিতিন দ্রুত হাতে পেঁয়াজ কুচোতে শুরু করল। হাত চলছে, মাথাও চলছে।...বাক্সটা পাওয়ার পর নয় অরুণ মিহিরের কথা অর্চিষ্মান জেনেছিল, কিন্তু তার আগে বিদিশাকে ফোন করেছিল কী করে? শুধুই অর্ককে দেখে? ঝট করে হঠাৎ কলরেকর্ডারই বা কিনল কেন? ভাস্করের সঙ্গে অর্চিষ্মানের ভাল পরিচয় আছে। কিন্তু

কতদিনের? ভাস্কর কি কিছু...? মিহির অরুণের কথা ভাস্কর কতটা জানে?...

জল ফুটে গেছে। গাজর বিন জলে ফেলল মিতিন। হাঁক দিল,—বিমলা...?

বিমলা বিছানা তুলছিল। রান্নাঘরের দরজায় এল।

—তুই সুভাষের বাড়িটা চিনিস?

—হ্যাঁ, এই তো দাসপাড়ায়। মিষ্টির দোকানের গলিটায়।

—টক করে একবার যা তো। সুভাষকে বল আমি ডাকছি। জলদি ফিরবি, পথে আবার দাঁড়িয়ে আড্ডা মারিস না।

বিমলা উড়তে উড়তে চলে গেল।

রবিবারের অলস সকাল হঠাৎই দারুণ কর্মব্যস্ত এখন। বাজার থেকে ফিরে খচাখচ দাড়ি কামাল পার্থ। মিতিন চাউমিন বানিয়ে ফেলেছে, টেবিলে খাবার সাজিয়ে চলে গেছে স্টাডিতে, তৈরি করে দিচ্ছে পার্থর কাগজপত্র।

পার্থ বেরিয়ে যেতে মিতিন খানিক হাঁপ জিরোল। চা খেতে খেতে চোখ বোলাচ্ছে খবরের কাগজের পাতা। বিমলাকে রান্না বুঝিয়ে এবার স্নানে ঢুকবে। বুমবুমকেও করাবে স্নান।

সুভাষ এল কাঁটায় কাঁটায় দশটায়। বছর তিরিশ বয়স, দারুণ চটপটে, কথাবার্তায় তুখোড়, চেহারায় তেমন ঔজ্জ্বল্য না থাকলেও বেশ বুদ্ধির ছাপ আছে। ছুটির দিনে ডাক পড়েছে বলে এতটুকু অসন্তুষ্টি নেই মুখে।

মিতিন বলল,—আজই কয়েকটা কাজ করতে হবে সুভাষ। দুটো লোকের এগজ্যাক্ট অ্যাড্রেস চাই। কাছেই, ভবানীপুর কালীঘাটের মধ্যেই। থার্ড আর একজন, মোটামুটি লোকালি নোন, পলিটিকালি ওয়েল কানেকটেড...এর সম্পর্কে বিশদ খবর চাই। মানে লোকটার টাকাপয়সা কেমন, নারীদোষ আছে কি না, কীসের কীসের ব্যবসা, ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব কারা, আচার ব্যবহার কেমন, এই সব। দুটো লোকের ফোন নাম্বার দিচ্ছি। অর্চিষ্মান রুদ্র আর পূষন রায়। এদের যে কাউকে রিং করে লোকটার অ্যাড্রেস বার করতে পারো।...কাজগুলো খুব আরজেন্ট কিন্তু।

সুভাষ সব বুঝে নিয়ে বলল,—কালীঘাট পার্কের পিছনেরটা...মানে ওই মিহির সরকার...এটা চটপট হয়ে যাবে। ওখানে আমার প্রচুর চেনা।

—গুড। বেরিয়ে পড়ো।...ও হ্যাঁ, আর একটা ফোন নাম্বার রাখো। আমার মনে হচ্ছে এটা পাবলিক ফোন, তোমাকে এক্সচেঞ্জে গিয়ে ভেরিফাই করতে হবে। এ কাজটা অবশ্য কাল করলেও চলবে।

বুমবুমের এ বি সি ডি লেখা অনেকক্ষণ শেষ। ঘুরঘুর করছে টিভির আশেপাশে, সাহস করে কিছু বলতে পারছে না। ছেলেকে কাছে ডেকে আদর করল মিতিন, টিভির কার্টুন চ্যানেল চালিয়ে দিল। আহা রে, ছেলেটা কাল থেকে বড্ড বকুনি খাচ্ছে।

পার্থ ফিরল প্রায় দুটো নাগাদ। খাওয়া দাওয়া সেরে, ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে মিতিন তখন স্টাডিরুমে বসে দীপক ভাল্লা কেসের খুঁটিনাটি লিখছিল।

টেবিলে একতাড়া কাগজ ফেলে দিল পার্থ—এই নাও তোমার সব রিপোর্ট।

—এর মধ্যে হয়ে গেল?

—কী এমন ছাতার মাথা কাজ? গেলাম, সব্বাইকে প্রশ্ন করলাম, চলে এলাম।

—রবির বাড়ি দেখে এসেছ?

—ফেরার পথে গেছিলাম।

—কী দেখলে?

—সব লেখা আছে।...আমাকে আর ডিসটার্ব কোরো না, এক্ষুনি বেরে ব্রিগার্ডালে ছুটতে হবে। কাল যাইনি, আজ দেরি হলে অমলদা কান মুলে দেবে।

—প্রভাকর দত্তর কথাটা মাথায় রেখো। আমার হাতে কিন্তু আর একদম সময় নেই।

—জানি।

দীপক ভাল্লা সরিয়ে রবি খাঁড়াতে মনোযোগী হল মিতিন। প্রত্যেকের জবানবন্দি আলাদা আলাদা পাতায়। পড়তে পড়তে দরকারি অংশগুলো টুকছে মিতিন, সাজাচ্ছে মনোলগের ঢঙে। নাম ধরে ধরে।

দিননাথ—রবিকে আমিই ড্রাইভার হিসেবে বহাল করেছিলাম। বছর আটেক আগে অ্যাম্বাসাডার বেচে মারুতি কিনি, তখন থেকে আছে। হাজারে ঢুকেছিল, এখন মাইনে বাইশশো। রবিকে পাঠিয়েছিল আমার জামাই। সম্ভবত রবি ওর কারখানার কোনও কর্মচারীর রিলেটিভ। আমার আগের ড্রাইভার বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। চোখেই দেখত না, তাই...। হাওড়া জেলায় রবির বাড়ি, আমতার দিকে। গ্রামের নামফাম জানি না। এখানে ফুলবাগানে ভাড়া থাকে, সে বাড়িও দেখিনি। ড্রাইভার হিসেবে রবি ভালই, হাত পাকা, নম্র ভদ্র, তবে একটু অলস প্রকৃতির। বাড়ির ডিউটি, কাজ কম, মাঝে মাঝেই এদিক ওদিক কোথায় চলে যেত। আমি ইদানীং গাড়ি বড় একটা ব্যবহার করি না। আমার গানবাজনা শোনার শখ আছে। কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পর শখটাই এখন নেশা। ফাংশানে গেলে অনেকক্ষণ লেগে যায়, শুধু শুধুই ড্রাইভার অতক্ষণ আটকে রাখার আমি পক্ষপাতী নই। বিদিশাই ওকে নিয়ে বেরোয় বেশি। শুক্রবার দুপুরে ঘন্টাখানেকের জন্য বেরিয়েছিলাম আমি। টেপরেকর্ডারটা গণ্ডগোল করছিল, শ্যামবাজার মোড়ে একটা চেনা দোকানে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। একটু যেন তখন মনমরা ছিল, কারণ জিজ্ঞেস করিনি। নেশাভাঙ করত কিনা আমার জানা নেই। প্রেম করে ভেগেছে বলে আমার মনে হয় না। কুসঙ্গেও পড়তে পারে। হ্যাঁ, বিশ্বাসী ছিল।

পদ্মপাণি—রবি আগে আমায় খুব মান্যিগন্যি করত। বউদিমণি আসার পরে বদলে গেছিল। কামাই করেছ কেন জিজ্ঞেস করলে ফক্কুড়ি করত, ঠিক জবাব দিত না। মাঝে মাঝে ঘুরতে যেত কোথায়। বলত, কাজ নেই বসে বসে কী বই ভাজব। কোথায় যেত বলতে পারব না। দাদাই ওকে লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছে। কর্তাবাবুকে অবশ্য ভয় পায় খুব, তিনি ডাক পাঠালে হাঁই হাঁই করে দৌড়ত। কর্তাবাবু কোনও ড্রাইভারকেই বেশি খাটাতে ভালবাসেন না। দোকান থেকে ফিরতে রাত হলে কর্তাবাবু ট্যাক্সিতেই ফিরতেন। শুনেছি অল্পস্বল্প মদ খেত রবি। মেয়েমানুষের দোষ আছে বলে আমার মনে হয় না। শুক্রবার কখন গেছে দেখিনি।

সুমতি—সংসারী মানুষ ছিল। বউ মেয়েকে খুব ভালবাসত। এবার পুজোয় বউ-এর

জন্য কী দামি একখানা কাপড় কিনেছে, তিন মেয়ের জন্য ভাল ভাল জামা। কদিন আগে দেশে জমি কিনেছে। এমন মানুষ সব ছেড়ে পালাবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। পরশু চলে গিয়েও একবার ফিরে এসেছিল। এই রাত সাতটা আটটা নাগাদ। বলছিল কী বোনাসের জন্য এসেছে। মুখটা তখন ভার ভার ছিল।

মানদা—চা খেতে এসে রবিদাদা গল্প করত খুব। ঘরসংসারের কথাই বলত বেশি। আর একটা কথাও বলত। বউদিমণি এসে নাকি ওর কপাল ফিরে গেছে। বউমণি খুব টাকাপয়সা দিত বোধহয়। শুক্রবার কখন গেছে বলতে পারব না।

দেবলা বাড়ি—আমাদের অনেকদিন বিয়ে হয়েছে। বড় মেয়ের বয়স ষোলো। মেজ চোদ্দো। ছোট দশ। চাপা স্বভাবের লোক আমার স্বামী, বাইরের কথা ঘরে এসে বলত না। বড় মেয়ের সম্বন্ধ দেখেছিল একটা, দেনাপাওনা নিয়ে কথা চলছিল। রোজ রোজ নেশা করত না, তবে পরশু রাতে চুর হয়ে ফিরেছিল। সকালেও গম্ভীর ছিল খুব। বেরনোর আগে বলেছিল আমার যদি কখনও কিছু হয়ে যায় মালিকদের কাছে যাস। বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার মানুষ নয়।

এই পর্যন্ত লিখে থামল মিতিন। বিদিশার বয়ানে আলগা চোখ বোলাল, লিখল না কিছু। রবির বাড়ির বর্ণনাটাও পড়ে নিল একবার। ফুলবাগানে প্রায় বস্তি এলাকায় দেড় কামরার বাসা। দেওয়াল পাকা, মাথায় টিনের চাল। চাকচিক্যহীন, তবে সম্প্রতি সাদাকালো টিভি কিনেছে একটা। একটা স্টিলের পুরনো আলমারি আছে।

কাগজগুলো ফাইলে ঢুকিয়ে একটুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইল মিতিন। দুপুর ফুরিয়ে এসেছে, পার্টিশানের গায়ে কাটা ছোট্ট জানলা থেকে সরে গেছে আলো, ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে ফালি জায়গাটুকু।

হাত বাড়িয়ে টেবিলল্যাম্পটা জ্বালল মিতিন, নেভাল, আবার জ্বালল। ভাবছে। একটা সূক্ষ্ম আলোর রেখা যেন দেখা যায় না?

মিতিন আবার ফাইল খুলেছে। আবার ডুবল জবানবন্দিতে।

[আট]

সোমবারই ভাস্কর সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পেয়ে গেল মিতিন। পাস্ট লাফই মোটেই সুবিধের নয়, ছিঁচকে চুরির বদনাম ছিল এক সময়ে, সম্ভবত পুলিশ রেকর্ডে নাম আছে। মোটামুটি ভদ্র বাড়িরই ছেলে, মামা বা কাকা কারুর সুবাদে বছর পাঁচেক আগে এক নামী নেতার পার্শ্বচর বনে যায়, তারই ল্যাংবোট হয়ে দিল্লি প্রস্থান, বেশ কিছুকাল রাজধানীতে কাটিয়ে দেড় দু বছর হল আবার ফিরেছে কলকাতায়। রাজনৈতিক দাদাদের আশীর্বাদে ভাস্কর এখন রীতিমতো ক্ষমতাবান মানুষ। সকলেই জানে ব্যবসা করে, কিন্তু কী ব্যবসা কেউ জানে না। মদ্যপান, নারীসঙ্গ, কোনও গুণেরই তার ঘাটতি নেই। তবে সে লোক খারাপ নয়; বেশ দিলদরিয়া টাইপ, বেশ কয়েকটা বড় সড় গানের জলসা বসিয়েছে পাড়ায়, রক্তদান শিবির করেছে, পুজোয় বিজ্ঞাপনও দিয়েছে প্রচুর টাকার, পাড়ার ছেলেছোকরারা তাকে ভালই বাসে। বাজারে গুজব, ভাস্কর এবার কাউন্সিলার

ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে।

মিহিরের ঠিকানাও জোগাড় করে এনেছে সুভাষ। কালীঘাট পার্কের পিছনের রাস্তাতেই থাকে মিহির, ভাড়া বাড়িতে, মা বাবা দাদা বউদি সকলের সঙ্গে। সে এখন নামজাদা কোম্পানির সেলসম্যান, সকাল নটায় বেরিয়ে যায়, ফেরে সাড়ে সাতটা আটটায়। অতি সম্প্রতি বিয়ে করেছে মিহির, গত শ্রাবণে।

অরুণের খোঁজ পেতে অবশ্য সুভাষের কালঘাম ছুটে গেছে। কে এক নগণ্য অরুণ কবে যদুবাজারের ফুটপাথে চুড়ির দোকান দিয়েছিল, কোন কালে তা উঠেও গেছে, কে আর তার খবর রাখে! তার ওপর এখন পুজোর ভিড়, দোকানদাররা খদ্দের নিয়েই মজে আছে, কেউ কোনও উত্তরই দিতে চায় না। অনেক ঘুরে শেষে অরুণের এক বন্ধুর সন্ধান পেয়েছে সুভাষ। হাওড়ার মঙ্গলাহাট থেকে বাচ্চাদের জামাপ্যান্ট কিনে এনে যদুবাজারে বেচেন তিনি, ছোট্ট একটা দোকানে বসে। অরুণের হাল সাকিন তিনি দিয়েছেন বটে, সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়ি ঝুড়ি নিন্দেও করেছেন ভাইপোর। সে এখন নাকি বিয়ে করে ঘরজামাই, থাকে অশোকনগরে। একেবারে বউ-এর পা-চাটা বনে গেছে সে, বছরে একবার কাকা কাকির মুখ দেখতে আসারও সময় পায় না, অথচ এই কাকাই তাকে এক সময়ে...

খবরগুলো নিয়ে একটু নাড়াঘাঁটা করল মিতিন। তারপর বিকেল নাগাদ অভিযানে নেমে পড়ল। প্রথমে ভাস্করের বাড়ি।

চিনতে বিশেষ অসুবিধে হল না। হাজরা রোডের ওপরই দোতলা বাড়ি। পুরনো, তবে জরাজীর্ণ নয়, সদ্য রঙও করা হয়েছে।

দরজা হাট করে খোলা। সামনেই বৈঠকখানা ঘর, সেখানে জনা পাঁচ ছয় যুবক কথা বলছে উচ্চৈঃস্বরে।

মিতিন দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল,—ভাস্করবাবু আছেন?

এক ত্রিশ বত্রিশের সুদর্শন যুবক উঠে এল,—বলুন। আমিই ভাস্কর।

—আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। পারসোনাল।

ভুরু কুঁচকে মিতিনকে দু এক সেকেন্ড দেখল ভাস্কর। তারপর ভেতর দিকে হাত দেখিয়ে বলল,—আসুন।...আমি আগে এদের সঙ্গে কথাটা সেরে নিই।

কোণের গদিঅলা চেয়ারে বসল মিতিন। ভাস্কর যুবকদের সঙ্গে কথা বলছে আবার, তবে তার স্বর আর তেমন উচ্চ নয়। পাড়ার পুজো নিয়ে আলোচনা চলছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ হঠাৎ মিতিনের দিকে দৃষ্টি চলে আসছে ভাস্করের। অস্বস্তিকর চাউনি, তবু চোখ সরাচ্ছিল না মিতিন। মাঝে মাঝে আলগা চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল চারদিকে। দেওয়ালে অজস্র ছবি। প্রায় ছবিতেই ভাস্কর, কোনও না কোনও মন্ত্রীর সঙ্গে। একটা মা কালীর ছবিও ঝুলছে, পাশে কোনও এক গেরুয়াধারী বাবা। দুটো ফ্রেমেই টাটকা জবার মালা।

মিনিট দশেকের মধ্যে ছেলেগুলো উঠে গেল। একজন দরজা থেকে বলল,—তা হলে ভাস্করদা, আমরা লাইটের লোককে কিন্তু অ্যাডভান্স করছি না?

—দরকার নেই। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দে।

ঘর ফাঁকা হতে ভাস্কর আবার সোফায় এসে বসল। মুখে ঈষৎ হাসি মাখিয়ে বলল,—ইয়েস ম্যাডাম? বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি?

মিতিন হাসল না। কেজো গলায় বলল,—আমি বিদিশার কাছ থেকে আসছি। আমি বিদিশার বন্ধু।

হাসিটা থমকে গেল। তারপর ধীরে ধীরে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে,—কে বিদিশা?...আপনি কোন বিদিশার কথা বলছেন?

—আমি অর্চিষ্মান রুদ্রর স্ত্রীর কথা বলছি।

—ও। অর্চিষ্মান রুদ্র! আই মিন অকশনিয়ার!...হ্যাঁ, বলুন।

—আপনার সঙ্গে বিদিশার কয়েক দিন আগে দেখা হয়েছিল?

—হ্যাঁ। হয়েছিল। পূষনবাবু...পূষন রায়ের মেয়ের জন্মদিনে। কেন বলুন তো?

মিতিন ভাস্করের চোখে চোখ রেখে বলল,—বিদিশাকে কেউ একজন ফোনে ভয় দেখাচ্ছে। বিদিশার ধারণা ওটা আপনি।

ক্ষণিকের জন্য চোখে মুখে একটা অবিশ্বাস ফুটে উঠল ভাস্করের। পরক্ষণেই হো হো হেসে উঠেছে,—আমি? আমি বিদিশাকে ভয় দেখাব? কেন?

—কারণটা আপনিই ভাল জানেন।

—না। জানি না।

—আপনার সঙ্গে বিদিশার পূর্ব পরিচয় ছিল, অস্বীকার করতে পারেন?

—কেন অস্বীকার করব? কিন্তু সেটা তো একটা ক্লোজড চ্যাপটার। বহুকাল আগেই চুকে বুকে গেছে।...আপনার বান্ধবীর ওপর আমার আর কণামাত্র আকর্ষণ নেই। হ্যাঁ...সেদিন অবশ্য আমি বিদিশাকে দেখে অবাক হয়েছিলাম। ভাবতেও পারিনি বিদিশার মতো একটা মেয়ে ওরকম একটা জম্পেশ হাজব্যান্ড জুটিয়ে ফেলেছে।

—বিদিশার মতো মেয়ে বলছেন কেন? বিদিশা কীসে কম?

—আপনার বন্ধুর সম্পর্কে আজে বাজে কমেন্ট করলে কি আপনার শুনতে ভাল লাগবে?...অত্যন্ত চিপ টাইপের মেয়ে।

মিতিন চোখের কোণ দিয়ে তাকাল,—আপনিও এমন কিছু দামি মানুষ নন!

মিতিন ভেবেছিল মন্তব্যটায় উত্তেজিত হয়ে পড়বে ভাস্কর। কিন্তু ভাস্কর সেদিকে গেলই না। মুচকি মুচকি হাসছে। সিগারেট দেশলাই বের করল পকেট থেকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে ধরাল না। কপাল নাচিয়ে বলল,—কেসটা কী খুলে বলুন তো দেখি?

—একবার তো বললাম। সামওয়ান ইজ থ্রেটনিং হার।

—ঠিক আছে, ধরুন আমিই থ্রেট করছি। দেন?

—তা হলে বিদিশা পুলিশে খবর দিতে বাধ্য হবে।

—দিক। তা না করে আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে কেন? আবার জোরে হেসে উঠল ভাস্কর। হাসতে হাসতেই বলল,—আপনি কি শিওর আপনার বন্ধুকে কেউ ফোন করছে? মানে সত্যি সত্যি করছে?

—কেন? এ কথা বলছেন কেন?

—আমার তো মনে হচ্ছে, বিদিশা আমার সঙ্গে আবার রিলেশান তৈরি করতে চায়।

পূষনবাবুর পার্টিতে ওর হাবভাব দেখে আমি আঁচ করেছিলাম। আমাকে না চেনার ভান করছে, ওদিকে আবার ঘুরে ঘুরে আমাকেই দেখছে...। ভাস্কর ফস করে সিগারেট ধরাল,—আপনাকে দূত করে পাঠায়নি তো?

লোকটার তো নিজের সম্পর্কে ভারী অহংকার? ঘুরপথে ক্ষমতা এসে গেলে এরকমই হয়, মানুষকে তখন আর মানুষ জ্ঞান করতে ইচ্ছে করে না।

ভাস্কর আবার বলল,—ও কি আর্চিম্যান রুদ্রকে নিয়ে হ্যাপি নয়? অবশ্য না হওয়ারই কথা।...যা একখানা চিজ!

—কেন? তিনি কী করেছেন?

—হেলি ক্ষিচুয়। পিপড়ের পেট টিপে মধু খাওয়া পার্টি। তারপর আবার সন্দেহবাতিক। ভাস্কর লম্বা ধোঁয়া ছাড়ল,—কিছুদিন আগে বার নিয়ে একটা ট্যাক্সের কেসে ফেঁসেছিল। পূষনবাবু...মানে ওর দিদির হাজব্যান্ড নিয়ে এসেছিল আমার কাছে। আমি সামহাউ ম্যানেজ করে দিই। তখনই দেখেছি দু পয়সা বের করতে চায় না, সর্ব সময়ে ধারণা লোকে ওকে স্কুইজ করছে, সারাক্ষণ মুখটা ভেটকে আছে...কোনও সুন্দরী মেয়ে ওকে টলারেট করতে পারবে না।

—পূষনবাবুর সঙ্গে আপনার কদ্দিনের পরিচয়?

—কত আর, মাস পাঁচ ছয়।

—ব্যবসার সূত্রে?

—ওই আর কি। চালাই ঘরের মালিকরা মিলে একটা পার্টি দিয়েছিল। গভর্নমেন্টের দু চার জন ছিল, আমরাও কয়েক জন ছিলাম...

—পূষনবাবু লোক কেমন?

—আর্চিম্যান রুদ্রর চেয়ে ঢের ভাল। অনেক খোলামেলা। হেডে ব্রেন একটু কম হয়...

—মানে বোকা?

—বোকাই তো। একতরফা শ্যালকের জন্য করে যায়, শ্যালক কিন্তু তার কোনও ক্রাইসিসেই ফিরে তাকায় না। বলতে বলতে দুম করে থেমে গেল ভাস্কর,—এই দাঁড়ান, দাঁড়ান।...আপনি এত প্রশ্ন করছেন কেন বলুন তো? আপনি কি গোয়েন্দা নাকি?

মিতিন হাসল,—আমি বিদিশার ওয়েলউইশার। বন্ধু।

একটুক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে মিতিনকে দেখল ভাস্কর। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল,—যেই হোন, আমার কিছু যায় আসে না। একটা কথা আবার আপনাকে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি, বিদিশার ব্যাপারে আমার আর কোনও ইন্টারেস্ট নেই। আর্চিম্যান রুদ্রর সঙ্গে আমার কিছু কাজকারবারের কথা চলছে, বিদিশার পাল্লায় পড়ে আমি তা নষ্ট হতে দিতে রাজি নই।...আপনার আর কিছু জানার আছে?

—নাহ্। মিতিন উঠে পড়ল,—ফোনের ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি। বিদিশা সত্যিই খুব আপসেট হয়ে আছে।

—তো?

—আশা করি আমাদের এই মিটিংটা গোপন রাখবেন।

—কেন?

—কারণ আপনার এককালের বান্ধবী তাই চায়। আপনাকে সে এ ব্যাপারে রিকোয়েস্ট করতে বলেছে।

ভাস্কর আবার হা হা হেসে উঠল,—তার মানে আপনাদের সন্দেহের তালিকা থেকে আমায় বাদ দিয়ে দিলেন, তাই তো?

মিতিন উত্তর দিল না। সামান্য হেসে দরজার দিকে এগোল। ভাস্করও সঙ্গে সঙ্গে এসেছে,—আপনার নামটা তো জানা হল না?

—মিতিন। মিতিন মুখার্জি।

—সুইট নেম। ভাস্কর জিভ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করল। চাপা স্বরে বলল,—আপনার চেহারাটাও অ্যাট্রাকটিভ। আমাদের কি আর একদিন দেখা হতে পারে না?

মিতিন এবার সত্যি সত্যি হেসে ফেলল,—নিশ্চয় পারে। বর আর ছেলেকে নিয়ে আসব একদিন। পুজোর সময়। বাই।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল মিতিন। ভাস্কর চ্যাটার্জি লোকটা কী! যার সঙ্গে একটা সময়ে চুটিয়ে প্রেম করেছে, হতে পারে অপরিণত ভালবাসা, তার সম্পর্কে কী অদ্ভুত রকম উদাসীন! হয় লোকটা খুবই লুচ্চা টাইপ, নয় ঝানু ক্রিমিনাল। রাজনীতির লোকদের সঙ্গে অবশ্য ঝানু ক্রিমিনালদের খুব তফাত নেই।

বাসস্টপে এসে মিতিন ঘড়ি দেখল। সওয়া পাঁচটা। কালীঘাট পার্ক এখান থেকে খুবই কাছে, কিন্তু এখন গিয়ে কোনও লাভ নেই। এই দু আড়াই ঘণ্টা সময় এখন কীকরবে মিতিন? ঝট করে একবার বাপের বাড়ি ঘুরে আসবে? বেহালা যেতে আসতে কতক্ষণই বা লাগে! থাক, এ সপ্তাহে কোথ্থাও যাওয়া নয়। বিদিশা এপিসোডের সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত মিতিনের শান্তি নেই।

বিদ্যুৎঝলকের মতো একটা চিন্তা উঁকি দিয়ে গেল মাথায়। আর একবার ঘড়ি দেখে নিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল মিতিন। ছটার মধ্যে পৌঁছে গেছে ফুলবাগান। ঠিকানাটা মুখস্থই ছিল, জিজ্ঞেস করে করে সোজা রবির বাড়ি।

সন্ধে নেমে গেছে, আলো জ্বলছে রবির ঘরে। বাইরে থেকে মিতিন শুনতে পেল টিভি চলছে। টিভির আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা যায় এক মহিলার গলা, খুব বকাবকি করছে মেয়েকে।

সরু গলির এক পাশ দিয়ে কাঁচা নর্মদা, ভকভক পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। নাকে আঁচল চেপে মিতিন ডাকল,—রবি? রবি আছ নাকি?

মহিলার স্বর থেমে গেল। ফালি দালানে বেরিয়ে এসেছে। সে প্রশ্ন করার আগেই মিতিন বলল,—রবি ফিরেছে কাজ থেকে?

দেবলা দ্রুত দু দিকে মাথা নাড়ল,—না তো। কেন?

—রবি আমাকে বলেছিল একটা ভাল ড্রাইভার জোগাড় করে দেবে...

—সে তো এখানে নেই।

—কোথায় গেল?

উত্তর দিতে ইতস্তত করছে দেবলা। একটা বছর দশেকের মেয়ে বেরিয়ে এসেছে ঘর

থেকে, তার দিকে কড়া চোখে তাকাল, মেয়েটা সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল ভেতরে।

মিতিনের বুক থেকে স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। যা আন্দাজ করেছিল তাই, গা ঢাকাই দিতে হয়েছে রবিকে। অর্থাৎ বাক্স চুরির ঘটনাটা কোনও ভাবেই আকস্মিক নয়।

বৃথা আর প্রশ্নে গেল না মিতিন। আলগা ভাবে বলল,—রবি এলে তুমি তা হলে একটু বলে দিয়ো, দিদিমণি ড্রাইভারের জন্য এসেছিল।

দেবলা ঘাড় নাড়ল।

সরে এল মিতিন। হাঁটতে হাঁটতে ফুলবাগানের মোড়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা রোল খেল, ফুটপাথের দোকান থেকে এক গ্লাস কালো চা'ও। চনচনে খিদেটা মিটতে পাশের বুথ থেকে বাড়িতে ফোন করা চেষ্টা করল কয়েক বার। লাইন পাওয়া যাচ্ছে না। পার্থ কি ফিরে কোনও বন্ধুর সঙ্গে টেলিফোনিক আড্ডা জুড়ল? অসম্ভব নয়। মেয়েদের চেয়েও বেশিক্ষণ পার্থ গল্প করে ফোনে, জানে মিতিন।

আবার ট্যাক্সি ধরে হাজরা ফিরতে আটটা। কালীঘাট পার্কের পিছনের রাস্তাটায় পুজোর প্যান্ডেল বাঁধার কাজ চলছে, সামনে দাঁড়িয়ে গুলতানি করছে ছেলেরা, তাদের কাছে মিহিরের নাম ঠিকানাটা একবার যাচাই করে নিল মিতিন। তারপর একতলা বাড়িটার দরজায় এসে কড়া নাড়ছে।

দরজা খুলেছেন এক প্রৌঢ়—কাকে চাই?

—মিহিরবাবু কি ফিরেছেন?

—এই তো ঢুকল।...আপনি?

—আমি মিসেস মুখার্জি। মিহিরবাবুর অফিসকলিগ্।

—ও, আসুন আসুন...

মিতিন ঢুকল না। ব্যস্ত ভাব ফুটিয়ে বলল,—বসব না, এক্ষুনি চলে যাব। কাইন্ডলি একটু ডেকে দিন না।

ভদ্রলোক ভেতরে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই মিহিরের আবির্ভাব। সন্দিগ্ধ চোখে দেখছে মিতিনকে,—আমাকে খুঁজছেন আপনি?

—আপনিই তো মিহির সরকার?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ...

মিতিন চাপা স্বরে বলল,—বিদিশাকে মনে আছে? আমি বিদিশার কাছ থেকে আসছি।

চকিতে একবার পিছনে তাকিয়ে নিল মিহির,—হঠাৎ? কী ব্যাপার?

—এখানে বলব? না বাইরে আসবেন?

মিহির স্পষ্টতই নার্ভাস। আর একবার ঘুরে ভেতরটা দেখে নিল,—চার্চটার সামনে যান, আমি আসছি।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গ্রিক চার্চের গেটে এসেছে মিহির। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। উত্তেজিত ভাবে বলল,—আমাকে আবার কী দরকার পড়ল বিদিশার?

মিতিন গম্ভীর মুখে বলল,—আপনি নিশ্চয়ই জানেন বিদিশার বিয়ে হয়ে গেছে?

—শুনেছি!

—খুব বড়লোকের বাড়ি বিয়ে হয়েছে বিদিশার।

—হুঁ। মিহির সামান্য রুক্ষ হল,—আপনার প্রয়োজনটা বলুন।

ঝটপট কথাগুলো সাজিয়ে নিল মিতিন,—দেখুন, আমার বন্ধু এখন ওয়েল সেটলড্। সে আর অতীতের স্মৃতিগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখতে চায় না। নিশ্চয় কারণটা বুঝতে পারছেন?

মিহিরের মুখে কোনও প্রতিক্রিয়াই ফুটল না। নীরস স্বরে বলল,—আমি কী করতে পারি?

—আপনার কাছে ওর কিছু চিঠি আছে, কয়েকটা ফটোও। যদি কাইন্ডলি সেগুলো ফেরত দিয়ে দ্যান...

—ফটো? চিঠি? রসিকতা করতে এসেছেন আমার সঙ্গে? আপনার বন্ধু তো কবেই সব ফেরত নিয়ে গেছে।

একবার মিতিনের চমকানোর পালা,—বিদিশা নিয়ে গেছে? কবে?

—স্ট্রেঞ্জ! নিজেই দাদাকে পাঠিয়ে সব নিয়ে গেল...দাদা এসে কত কাকুতি মিনতি, ওগুলো দিয়ে দিন, একটা বড় জায়গায় বোনের বিয়ের কথা চলছে...! এই তো গত বছর পুজোর ঠিক পর পর দাদাটা এসেছিল।

মিতিন অস্ফুটে বলল,—দাদা এসেছিল? মানে চিত্রভানু?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই রকমই তো কী একটা নাম বলল! আমিও ভেবে দেখলাম, ওই মেয়ের চিঠি রেখে আমি আর কী করব...! মিহির চোখ সরু করল,—খুব ভাবনায় পড়ে গেলেন মনে হচ্ছে? চিঠিগুলো কি তা হলে বিদিশার হাতে পৌঁছয়নি? নাকি আপনার বন্ধু আবার নতুন কোনও খেলা খেলতে চাইছে?

মিতিনের যেন কানেই গেল না কথাটা। বলল,—আপনি শিওর বিদিশার দাদাই এসেছিল?

—তা ছাড়া আর কে আসবে? কার না কার একটা সাদা অ্যাম্বাসাডার নিয়ে এসেছিল...

—সাদা অ্যাম্বাসাডার? মিতিন আবার হোঁচট খেল,—সঙ্গে আর কেউ ছিল?

—নাহ্, নিজেই তো চালাচ্ছিল গাড়ি।

—ও। মিতিন বিড়বিড় করে বলল,—তা হলে বোধহয় কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। সরি, আপনাকে মিছিমিছি ডিসটার্ব করলাম।

—ঠিক আছে, কাইন্ডলি আর আমার কাছে আসবেন না। আমি একটা যথেষ্ট সম্মানিত জীবন যাপন করছি, আপনার বন্ধুর ব্যাপারে নতুন করে জড়ানোর আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।

চিন্তিত মুখে বাড়ি ফিরল মিতিন। ঘরে ঢুকতেই পার্থ ঘোষণা করল,—তোমার অর্চিষ্মান রুদ্রর ফোন এসেছিল।

বুমবুম পার্থর কাছে বসে কার্সিভ লেটার লেখা শিখছে। ছেলের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে মিতিন জিজ্ঞাসা করল,—কী বললেন মিস্টার রুদ্র?

—রবির ব্যাপারে কোনও খোঁজখবর পেলে কি না জানতে চাইছিল।

—আর?

—আর কিছু তো বলল না।

—তার মানে ব্ল্যাকমেলারের ফোন এখনও আসেনি?

—সত্যি, আর মাত্র চার দিন বাকি, কোথায় টাকাটা দিতে হবে জানাচ্ছে না তো?

—জানাবে। ঠিক জানিয়ে দেবে। মিতিন খাটে গিয়ে বসল,—একটা কাজ আছে। কাল দুপুরে তোমায় একবার আমার সঙ্গে বেরোতে হবে।

—কী কাজ?

—বলছি। আগে এক গ্লাস জল তো খেয়ে নিতে দাও।

[নয়]

ভরদুপুরে হিমায়িত পানশালা এখন জমজমাট। মদিরার উগ্র ঝাঁঝে বন্ধ কক্ষের বাতাস ম ম। সমবেত সংলাপ গুঞ্জন হয়ে ভাসছে হাওয়ায়, গ্লাসে-গ্লাসে শব্দ বাজছে টুং টাং। স্তিমিত আলোয় কারুর মুখ এখানে স্পষ্ট দেখা যায় না, নির্মিত হয়েছে এক রহস্যময় আবছায়া। বাজনাও চলছে নিচু গ্রামে। একটানা। ঢিমে লয়ে। অদ্ভুত এক ঝিম ধরানো সুর।

কোণের টেবিলে এই মাত্র বিয়ারের বোতল শেষ, চিত্রভানুর পানপাত্রে এখন টলটলে করছে হুইস্কি। পার্থ অবশ্য এখনও বিয়ারেই পড়ে, মিতিনের সামনে সোডা মেশানো ফ্রেশ লাইম। পার্থ হাত মুখ নেড়ে কাল্পনিক টিভি সিরিয়ালের কাহিনী বানিয়ে চলেছে, ঘোর লাগা চোখে শুনছে চিত্রভানু।

চিত্রভানুর পরনে আজ টুকটুকে লাল শার্ট। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। মুখেও বেজায় গদগদ ভাব। সিরিয়ালওয়ালারা তাকে বাড়ি থেকে তুলে এনে ঘরে বসিয়ে মদ খাওয়াচ্ছে, তার জীবনে এ এক দুর্লভ ঘটনা। যেন স্বপ্ন স্বপ্ন লাগে।

পার্থ একটু থামতেই চিত্রভানু জড়ানো গলায় বলে উঠল,—আমাকে আপনি সত্যিই রোলটা দিচ্ছেন তো?

—এখনও সন্দেহ আছে? আরে মশাই, আপনাকে তো আমি ব্রেক দিচ্ছি একটা। একেবারে হিরোর প্যারালাল রোল।

—আসলে কী জানেন? আপনার চেহারাটা সুপ্রকাশের খুব পছন্দ হয়ে গেছে। মিতিন আর একটু উসকে দিল,—আপনি তো ঠিক চকোলেটবয় হিরো টাইপ নন, আপনার মধ্যে একটা অ্যারোগ্যান্স মানে ঔদ্ধত্য আছে।

—এই ঔদ্ধত্যটাই আমি এনক্যাশ করতে চাই। পার্থ সিগারেট ধরাল। কায়দা করে গোল গোল ধোঁয়া ছাড়ছে,—অ্যাক্টিংটা কিন্তু আপনাকে খুব ভাল ভাবে করতে হবে।

—আমি জান লড়িয়ে দেব সুপ্রকাশদা। বড় চুমুকে পাত্র শেষ করল চিত্রভানু,—দেখবেন, আমি আপনাদের মোটেই ডোবাব না।

—দ্যাটস দা স্পিরিট। পার্থ কাম সুপ্রকাশ বিয়ারের গ্লাস টেবিলে নামাল,—আমার সিরিয়ালে বেশ কয়েকটা অ্যাকশান সিন আছে। আপনাকে ছোটখাটো স্টান্টও কিন্তু

করতে হবে।

—ঝাড়পিট? ও আমি খুব পারব।

—পদ্মপুকুর ঝাড়পিট কিন্তু অন্য রকম। সবটাই ফল্‌স, তবু রিস্ক থাকে। পার্থ হাসল,—সুইমিং টুইমিং জানেন?

—পদ্মপুকুরে শিখেছিলাম। অবশ্য বহুকাল জলে নামিনি।

—ড্রাইভিং?

—শিখে নেব। আপনাদের শুটিং তো আর কালই শুরু হচ্ছে না।

মিতিন-পার্থ চোখচোখি হল। মিতিন জিজ্ঞাসা করল,—একদম গাড়ি চালাতে জানেন না?

—আমার তো আর গাড়িঅলা শ্বশুর নেই।...এক বন্ধুর গাড়ির ক্লাচ গিয়ার নিয়ে কদিন ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলাম, ব্যস ওই টুকুনই। তবে শিখতে সময় লাগবে না, এ আমি গ্যারান্টি দিতে পারি।

—কী গাড়ি ছিল আপনার বন্ধুর? অ্যাম্বাসাডার?

—না, ফিয়াট। ইটালিয়ান। বহুৎ পুরনো। বন্ধুর ঠিক নয়, বন্ধু বাবার গাড়ি।

—ও।

মিতিন চুপ হয়ে গেল। কাল মিহিরের বাড়ি থেকে ফিরে অনেক ভেবেছে যে। কোনই কূলকিনারা পাচ্ছিল না। সন্দেহের তির এখন অনিবার্যভাবে চিত্রভানুর দিকেই ছুটে যায়, তবু মন যেন কিছুতেই সায় দিতে চায় না। বার বার মনে হয় কোথাও যেন একটা বড়সড় ফাঁকি রয়ে গেছে। কেউ একটা চতুর খেলা খেলছে মাঝখানে, মিতিন ঠিক ধরতে পারছে না খেলাটা। এখানে বসে, এই মুহূর্তে, সংশয়টা গাঢ়তর হচ্ছে আরও। অন্য কেউ নাম ভাঁড়িয়ে গিয়েছিল মিহিরের কাছে? কে সে?

পার্থ বেয়ারাকে ডেকে আবার হুইস্কি দিতে বলল চিত্রভানুকে। আজ পার্থর এটাই কাজ। চিত্রভানুকে পুরোপুরি মাতাল করে দেওয়া।

তা সেই পথে এগিয়েছেও চিত্রভানু। বিয়ার আর হুইস্কির মিশেলে তার এখন রীতিমতো তুরীয় দশা। আপন মনে মাথা দোলাচ্ছে, বোকা বোকা মুখে হাসছে অকারণে, ঢুলঢুলু চোখে দেখছে এপাশ ওপাশ।

মিতিন তাল বুঝে কথা পাড়ল,—আচ্ছা, আপনি মিহির সরকার বলে কাউকে চেনেন?

—কে মিহির? কোথাকার মিহির?

—আমাদের সিরিয়ালে অ্যাক্টিং করছে।...সে নাকি একসময়ে বিদিশার খুব বন্ধু ছিল। কালীঘাট পার্কের দিকে থাকে...

—অ, সেই মিহির! সাবান কোম্পানির ফিরিঅলা!

—ও, তার মানে আপনি চেনেন? মানে পরিচয় আছে আপনার সঙ্গে?

—দূর, বুলুর আশিকদের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকতে যাবে কেন? আমি তো শুধু শালাদের ঠিকুজিগুলো জেনে রাখতাম। বোনটি আমার কোথায় কখন কী বাধিয়ে বসে...! আপনার বন্ধুর তো কেচ্ছা কম ছিল না।

—হ্যাঁ, স্কুলেও ও একটু উড়ুউড়ু ছিল বটে। মিতিন কাম চন্দ্রিমা ধরতাই দিল।

—সে সব মজনু কোথায় ফুটে গেছে। হা হা হা হা। বুলুর ভালবাসা হল পোলট্রিঅলাদের মুরগি পোষা। দানা খাওয়াচ্ছে, দানা খাওয়াচ্ছে, হঠাৎ কুচ করে একদিন গলাটা কেটে নিল।

মিতিন হাসতে হাসতে মাথা দোলাল,—দাদা হয়ে কিন্তু বোনের এত কুৎসা গাওয়া আপনার শোভা পায় না।

—হ্যাহ্, দাদা! বোন যেন দাদাকে কত সম্মান করে! উল্টো ট্যাঁকে গোঁজে, বুঝলেন? চিরটাকাল...। চিত্রভানুর গলা চড়তে চড়তে কেমন ছেতরে গেল,—কেন জানেন? ওই বাবা মা...। সারাক্ষণ দুজনে খালি মেয়ে নিয়ে নাচছে। মেয়ে যাই করুক, সাত খুন মাপ। আর ছেলের পান থেকে চুন খসলেই খিস্তি।

—তা, বিদিশাই তো জিতল শেষ পর্যন্ত! কত বড় ঘরে তার বিয়ে হয়েছে!

—বড় ঘর না ছাই, বলুন চামারের ঘর। ব্যাগে টাকা নিয়ে ফুটানি মারতে পারলেই কি সব হল? বুলুর কোনও স্বাধীনতা আছে ওখানে? জানেন, বিয়ের পর একটা রাত বাপের বাড়ি কাটানোর পারমিশান পায়নি বুলু? নিজে গাড়ি হাঁকিয়ে আসে ঠিকই, কিন্তু থাকার হুকুম থাকে কতক্ষণ? চিত্রভানু আঙুল নাচাল,—জানেন, বাবাকে আমি বিয়ের আগেই বলেছিলাম তোমার উড-বি জামায়ের টেম্পার ভাল নয়, আমি জানি। শুনে বাপ কী বলল জানেন? বলল, অ্যাই শালা কুলাঙ্গার, চুপ যা। যাদের পয়সা আছে, তাদের টেম্পার থাকবে, এতে তোর কী রে? এখন ঠ্যালা বোঝ, জামাইয়ের পয়সার গরমে গর্তে ঢুকে বসে থাকো।...দেখলেন না, মেয়ের ঠিকানা পর্যন্ত দেওয়ার মুরোদ নেই?

মিতিন টানটান হল,—আপনি অর্চিষ্মান রুদ্রকে আগে থেকেই চিনতেন নাকি?

—চিনতামও বটে, চিনতাম নাও বটে।

—সেটা কী রকম?

—আমার এক দোস্তের মুখে ওর নাম শুনেছি। সে ওই নিলামঘরে কাজ করত। চিত্রভানু ঢক করে খানিকটা তরল ঢেলে নিল গলায়। ঠোঁট কাঁপছে,—ওই শালা অর্চিষ্মান বিনা দোষে আমার বন্ধু সোনাদাকে তাড়িয়েছিল।

—ও। তার মানে আপনার সোনাদাই আপনাকে অর্চিষ্মানের গল্পো বলেছে?

—ইয়েস। সোনাদা আমার গ্রেট ফ্রেন্ড। আমার গুরু। কী দেবতুল্য লোক, আহা! নিজে মিষ্টি খায় না, আমায় মিষ্টি খাওয়ায়। নিজে মাল খায় না, আমায় মাল খাওয়ায়! ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে সোনাদার। জানেন, সোনাদার টিপ্‌সে খেলে কত বার আমি ঘোড়ার মাঠে জিতেছি!

চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল মিতিনের, হাঁটু দিয়ে ঠেলল পার্থকে। পার্থ তড়িঘড়ি প্রশ্ন করে উঠল,—তা ভাই, আপনার এই সোনাদাটির ভাল নাম কি?

—ভাল নাম! হা হা হা। চিত্রভানু হাত ওল্টাল,—সোনাকে যে নামেই ডাকুন, সোনা তো সোনাই থাকবে।

দ্রব্যগুণে প্রায় শেক্‌সপিয়ার বনে গেছে চিত্রভানু। পার্থ আবার জিজ্ঞাসা করল,—সোনাদা কি আপনার পাড়ার বন্ধু?

—উহুঁ, স্বর্গ থেকে খসে পড়া বন্ধু। গত বছর মনসুন রেসের সময় মাঠে আমার রুপিয়া ফুড়ুৎ হয়ে গিয়েছিল, ওই সোনাদাই কোত্থেকে দেবদূতের মতো এসে...। নিজে টাকা ধার দিয়ে কুইনেলা খেলতে বলল...জানেন, সেদিন আমি দুশো তেতাল্লিশ টাকা জিতে ফিরেছিলাম।

—আপনার সোনাদা থাকেন কোথায়?

—ওই নর্থের দিকে। হেদোর কাছে কোথায় যেন। বলেই চিত্রভানু পার্থর হাত জড়িয়ে ধরেছে,—অ্যাই সুপ্রকাশদা, সোনাদার কথা ছাড়ুন না। আমার কথা বলুন। হবে তো আমাকে দিয়ে?

পার্থ পিঠ চাপড়াল চিত্রভানুর,—হবে না মানে? আপনার জোরেই তো সিরিয়াল দাঁড়াবে।

—আমি ফাটিয়ে দেব, দেখবেন। ...দুনিয়াকে দেখিয়ে দেব আমিও কামাতে পারি। ওই আপনাদের বিদিশা অনেক বড় বড় কথা শোনায় আমাকে।

বলতে বলতে স্বর ডুবে যাচ্ছে চিত্রভানুর, শরীর এলিয়ে পড়ছে। আর একটা হুইস্কি দিয়ে গিয়েছিল বেয়ারা, সেটাও পলকে শেষ। চোখ আর খুলে রাখার ক্ষমতা নেই, আধবোজা চোখে কী যেন বিড়বিড় করে চলেছে। তারই মধ্যে গ্লাস ঠুকছে টেবিলে, আরও পানীয় চাই।

মিতিন ফিসফিস করে পার্থকে বলল,—পুরো আউট, এবার একে সামলানো মুশকিল হবে। পকেটে ভাড়া গুঁজে দিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে দিই চলো।

চিত্রভানুকে নিয়ে বার থেকে বেরোল পার্থ-মিতিন। ঠিকঠাক ছেলেটাকে চালান করে দিয়ে নিজেরাও ট্যাক্সি ধরেছে একটা। বাড়ি ফিরছে।

বিয়ারের প্রভাবে পার্থরও এখন বেশ ফুরফুরে মেজাজ। মিতিনের পিঠে হাত ছড়িয়ে দিয়ে বলল,—কী, অপারেশন সাকসেসফুল তো?

—মোটামুটি।

—মোটামুটি কেন? দারুণ সব ইনফরমেশন পেয়ে গেলে।

—হুঁ।

—চিত্রভানু যে মিহিরের কাছে যায়নি...

—এটা এখনও জোর দিয়ে বলতে পারো না। মিহিরকে চিত্রভানুর ছবিটা দেখিয়ে ভেরিফাই করে নিতে হবে। ইমিডিয়েটলি।

—আর ওই সোনাকে ট্রেস করবে কোথায়?

—দেখি। অনেকেরই এখন ভাল করে খোঁজ করা দরকার।

—একটা লোককে তুমি কিন্তু চোখ বুজে বাদ দিয়ে দিতে পারো।

—কে?

—বিদিশার বাবা। খোঁজ নিয়ে তো দেখেছি, লোকটা একটু বড়বড় করতে ভালবাসে বটে, বেসিকালি কিন্তু খারাপ নয়। সাধারণ দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ। তা ছাড়া লোকটা ভালই স্টেজ অ্যাক্টিং করে। বুঝতেই পারছ, স্টেজে যারা ভাল অভিনয় করে, তারা রিয়েল লাইফে অ্যাক্টিং করতে পারে না। যেমন রিয়েল লাইফে যারা ভাল অভিনয়

করে, তারা স্টেজে একেবারে মিসফিট।

—তাই কি?

বলেই মিতিন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। পার্থও চোখ ঘুরিয়েছে বাইরে। শরতের বিকেল দেখছে। পথেঘাটে খুশি খুশি আলো, মানুষের মুখে আনন্দের আস্তরণ, পুজো বুঝি সত্যিই এসে গেল।

পার্থ বাসস্ট্যান্ডে নেমে পড়ল, কোন এক বন্ধুর বাড়ি যাবে। মিতিন বাড়ি এসে দেখল বিমলা বুমবুম দুজনেই সেজেগুজে তৈরি, বেরনোর জন্য ছটফট করছে।

মিতিন চা খাওয়ার কথা বলতেই বিমলার মুখ হাঁড়ি, ঢুকল রান্নাঘরে।

রান্নাঘর থেকেই বলল হঠাৎ,—তোমার অনেকবার ফোন এসেছিল গো বউদি। সেই দিদিমণি যে সেদিন তোমার কাছে এসে কাঁদছিল। কত বার যে করেছে...

মিতিনের ভুরু কুঁচকে গেল,—কখন থেকে করছে?

—অনেকক্ষণ। সেই দুপুর দুটো আড়াইটে থেকে। চার পাঁচবার তো করেছেই।

দ্রুত হাতে টেলিফোনের বোতাম টিপল মিতিন। তার গলা পেয়েই ওপার থেকে বিদিশার আর্ত স্বর উড়ে এসেছে,—আমার খুব ভয় করছে দিদি।

—কেন, কী হল?

—আপনি শিগগির একবার আসুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

—আঃ, কী হয়েছে বলবে তো? লোকটার ফোন এসেছিল?

—না। তার চেয়েও মারাত্মক। বিদিশার স্বর থমকে রইল দু এক সেকেন্ড। তারপর অস্বাভাবিক নেমে গেল,—আজ একটা জিনিস পেয়েছি দিদি।

—কী জিনিস?

—আপনি ভাবতেও পারবেন না। মনে আছে...বলেছিলাম...অর্ক সেই লোকটার জামার একটা বোতাম ছিঁড়ে নিয়েছিল?

—হ্যাঁ, দেখেছি তো বোতামটা। ...কেন?

—ওই বোতামছেঁড়া শার্টটা আজ বাড়িতেই পেয়েছি। অর্চিষ্মানের পুরনো জামাকাপড়ের ভেতর থেকে।

মিতিনের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল,—কখন পেলে?

—এই দুপুরবেলা। খেয়ে উঠে ওর বাতিল শার্ট-প্যান্টগুলো বার করেছিলাম, তখনই একটা বোতামছেঁড়া শার্ট দেখে কেমন সন্দেহ হল। বোতামটা এনে মিলিয়ে দেখি হ্যাঁ...

—কোথায় ছিল শার্টপ্যান্টগুলো?

—আমাদের শোওয়ার ঘরের পাশে অ্যান্টিরুমে একটা টানা দেরাজ আছে, ওখানে।

—হঠাৎ পুরনো শার্টপ্যান্ট নিয়ে বসেছিলে যে?

—শ্বশুরমশায়ের কয়েকটা চ্যারিটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ আছে। তারাই পুজোর আগে শ্বশুরমশায়ের কাছে পুরনো জামাকাপড় চেয়েছিল। উনি আমায় সকালে বললেন, দ্যাখ বাবলুর যদি কিছু বার করে দিতে পারিস...

—ও, তাই তুমি...! মিতিন একটু ভাবল,—আচ্ছা, শার্টটা ঠিক কোনখানে ছিল?

—দেরাজের নীচের তাকে।

—উঁহু। কী রকম অবস্থায় ছিল? জামাকাপড়ের একদম ওপর দিকে, না মাঝখানে, না তলায়?

—ওপরেই তো ছিল।...একদম ওপরে।

—তুমি কত দিন পর ওই দেরাজ খুলেছ?

—খুলি তো প্রায়ই। ওই নীচের তাকটায় হাত দেওয়া হয় না।

—কেমন করে রাখা ছিল শার্টটা? পাট পাট? না কোঁচকানো মোচকানো?

—এক সাইডে গোঁজা ছিল।

—তুমি যে শার্টপ্যান্টগুলো বার করেছ, বাড়ির কেউ দেখেছে?

—কে দেখবে?

—তোমাদের কাজের লোক? সুমতি পদ্মপাণি...?

—নাহ্।

—শোন, তা হলে আবার নিখুঁতভাবে আগের মতো করে সাজিয়ে শার্টপ্যান্টগুলো তুলে রাখো তাকটায়। আর এটা নিয়ে ভুলেও বরের সঙ্গে আলোচনা কোরো না।

—কিছু বিপদ হবে না তো দিদি?

—না। বিপদ হওয়ার হলে এতদিনে হয়ে যেত। ওটা নিয়ে তুমি আর বেশি ভেব না। কয়েকটা প্রশ্ন করছি, ঠাণ্ডা মাথায় উত্তর দাও।

—বলুন দিদি?

—তোমার গয়নার বাক্স চুরির গল্প তুমি বাপের বাড়ির কাউকে বলেছিলে কখনও? মা বাবা দাদা...?

—নাহ্। বলার সুযোগই হয়নি।

—তোমার বরের দোকান থেকে যে বছর দু আড়াই আগে কয়েকজন লোক ছাঁটাই হয়েছিল। জানো?

—জানি।

—কার কাছ থেকে শুনেছ? মিস্টার রুদ্র?

—না। ও আমাকে অফিসের কথা বলে না। পদ্মপাণির মুখে শুনেছি। পদ্মপাণিই তো এ বাড়ির গেজেট।

—হুঁ। আচ্ছা, তুমি কি বাপের বাড়িতে লোক ছাঁটাইয়ের গল্পটা করেছ কখনও?

—না তো। কেন দিদি? কী হয়েছে?

—সেরকম কিছু না, এমনিই জিজ্ঞেস করছি।...মিহির বলে তোমার যে বয়ফ্রেন্ড ছিল, তার কাছে কি কখনও কাউকে পাঠিয়েছিলে? চিঠি ছবি ফেরত আনতে?

—আমি! কই, না।

—আচ্ছা, ব্ল্যাকমেলারের ফোন তো শনিবারই আসে, তাই না?

—হ্যাঁ। দুপুরবেলা।

—ভাল করে মনে করে দ্যাখো তো, ওই ফোন আসার আগে বা পরে কখনও অর্চিষ্মানের ফোন এসেছিল কিনা?

—না মানে...। বিদিশা একটুক্ষণ চুপ,—প্রথম যেদিন ফোনটা এল, সেদিন অর্চিষ্মান

খুব তাড়াতাড়ি ফিরেছিল। ফোন আসার এক দেড় ঘণ্টার মধ্যেই।...কিন্তু এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন দিদি?

—আরে বাবা, ঘাবড়ানোর কিছু নেই, এগুলো জাস্ট জিজ্ঞাসা।...কাল মিস্টার রুদ্রর নিলামঘর বন্ধ না?

—আজও বন্ধ। তবে ও বারে আছে, ফিরতে রাত হবে।

—নিলামঘর না থাকলে সকালবেলা কটা নাগাদ উনি বারে যান?

—বাড়ি থেকে দশটা সওয়া দশটায় বেরোয়।

—ঠিক আছে, আমি আজ কালের মধ্যে যে কোনও দিন তোমার কাছে যেতে পারি। আর একটা কথা। এখন যে কোনও মোমেন্টে ব্ল্যাকমেলারের ফোন আসবে, তুমি কিন্তু তখন টেপ চালাতে ভুলো না। অ্যান্ড ডোন্ট গেট নার্ভাস।...রাখছি।

ফোন ছেড়ে সোফায় বসল মিতিন। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে, টানল কাপটা। বুমবুম বেরোচ্ছে বিমলার হাত ধরে, ছেলেকে আলগা টেনে কপালে চুমু খেল একটা।

বিমলা দরজা থেকে বলল,—সুভাষদা এসেছিল। তোমার জন্য অফিসঘরে কাগজ রেখে গেছে।

দরজা বন্ধ করে মিতিন স্টাডিতে ঢুকল। যে কটি কাজে পাঠিয়েছিল, সবকটারই পৃথক পৃথক রিপোর্ট সাজিয়ে রেখে গেছে সুভাষ। শেষ তথ্যটিতে চোখ বুলিয়ে হেসে ফেলল মিতিন। নাহ্, ব্ল্যাকমেলারটার রসিকতাবোধ আছে। পাবলিক বুথ থেকেই বিদিশাকে ফোন করেছিল বটে, তবে বুথটা একেবারে লালবাজারের গেটের সামনে।

একেই বলে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা!

[দশ]

ঝড়ের গতিতে সাজগোজ সারছিল মিতিন। সাধারণ একটা প্রিন্টেড সালোয়ার কামিজ পরেছে আজ, কপালে ছোট্ট টিপ লাগিয়েছে, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক। স্নানের সময় চুল ভেজায়নি, খেতে বসার আগে টান টান করে বেঁধে নিয়েছিল, এখন আবার সামনের দিকে চিরুনি বুলিয়ে নিল একবার। হিরো হিরোইন ভিলেন সম্ভাব্য-ভিলেন সকলের ছবিই প্রিন্ট করে এনেছে পার্থ, বেরনোর আগে ছবিগুলো পুরে নিল ঝোলাব্যাগে।

আকাশ আজ একটু মেঘলা মেঘলা। অল্প গুমোট ভাবও আছে, দু চার পশলা বৃষ্টি হওয়া আজ অসম্ভব নয়। ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে মিতিন দেখে নিল ছাতাটা নেওয়া হয়েছে কিনা। নিয়েছে। নিশ্চিন্ত হয়ে মোড়ে এসে ট্যাক্সি ধরল একটা।

রাস্তায় খুচরো জ্যাম। মিতিন অর্চিষ্মানের বারে এসে পৌঁছল প্রায় সাড়ে এগারোটায়। পানশালা এখনও জমেনি, বেশির ভাগ টেবিলই ফাঁকা। অর্চিষ্মান কাউন্টারে ছিল, মিতিনকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে উঠে এসেছে,—ম্যাডাম, আপনি?

—একটা দরকার ছিল।...কয়েকটা নাম অ্যাড্রেস চাই।

—কাদের?

—আপনি দোকান থেকে কয়েকজনকে ছাঁটাই করেছিলেন...

—তাদের নাম ঠিকানা নিয়ে আপনি কী করবেন?

—আপনার দোকানের চুরিটার সঙ্গে ওদের কোনও লিঙ্ক আছে কিনা দেখতে চাই।

অর্চিষ্মান বেশ বিরক্ত,—এর সঙ্গে বিদিশার কেসের কী সম্পর্ক?

—আমি চুরিটা ঠিক হজম করতে পারছি না মিস্টার রুদ্র।

—আমিও আপনার কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। আজ বুধবার, মাঝে মাত্র দুটো দিন, এখন আসল কেস ছেড়ে...টোটালি মিনিংলেস।

মিতিন নীরস মুখে বলল,—আপনার কি দিতে আপত্তি আছে মিস্টার রুদ্র?

অর্চিষ্মান সংযত করেছে নিজেকে। বলল,—নাম তো দিতেই পারি, তবে ঠিকানাগুলো আমার মুখস্থ নেই। নিলামঘর খুলে খাতাপত্র ঘেঁটে দেখতে হবে।

—প্লিজ, যদি একটু দেখেন।

অপ্রসন্ন মুখে বার থেকে বেরিয়ে এল অর্চিষ্মান, পিছন পিছন মিতিনও। নিলামঘরের সামনের দরজায় গেল না অর্চিষ্মান, গলি ঘুরে পিছনের কোলাপসিবল গেট ঝাঁকাচ্ছে।

দারোয়ান উঁকি দিল। মালিককে দেখেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে দরজা খুলেছে।

অফিসঘরের দিকে এগোতে এগোতে অর্চিষ্মান বলল,—আমি কি পাঁচ লাখ টাকাটা রেডি করে রাখব?

মিতিন ঝলক দেখল অর্চিষ্মানকে,—রাখুন।

—টাকাটা তা হলে আমায় দিতেই হচ্ছে?

—আমি তো ফেলও করতে পারি, তার জন্য আপনার প্রস্তুত থাকাই তো উচিত।

—আমিও তাই ভাবছি। আমার স্ত্রীর লাইফের ব্যাপারে আমি কোনও কমপ্রোমাইজ করতে পারব না।

—করা উচিতও নয়। আপনি যখন স্ত্রীকে এত ভালবাসেন...। আপনি খাতাপত্র বার করুন, আমি একটু টয়লেট থেকে আসছি।

বাথরুম অবধি অবশ্য গেল না মিতিন। ছায়ামাখা হলঘরখানার গলিপথ বেয়ে ভাঙা আলমারিটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। টানল পাল্লাটা, বিকট আওয়াজ করে খুলে গেছে। সাধারণ চার থাকের আলমারি, লকারবিহীন। আলমারির গা'টা আস্তে করে ঠুকে দেখল মিতিন, ঠং ঠং আওয়াজ হচ্ছে। জং ধরা তাকে হাত বোলাল, ওপর দিয়ে, নীচ দিয়ে। আবার আঙুল ঠুকছে। নীচের তাকটায় চাড় দিল সামান্য, খুলে গেছে টানা একটা খোপ। হাত চালাল ভেতরে, একখানা আধছেঁড়া কাগজ খাঁজে আটকে আছে। বিবর্ণ। মলিন। হলদেটে। কোনও এক আদিকালের স্ট্যাম্পপেপারের অংশ।

—ওখানে কী খুঁজছেন?

অর্চিষ্মানের ডাক শুনে সচকিত হল মিতিন। কাগজটা বার করে ভরে নিল ঝোলাব্যাগে। দ্রুত অফিসঘরে ফিরল।

মৃদু হেসে বলল, —পুরনো আলমারিটাকে দেখছিলাম। ওটা তো এখনও দিব্যি সারিয়ে নেওয়া যায়।

—ধুস, কী হবে। ভাঙাচোরা জিনিস থাকলে নিলামঘরের একটু শোভা বাড়ে, নইলে

কবে টান মেরে ফেলে দিতাম।

—ওটা কি আপনার বাবার আমলের আলমারি?

—তার আগেরও হতে পারে। অর্চিষ্মান তেমন একটা পাত্তা দিল না,—নিন, লিখে নিন।...যজ্ঞেশ্বর হালদার, একুশের দুয়ের সি চন্দ্রনাথ সিমলাই লেন, কলকাতা-দুই। এটা বোধহয় পাইকপাড়ায়, দু নম্বর বাসস্ট্যান্ডের কাছে।...দ্বিতীয়জন, তপন নন্দী, এগারোর তিন রায়বাগান স্ট্রিট, কলকাতা-ছয়। ওই আপনার স্কটিশ চার্চ স্কুলের কাছাকাছি।...তিন, স্বর্ণেন্দু সামন্ত, ছ নম্বর কালী মিত্তির লেন, ক্যালকাটা-ছয়। এই হেদোর কাছে। চতুর্থজ-নও ওই কাছাকাছিই থাকে। হরিপ্রসাদ সাহা, ফাইভ বাই বি গোয়াবাগান রো।

মিতিন ঝটপট লিখে নিচ্ছিল। মুখ তুলে বলল,—সবই তো দেখছি উত্তর কলকাতার?

—বাবার নর্থের মানুষদের ওপর একটু দুর্বলতা ছিল। সেন্টিমেন্ট। আমি অবশ্য এখন বেশি সাউথের লোকই রাখছি।

মিতিন নোটবইয়ে ঝুঁকল আবার,—আচ্ছা, এদের সকলের বয়স কীরকম?

—হরিপ্রসাদবাবু, যজ্ঞেশ্বরবাবু, দুজনেই সেভেনটি আপ। স্বর্ণেন্দু আর তপনের বয়সটা কম। অ্যারাউন্ড থার্টি থার্টিফাইভ, এগজ্যাক্ট বলতে পারব না।

—চারজনের কি একই গ্রাউন্ডে চাকরি গিয়েছিল?

—নাহ্। হরিপ্রসাদবাবু যজ্ঞেশ্বরবাবু ইনএফিশিয়েন্ট হয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক মতো কাজটাজ আর পারতেন না, ঘন ঘন কামাই করতেন। বাকি দুটো ছিল চোরেরও বেহদ্দ। নিলামের জন্য সাজিয়ে রাখা মাল হাওয়া করে দিচ্ছে...। নিজেরাই বেনামে লোক দাঁড় করিয়ে জলের দরে দামি জিনিস কিনে নিচ্ছে...। বাবার স্নেহভালবাসা ছিল, বাবা স্ট্যান্ড করতে পারত, আমি স্ট্রেট বার করে দিয়েছি। অর্চিষ্মান ফাইল বন্ধ করল,—কটা বছর কাজ করেছে দুজন? বছর সাত আট! তার মধ্যেই যা বাড় বেড়েছিল...!

—হুম। মিতিন ব্যাগ বন্ধ করল।

—আপনি কি এখন এদের বাড়ি বাড়ি ঘুরবেন?

—দেখি।

—আমার গাড়িটা নিয়ে যেতে পারেন। টেম্পোরারিলি একটা ড্রাইভার অ্যাপয়েন্ট করেছি।...বাই দা বাই, রবির ঠিক কী হল বলুন তো?

—ভাবছি।

—কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম, এই সিম্পল চুরির কেসটা নিয়ে এই মুহূর্তে মাথা ঘামিয়ে কিন্তু সময়ের অপচয় করে ফেলছেন।

মিতিন চোখটাকে সার্চলাইট করে অর্চিষ্মানের দিকে ফেলল,—চুরিটা কি সত্যিই আপনার খুব সিম্পল বলে মনে হয় মিস্টার রুদ্র?

অর্চিষ্মান একটু বুঝি অস্বস্তি বোধ করল। আমতা আমতা করে বলল,—তা নয়, তবে...। যাক গে, আপনি যা ভাল বোঝেন করুন। আমি যে এই মুহূর্তে ভীষণ রকম ওরিড, এটাই আপনাকে বলতে চাইছিলাম।

—আমি জানি। মিতিন উঠে দাঁড়াল।

—গাড়িটা নেবেন না?

—থ্যাঙ্ক ইউ। দরকার নেই।

ট্যাক্সিতে বসে নোটবইয়ে আর একবার চোখ বোলাল মিতিন। স্বর্ণেন্দু সামন্ত। এই নামটার সঙ্গে সোনা নামের যোগ থাকার সম্ভাবনা বেশি। একটা বাজে, এই ভরদুপুরে স্বর্ণেন্দু সামন্তকে কি বাড়িতে পাওয়া যাবে?

তবু মরিয়া হয়ে প্রথমে স্বর্ণেন্দুর বাড়িই গেল। গলির গলি তস্য গলি, তবে বাড়িটা খুব প্রাচীন নয়। একতলার পিছন দিকে ভাড়া থাকে স্বর্ণেন্দু।

কড়া নাড়তেই ক্ষয়াটে চেহারার একটা বউ বেরিয়ে এল। আটপৌরে শাড়ি বেশ মলিন, কপালে সিঁদুর লেপটে আছে।

—কী চাই?

—সোনাবাবু বাড়ি আছেন?

—কে সোনাবাবু?

—স্বর্ণেন্দু সামন্ত এই বাড়িতেই থাকেন তো?

—তা সোনা সোনা করছেন কেন? বউটা প্রায় খেঁকিয়ে উঠল,—আপনার কী দরকার তাকে?

—আমি ইম্পিরিয়াল এক্সচেঞ্জ থেকে আসছি। মানে স্বর্ণেন্দুবাবু যে নিলামঘরে চাকরি করতেন।

—কেন?

—অর্চিষ্মানবাবু ওঁর খোঁজ করতে পাঠিয়েছেন। উনি এখন কী করছেন জানতে চান।

বউটি সন্দিগ্ধ চোখে মিতিনের পা থেকে মাথা অবধি দেখল,—আপনাকে পাঠিয়েছে?

—হ্যাঁ, আমি ওঁর সেক্রেটারি। রুদ্রসাহেব বলেছেন স্বর্ণেন্দুবাবু চাইলে আবার তাকে চাকরিতে ফেরত নিতে পারেন।

—হঠাৎ তাঁর এত দয়া? আমরা এতদিন কী ভাবে বেঁচে আছি, তার খোঁজ নেননি কোনওদিন...। সাহেবকে বলে দেবেন, আমরা গরিব হতে পারি, আমাদের মানসম্মান আছে। যেখান থেকে ওভাবে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়ায়, সেখানে আমার স্বামী আর কখনও থুতু ফেলতেও যায় না। জুতো মেরে গরুদান, অ্যাঁ?

—কিন্তু উনি এখন করছেনটা কী?

—তা জেনে আপনার কী হবে? মনে করুন চুরিবাটপারি করছে। আপনার সাহেব তো আমার স্বামীকে তাই মনে করেন।

ভেতরে একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল। বউটা যেন ঈষৎ চঞ্চল। একবার ভেতরে তাকিয়ে নিয়ে রূঢ়ভাবে বলল,—আমার স্বামী বলেছিল, দেখো আমাকে তাড়ানোর জন্য মালিককে একদিন পস্তাতে হবে। এবার তা হলে সেইদিন এসেছে!...কিন্তু ও আর ওই দোকানে পা রাখবে না!...আসুন আপনি।

মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে বউটা। অন্দরে শিশুর কান্না জোরদার হয়েছে আরও। মিতিন আর দাঁড়াল না, বেরিয়ে বড়রাস্তায় পড়ল, খুঁজে খুঁজে গোয়াবাগান রো।

হরিপ্রসাদ সাহার বাড়িটি জরাজীর্ণ, পুরনো আমলের। বছর পঁয়ত্রিশের এক মহিলা দোতলার কোনার দিকের এক ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে মিতিনকে, সম্ভবত মহিলা হরিপ্রসাদবাবুর পুত্রবধূ। ঘরখানা বড়সড়, জানলায় রঙিন কাচ, লাল মেঝেতে ফাটল ধরেছে। আসবাব-ঠাসা ঘরে বসার জায়গা খাওয়ার জায়গা সব এক সঙ্গেই। জানলায় ছিটকাপড়ের পর্দাটি নতুন, ঘরের সঙ্গে বেমানান।

হরিপ্রসাদবাবু ঘুমোচ্ছিলেন বোধহয়, আসতে মিনিট পাঁচেক সময় লাগল। ফর্সা সৌম্যদর্শন বিরলকেশ বৃদ্ধ, পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি।

মিতিন হাত জোড় করে নমস্কার করল,—আমার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়। আমি আপনার কাছে একটা অপ্রিয় কাজে এসেছি।

—বলুন।

—আপনি যেখানে কাজ করতেন, মানে ইম্পিরয়াল এক্সচেঞ্জ, সেখানে সম্প্রতি একটি চুরি হয়ে গেছে।

বৃদ্ধর কপাল কুঁচকে গেল,—তো?

—আমি চুরিটার তদন্ত করছি, আপনার একটু সাহায্য দরকার।

—আমি! আমি কী করতে পারি?

—অর্চিষ্মান রুদ্রর ধারণা তাঁর কোনও প্রাক্তন কর্মচারী এই চুরির সঙ্গে...

কথা শেষ হল না, হরিপ্রসাদ তীব্র স্বরে বলে উঠলেন,—বাবলু আমায় সন্দেহ করে? ওর জন্মের আগে থেকে আমি দোকানে চাকরি করছি...! কত লাখ লাখ টাকার মাল আমার হাত দিয়ে বেচাকেনা হয়েছে, একদিন একটা ফুটো পয়সার গরমিল হয়নি...!

মিতিন নম্র স্বরে বলল,—আপনি ভুল করছেন। তিনি আপনাকে সন্দেহ করেন না, বরং রেসপেক্টই করেন। আপনি ছাড়াও আরও কয়েকজনকে তো উনি...

—আর কাকে সন্দেহ করে বাবলু? যজ্ঞেশ্বর? হরিপ্রসাদের মুখচোখ লাল হয়ে গেছে,—বাবলুকে বলে দেবেন, যজ্ঞেশ্বর মারা গেছে।

—আহা, আপনি মিছিমিছি রাগ করছেন। আপনাদের সম্পর্কে ওঁর কোনও অভিযোগ নেই। তবে তপন নন্দী বা স্বর্ণেন্দু সামন্ত সম্পর্কে ওঁর রিজার্ভেশান আছে।

—ওরাও বাবলুর দোকানে ঢুকে চুরি ডাকাতি করবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। এতক্ষণে বসলেন হরিপ্রসাদ,—তপন তো অত্যন্ত ভদ্র বাড়ির ছেলে। তার বাবা অতি সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। আমি তাঁর আন্ডারে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছি।

—তপনবাবুর বাবাও নিলামঘরে ছিলেন নাকি? মিতিন বেজায় চমকাল।

—হ্যাঁ। ম্যানেজার ছিলেন। বহুকাল আগে।

—তিনি চাকরি ছেড়েছিলেন কেন?

—ছাড়েননি তো। উষাপতিবাবু মারা গিয়েছিলেন। সুইসাইড।

—সেকি! কেন?

—ঠিক বলতে পারব না। দিব্যি হাসিখুশি লোক ছিলেন, বড়কর্তার সঙ্গে ভাল বন্ধুত্বও ছিল, দু বাড়িতে যাওয়া আসাও ছিল খুব।...তারপর কী যে মাথার ব্যামো হল, দুম করে অফিসে আসা বন্ধ করে দিলেন, তারপর হঠাৎ শুনি ফ্যান থেকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে...

—এ সব কথা তো অর্চিষ্মানবাবু কিছু বলেননি!

—বাবলু এ সব কতটুকু জানে! সেই কতকাল আগের কথা...। হরিপ্রসাদ মনে করার চেষ্টা করলেন,—তা প্রায় উনত্রিশ তিরিশ বছর তো হবেই।

—তপনবাবুকে ছাড়ালেন কেন মিস্টার রুদ্র? তপন ছেলে কেমন?

—একটু বেশি শৌখিন, তবে নেশা টেশা করত না। দোষের মধ্যে...একটু আধটু হাতটান ছিল। বাবলু ওয়ান পাইস ফাদার মাদার, বড়কর্তার মতো অত উদারতাও নেই, সে ওই স্বভাব সহ্য করবে কেন? আমাদেরই কত তুচ্ছ কারণে বেলপাতা শুকিয়ে দিল! বড়কর্তা না থাকলে হয়তো আমাদের বকেয়া পেতেও জুতোর সুকতলা ক্ষয়ে যেত।

—আপনাদের বড়কর্তা তার মানে লোক ভাল?

—ভাল মানে! মাটির মানুষ। আমাদের সম্পর্কে কত ভাবতেন! আমাদের হয়ে কথা বলতে গিয়েই না বাবলুর চোটপাট শুনলেন! ছি ছি, মানুষটা কিনা লজ্জায় ঘেন্নায় দোকানেই আসা ছেড়ে দিলেন।

মিতিন একটুক্ষণ কী যেন চিন্তা করল। তারপর বলল,—আর আপনাদের স্বর্ণেন্দু সামন্ত? তিনি কেমন ছিলেন?

—ওটিই হচ্ছে শয়তানের জাশু। সেজে থাকত ভিজে বেড়াল...। কী ভাল একটা ক্যামেরা হাপিস করে দিয়েছিল! তপনও সরাত, তবে অত দামি জিনিস নয়। তপন অন্তত বড়কর্তাকে মানিগন্যি করত, স্বর্ণেন্দু কাউকেই না।

—এখন তপনবাবু স্বর্ণেন্দুবাবুরা কী করেন?

—তপনের অনেকদিন খবর পাই না। শুনেছিলাম কী ব্যবসা ট্যাবসা করছে। স্বর্ণেন্দু একটা লটারির দোকান দিয়েছে, কলেজ স্ট্রিটে। কথায় খুব ওস্তাদ তো, জপিয়ে জাপিয়ে ভালই কামায়। বড়কর্তা শুনেছি ওকে আলাদা করে কিছু টাকা দিয়েছিলেন...গিয়ে নাকি পায়ে টায়ে পড়ছিল...

স্বর্ণেন্দুর বউয়ের মুখটা পলকের জন্য মনে পড়ল মিতিনের। জিজ্ঞাসা করল,—আচ্ছা, স্বর্ণেন্দুর কি ডাকনাম সোনা?

—না তো। ওকে তো পাড়ায় বোধহয় ছোটকা বলে ডাকে।

আরও দু চারটে কথা বলে মিতিন উঠে পড়ল। এবার তপন। এটাও খুব দূরে নয়, হাঁটাপথে ছ সাত মিনিট। অন্য বাড়ি দুটোর তুলনায় তপনের বাড়ি একটু ছোট বটে, কিন্তু ছিমছাম ধোপদুরস্ত। একতলা বাড়ির প্রবেশপথে একটা টানা লম্বা বারান্দা, দরজায় কলিংবেল আছে।

বাজাতেই পাখির ডাক শোনা গেল। দরজা খুলেছেন এক প্রৌঢ়া। শ্যামলা রং, বেশ অনেকখানি লম্বা, মাথার কাঁচা পাকা চুল এখনও বেশ ঘন। দেখে বোঝা যায় এক সময়ে যথেষ্ট সুন্দরী ছিলেন।

মিতিন সপ্রতিভভাবে বলল,—আমি সেনসাস থেকে আসছিলাম মাসিমা। কয়েকটা প্রশ্ন ছিল।

মহিলা স্মিত মুখে বললেন,—বলো।

—একটু বসে কথা বলতে পারি কি মাসিমা? আমায় কিছু লিখতে হবে।

—এসো, ভেতরে এসো।

সামনেই ছোট্ট বসার ঘর। সযত্নে সাজানো। বেতের সোফা, কাচ বসানো সেন্টার টেবিল, কালার টিভি, শোকেস, স্ট্যান্ড ল্যাম্প, সবই আছে অল্প জায়গাটুকুতে। শোকেসের মাথায় এক যুবকের ছবি। এই তবে তপন? ঘরের কোণে তানপুরাও রাখা আছে একটা, কাপড়ে ঢাকা। কে গান গায়? মা, না ছেলে?

মিতিন গুছিয়ে বসল। পেশাদারি ভঙ্গিতে ফাইল কলম বার করেছে।

প্রশ্ন শুরু হল,—আপনারা ফ্যামিলি মেম্বার কজন?

—দুজন। আমি, আর আমার ছেলে।

—আপনার ছেলেই আর্নিংমেম্বার তো?

—হ্যাঁ।

—ইনকাম? পাঁচ হাজারের নীচে? দশ হাজারের নীচে? না তার ওপরে?

মহিলা ঈষৎ ইতস্তত করে বললেন,—ঠিক বলতে পারব না।

—কী করেন আপনার ছেলে? চাকরি, না ব্যবসা?

—ব্যবসা।

আরও বেশ কিছু রুটিন প্রশ্ন করে পেন বন্ধ করল মিতিন। চোখ বোলাচ্ছে ঘরে। আন্তরিক সুরে বলল,—বাড়িটা আপনার কিন্তু ভারী সুন্দর মাসিমা। ঘর কটা?

—গোটা তিনেক।

—কত দিন আগের বাড়ি?

—এই, একুশ বছর।

—মেসোমশায়ের হাতে তৈরি?

মহিলা হাসলেন একটু, এটাও কি তোমার সেনসাসের প্রশ্ন?

নাহ্, মহিলা বেশ বুদ্ধিমতী, এবং অশিক্ষিতও নয়। স্বরেও বেশ একটা আভিজাত্য আছে। কথা বলেন থেমে থেমে, মেপে মেপে। শুনতে বেশ লাগে।

মিতিনও হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল,—সারাদিন ট্যাঙোশ ট্যাঙোশ করে ঘুরি তো, বকবক করতে করতে বেশি কথা বলে ফেলি।

মহিলা আবার হাসলেন,—হুঁ।

—উঠি এবার।...এক গ্লাস জল হবে মাসিমা?

জল আনতে গেছেন মহিলা। দ্রুত উঠে গিয়ে তপনের ছবিটাকে দেখছে মিতিন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। হঠাৎই পাশে চোখ আটকে গেল।

কী ওটা? ভাঙা একটা অ্যাম্পিউল না?

[এগারো]

অস্থির পায়ে লনে পায়চারি করছিল বিদিশা। মিতিনকে দেখে দৌড়ে এল গেটে,—দিদি, আপনি এসে গেছেন?

মিতিন চাপা স্বরে বলল,—দিদি নয়, মিতিন। আমি তোমার বন্ধু না?

মুহূর্তের জন্য থমকেছে বিদিশা। সকাল দশটাতেই আশ্বিনের রোদ বেশ চড়া আজ। বিদিশার মুখ লাল হয়ে আছে, ঘামছে অল্প অল্প। করুণ মুখে বলল,—কাল দুপুরে ফোনটা আসার পর থেকে আমার আর মাথার ঠিক নেই। শরীর ছেড়ে যাচ্ছে...

—আহ্, চুপ। মিতিন মৃদু ধমক দিল,—চলো, ওপরে গিয়ে কথা হবে।

বাড়িতে ঢোকার মুখে পদ্মপাণি। জুলজুল চোখে দেখছে মিতিনকে। হাসি হাসি মুখে বলল,—ভাল আছেন দিদি?

—ওই এক রকম। মিতিন হাসল সামান্য,—তোমাদের খবর ভাল তো?

—কই আর! বাড়ির ড্রাইভার কোথায় হাওয়া হয়ে গেল,...কোনও খবর নেই!...বাড়িতেও অসুখ বিসুখ শুরু হয়েছে...

—কার অসুখ করল?

—বাবুর। কাল দুপুরে গা ম্যাজম্যাজ করছিল, কতবার বললাম বেরোবেন না, সেই বেরোলেন...আজ সকাল থেকে তো একেবারে শয্যা নিয়েছেন। বলতে বলতে পদ্মপাণি বিদিশার দিকে তাকাল,—এই তো দেখুন না, বউদিমণিরও শরীর ভাল নয়। খাচ্ছে না দাচ্ছে না, বলছে মুখে রুচি নেই...

—কী রে, তোর আবার কী হল? মিতিন বিদিশাকে চোখ টিপল,—নতুন খবর টবর কিছু আছে নাকি?

—না না, এমনিই। বিদিশা লজ্জা লজ্জা মুখ করল,—আমার বন্ধুকে কিছু খাওয়াবে না পদ্মদা?

মিতিন তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—আমি এক্ষুনি কিছু খাব না। এই মাত্র জলখাবার খেয়ে এসেছি।

—তা হলে আমাদের ঘরে চাট্টি ভাত খেয়ে যাবে।

—সে দেখা যাবেখন।

বলতে বলতে বিদিশার সঙ্গে সিঁড়ির দিকে এগোল মিতিন। উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করল,—কী হয়েছে মেসোমশায়ের?

—মনে হয় ঠাণ্ডা লেগেছে। সিজন চেঞ্জের সময় তো?

—হুম! ডাক্তার দেখেছে?

—এ বেলাটা যাক, তেমন বুঝলে বিকেলে কল দেব।

বিদিশা ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। কুলার চালিয়েছে। কোনস্ট্যান্ডে রাখা বিদেশি যন্ত্রটার কাছে গেল,—চালাব?

—খুব লো ভল্যুমে চালাও।

একদম কাছে কান নিয়ে গিয়ে রেকর্ড করা গলাটা শুনল মিতিন। একবার দুবার...। উচ্চারণ পরিষ্কার, তবে গলাটা কেমন যেন বিকৃত মনে হয়! যেন অনাবশ্যক রকমের ভারী!

টাকা দেওয়ার নির্দেশ এবার বেশ অভিনব। দমদম থেকে দুটো দশের টালিগঞ্জগামী মেট্রোট্রেনে চড়তে হবে বিদিশাকে, পুরো টাকা কিটসব্যাগে ভরে। পাঁচ লাখের সবটাই পুরনো একশো টাকার বান্ডিলে হওয়া চাই। বিদিশাকে উঠতে হবে সামনের দিক থেকে

তৃতীয় কামরায়, কিটসব্যাগ রাখতে হবে সিটের নীচে, এবং সেই অবস্থাতেই রেখে নিঃশব্দে নেমে যেতে হবে পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে। ব্যস, আ হলেই বিদিশার মুক্তি।

নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে কড়া সাবধানবাণীও আছে। এবার যদি বিদিশা কোনও রকম চালাকির চেষ্টা করে, যদি গতবারের মতো কোনও সঙ্গী নিয়ে যায়, অথবা পুলিশে খবর দেয়, তা হলে তার সুখের জীবন সেদিনই শেষ।

মিতিন ভুরু কুঁচকে তাকাল,—ফোনটা এসেছে কোন নাম্বার থেকে?

—ওই একই। আগের বারের নম্বর।

—হুম!...এই ফোনের কথা মিস্টার রুদ্রকে কখন জানিয়েছ?

—দুপুরে প্রথমে আপনাকেই করেছিলাম। আপনি ছিলেন না...। তারপর ওকে...। ও অবশ্য তখন বাড়ে ছিল না।

—ছিলেন না! কোথায় গেছিলেন?

—অম্বরীশবাবু বললেন, ব্যাঙ্কে গেছে।...এসেই অবশ্য আমাকে ফোন করেছিল। তখনই...

—মিস্টার রুদ্রর শার্টটা কোথায় আছে দেখাও তো।

বিদিশা অ্যান্টিরুমে নিয়ে গেল মিতিনকে। দেরাজ খুলে একটা ঘিয়ে রঙের হাফস্লিভ শার্ট বার করেছে। মিতিন ভাল করে দেখল শার্টটাকে। মামুলি টেরিকটের শার্ট, খুব দামি কিছু নয়। সরু কলার, দু ধারে পকেট, ঘাড়ের কাছে লেবেলে ধর্মতলার এক টেলারিং শপের নাম, একটি ছাড়া বাকি সব বোতাম এখনও অটুট।

শার্টটার গন্ধ শুঁকল মিতিন। তারপর বুকের কাছটা চেপে চেপে ঘষছে। আঙুলটা ঠেকাল জিভে।

বিদিশা হাঁ হাঁ করে উঠল,—ও কী করছেন দিদি?

মিতিন হাসল,—ক্রিমিনালদের শার্ট কেমন হয় চেখে দেখছি।

বিদিশার চোখে আতঙ্ক ফিরে এল,—আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না শার্টটা এখানে কী করে এল...!

—শার্টের হয়তো ডানা গজিয়েছিল, উড়ে এসে তোমার বরের দেরাজে ঢুকে গেছে। মিতিন শার্টটা মুড়ে হাতে রাখল,—মিস্টার রুদ্রর ওয়ার্ড্রোব কোনটা?

বিদিশা আরও ঘাবড়ে গেল,—কেন দিদি?

—আহা, নার্ভাস হচ্ছ কেন? দেখাও না।

ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখে অর্চিষ্মানের ওয়াড্রোব খুলে দিল বিদিশা। সার সার শার্ট ঝুলছে হ্যাঙারে, এলোমেলো ভাবে কয়েকটা শার্ট বার করল মিতিন, উল্টেপাল্টে নিরীক্ষণ করল কী যেন, আবার রেখে দিল।

বিদিশা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল,—কী দেখলেন দিদি? কী বুঝলেন?

—কিছুই বুঝিনি। বোঝার চেষ্টা করছি।

মিতিন ফিরল অ্যান্টিরুম থেকে। শার্টখানা নিজের ব্যাগে পুরল। খাটের এক কোণে বসে ডাকল বিদিশাকে,—এখানে এসো, তোমার সঙ্গে আরও কয়েকটা কথা আছে।

বিদিশা জড়োসড়ো ভাবে বসল। শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম

জমেছে।

মিতিন তার শীতল হাতে হাত রাখল,—তোমার ঘরের বিজনেসটা কি একার?

—মানে?

—বলছি, ওটা তো তোমার শ্বশুরমশায়ের ব্যবসা, ওতে নিশ্চয়ই ননদেরও ভাগ আছে?

—না, নেই। অর্চিষ্মান একাই চালায়।

—সেটা তো জানি। তোমার শ্বশুরমশাই কি ব্যবসাটা তোমার ঘরের নামেই লিখে দিয়েছেন?

—মোটামুটি। গত বছরই উনি নাকি উইল করেছেন। বিজনেস অর্চিষ্মানের নামে, বাকি সব স্থাবর সম্পত্তি আধাআধি ভাগ।

—উইলের কথা তোমায় কে বলেছেন? শ্বশুরমশাই?

—না, অর্চিষ্মান একদিন বলেছিল। সেই বিয়ের পর পর।

—তোমার ননদ ননদাই উইলের কথা জানেন?

—জানেন বইকী। পূষনদা তো নাকি সাক্ষী ছিল।

—উইলটা কবে নাগাদ হয়েছে জানো?

—ঠিক টাইম বলতে পারব না, তবে গত বছর পুজোর আগে।

—হঠাৎ উইল করে রাখতে গেলেন কেন তোমার শ্বশুরমশাই?

—অর্চিষ্মান আমায় বলেছে, দিদি নাকি খুব জোরাজুরি করছিল।

মিতিন কী যেন ভাবল একটুক্ষণ,—তোমার ননদের সঙ্গে একবার কথা বলা যাবে?

বিদিশা অবাক চোখে তাকাল, তবে আর প্রশ্ন করল না। বলল,—দিদিকে টেলিফোনে ধরে দেব?

—না। আমি সামনাসামনি কথা বলতে চাই। তুমি এখন আমাকে একটু নিয়ে যেতে পারবে?

—এখন? শালকিয়ায়?

—আর তো সময় নেই বিদিশা।

—এখনও যে স্নান হয়নি!

—স্নান নয় ফিরে কোরো। খাওয়া দাওয়াও কোথাও একটা করে নেওয়া যাবে। তুমি নিজে গাড়ি চালিয়ে যেতে পারবে তো? ঘাবড়ে যাবে না?

বিদিশা মিতিনের দিকে একটু তাকিয়ে বলল,—পারব।...আমি তা হলে তৈরি হয়ে নিই?

—হও তৈরি। তার আগে একটা কাজ করো তো।

—কী?

—তোমাদের দিঘা ট্যুরের ছবি আর নেগেটিভগুলো আছে? দাও আমাকে, একটু বসে বসে দেখি।

বিদিশা উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার ধপ করে বসে পড়ল,—নেগেটিভ কেন দেখবেন?

মিতিন নরম হাসল,—সব কথায় এত ভয় পেয়ে যেও না বিদিশা, শক্ত করো

নিজেকে।

বিদিশা কী বুঝল কে জানে, কেঁদে ফেলল হঠাৎ। নাক টানতে টানতে বলল,—আমি তো ভাল মেয়ে নই দিদি, তাই সবেতেই ভয় হয়।

মিতিন বিদিশার কাঁধে হাত রাখল,—ভয়ের কিছু নেই, শনিবারের পর সব ঠিক হয়ে যাবে।

—সত্যি বলছেন?

—বলছি।...দাও, ওগুলো বার করে দিয়ে ড্রেস করো।

শুধু দিদার ছবি আর নেগেটিভ নয়, গোটা চার পাঁচ অ্যালবাম মিতিনকে দিয়ে অ্যান্টিরুমে চলে গেল বিদিশা। নেগেটিভগুলো আলোর সামনে ঝুলিয়ে দেখছে মিতিন, দরজায় করাঘাত।

—কে?

—আমি পদ্মপাণি। সরবত এনেছিলাম।

তাড়াতাড়ি নেগেটিভটা গুটিয়ে ফেলল মিতিন,—এসো, ভেতরে দিয়ে যাও।

পদ্মপাণি ঘরে ঢুকে এদিক ওকে তাকাচ্ছে,— বউদিমণি কোথায়?

—বিদিশা রেডি হচ্ছে। আমরা এখন বেরোব।

—খাওয়া দাওয়া করবেন না?

উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল মিতিন,—তুমি সরবত আনলে কেন গো? তোমাদের সুমতি কোথায়?

—রান্নাঘরে। মানদাকে সাহায্য করছে।

—ও।...আমরা বাইরে খেয়ে নেব পদ্মদা।

—বউদিমণিও বাইরে খাবে? শরীরটা যে ভাল না...দাদা কিন্তু শুনলে রাগ করবে। আমাকে পই পই করে বলে দিয়েছে বউদিকে চোখে চোখে রাখতে। যদি এর মধ্যে ফোন করে, আমাকে কিন্তু খুব বকবে।

মিতিন কিছু বলার আগে বিদিশা বেরিয়ে এসেছে,—তোমার দাদা ফোন করলে বোলো বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছে, বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসবে।

অখুশি মুখে বেরিয়ে গেল পদ্মপাণি।

মিতিন অ্যালবাম খুলে ছবি উল্টোচ্ছে। জিজ্ঞাসা করল—লোকটার নাক একটু বেশি লম্বা, তাই না?

—হুঁ, বেশি ওস্তাদ। সব কথায় কথা বলে।

—কার বেশি পেট্? কর্তার, না দাদার?

—কারুরই না। যে যখন সামনে থাকে তার। এখন অবশ্য দাদাকে খুব জপানোর চেষ্টা করছে ছেলেকে দেশ থেকে এনে দোকানে যদি লাগানো যায়...। বিদিশা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে থমকে দাঁড়াল,—আচ্ছা দিদি, পদ্মপাণি শার্টটা ওখানে রেখে দেয়নি তো?

—হতেও পারে। কিন্তু মোটিভটা জানা দরকার। দুনিয়ার কিছুই অকারণে ঘটে না।

—আমার মনে হচ্ছে এটা পদ্মপাণিরই কাজ। ওকে ডেকে ভাল করে ক্রস করুন না। দেশে জমি কিনেছে, বাড়ি করেছে...নিশ্চয়ই ক্রিমিনালের সঙ্গে যোগ আছে।

—থাকতে পারে। তবে তোমার পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে ভাগ নিয়ে জমি বাড়ি করেনি, এটা তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। মিতিন আরও কয়েক মিনিট অর্চিষ্মানের পারিবারিক ছবিগুলো দেখল। তারপর উঠে দাঁড়িয়েছে,—চলো, তোমার আসল গার্জেনের পারমিশান নিয়ে বেরোই।

দিননাথ দেওয়ালের দিকে ফিরে শুয়ে ছিলেন। বিদিশার ডাকে ফিরলেন। সত্যিই বেশ অসুস্থ দেখাচ্ছে মানুষটাকে। মুখ শুকনো শুকনো, চোখ ভেতরে ঢোকা, চেহারায় কেমন ছন্নছাড়া ভাব।

মিতিনকে দেখে উঠে বসলেন, একটু যেন কষ্ট করেই। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন,—তুমি কতক্ষণ এসেছ?

—এই তো, আধঘণ্টাটাক আগে। মিতিন বসল কারুকাজ করা পালঙ্কের এক ধারে,—কী করে বাধালেন?

—এই বয়সে কী আর বাধাতে হয়? বেধে যায়।

—বাজে কথা একদম বোলো না। বিদিশা চোখ পাকাল,—পরশু অত রাত অব্দি ফাংশান শুনে এলে...তারপর কাল আর তোমার বেরনোর কী দরকার ছিল শুনি? পরশুই তোমার হিম লেগে গেছে, আমি জানি।

—কোথায় ফাংশান শুনতে গিয়েছিলেন মেসোমশাই?

—ওই তো...সাউথে...নজরুল মঞ্চ।

—যেখানে আমজাদ আলি খাঁর প্রোগ্রাম ছিল?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমিও গিয়েছিলে নাকি?

—না, কাগজে দেখছিলাম। মিতিন ঘড়ি দেখল। সামান্য আবদারের সুরে বলল, —আমি আর বিদিশা একটু বেরোচ্ছি মেসোমশাই।

—কোথায়?

—পুজোর বাজার। বিদিশাও বলছিল ওর নাকি কোনও মার্কেটিংই হয়নি...। বেশি দূর যাব না, এই হাতিবাগান শ্যামবাজার...

বিদিশা চটপট বলে উঠল,—তুমি কিন্তু আজ আর চান কোরো না বাবা। সুমতিকে বলো, গরম জল দেবে, মাথা ধুয়ে ভাল করে গা স্পঞ্জ করে নিও।

কেমন যেন বিহ্বল চোখে বিদিশার দিকে তাকিয়ে আছেন দিননাথ। অস্ফুটে বললেন,—তাড়াতাড়ি ফিরিস। দেরি হলে কিন্তু আমি চিন্তা করব।

—জানি তো। চারটের মধ্যেই ফিরব।

—অতক্ষণ লাগবে? তা হলে খাওয়া দাওয়া করে যা।

মিতিন চুপ করে শ্বশুর-পুত্রবধূর ভালবাসা বিনিময় দেখছিল। মুচকি হেসে বলল,—আজ আমরা একটু মুখ বদলাব মেসোমশাই। রেস্টুরেন্টে খাব। আপনার বেটির জিভে স্বাদ নেই। রুচি ফেরানো দরকার।

আরও কী যেন একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন দিননাথ। মিতিন আর বিদিশা বেরিয়ে এল।

রোদের তাপ প্রখর হয়েছে আরও। থোকা থোকা সাবানের ফেনায় ভরে আছে

আকাশ, হাওয়ার স্রোতে ছুটছে অবিরাম। রাস্তার ধারে ফুটে থাকা কাশফুলের গায়েও সেই হাওয়ার ছোঁয়া। চারদিকে ঘন সবুজ হয়ে আছে গাছগাছালি।

গাড়িতে যেতে যেতে মিতিন বলল,—তোমার শ্বশুরমশাই দেখছি তোমাকে চোখে হারান!

—ওটাই তো আমায় সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়। গিয়ার বদলে গাড়ির গতি একটু কমাল বিদিশা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,—উনি যদি আমার পাস্ট জানতে পারেন, আমি শিওর উনি বাঁচবেন না। আমিই এখন ওঁর একমাত্র অবলম্বন।

—এমন শ্বশুর অনেক ভাগ্য করলে জোটে! মিতিন একটুক্ষণ নীরব থেকে বলল,—তোমার শ্বশুরের অত গানবাজনার নেশা, নিজে গান জানেন?

—শুনিনি। মাঝে মধ্যে একটু আধটু গুনগুন করেন...

—তোমার বর ননদ, এদের গলা কেমন?

—আমার বর তো অ-সুর। তার একটাই গান আছে, শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর...। ননদও গান টান জানে বলে মনে হয় না।

—মিস্টার রুদ্রর মামার বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক কেমন?

—তারা তো খুব একটা আসে না। ওই বউভাতের সময়ে এক দুজনকে দেখেছিলাম...

—তাদের অবস্থা কেমন?

—বিশাল বড়লোক। ব্যবসা আছে নানা রকম, প্রচুর বাড়ি আছে কলকাতায়...

—কোথায় থাকেন তাঁরা?

—বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে। মেফেয়ার রোড। আমি অবশ্য সেখানে একদিনও যাইনি।

—কেন?

—অচিন্ত্যানের সময় কোথায় নিয়ে যাওয়ার! তা ছাড়া রিলেটিভ টিলেটিভদের ওপর ওদের টান একটু কমই।

—ও। মিতিন দুম করে প্রসঙ্গ বদলাল,—তোমার শ্বশুরমশায়ের দাবার নেশা কত দিন?

—এই তো চার ছ মাস। ওই কর্নেল লাহিড়িই ধরিয়েছেন।

—কে কর্নেল লাহিড়ি?

বিদিশা স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে একটা গাড়িকে পাশ কাটাল,—বলিনি আপনাকে? বাবার বন্ধু। ওই মর্নিংওয়াক করতে করতে আলাপ। স্টেডিয়ামের দিকে থাকেন।

মিতিন হেসে ফেলল। বিদিশা জেরার উত্তর দিতে দিতে বেশ পোক্ত হয়ে গেছে, দিব্যি জবাব দিচ্ছে গুছিয়ে।

হাসি হাসি মুখে প্রশ্ন করল,—রোজই কি উনি দাবা খেলতে যান?

—প্রায় রোজই। কী যেন মনে পড়েছে বিদিশার, হাসছে মিটিমিটি,—একটা ভারী মজার ব্যাপার হয়, জানেন! জিতলে বাবার বেশি মন খারাপ হয়। হারার থেকেও।

—তাই?

—ও বলেন, পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখ দেখে ওঁর নাকি জেতার আনন্দ উবে যায়।...অটমন একেবারে উল্টো।

—কী রকম? জেতা হারা স্পোর্টিংলি নিতে পারে না?

—খেলার কথা অবশ্য জানি না। ব্যবসার কথা বলতে পারি। অন্য নিলামঘরে সত্যিকারের কোনও রেয়ার পিস এসে গেলে ওর মুখ হাঁড়ি হয়ে যায়। পার্ক স্ট্রিটের কোন বারে কী রকম বিজনেস চলছে, তাই নিয়েও খুব টেনশানে থাকে।

—তোমাকে গল্প করে বুঝি?

—উহুঁ। মোবাইলে রাতে কথা বলে তো, কানে আসে।

—ও।

কথা বলতে বলতে বিবেকানন্দ রোডে এসে পড়েছে গাড়ি। জ্যামে পড়ে ঘন ঘন ক্লাচ ব্রেক চাপছে বিদিশা, মুখে চোখে এখন তার টানটান ভাব। পোস্তা পেরিয়ে হাওড়া ব্রিজ, সেখান থেকে শালকিয়া, এ যেন এক দুর্গম অভিযান। মিতিনও আর কথা বলছিল না, আপন মনে মাথা দোলাচ্ছিল মাঝে মাঝে।

পূষনদের বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে দেড়টা বেজে গেল।

অসময়ে বিদিশাকে দেখে খুবই অবাক হয়েছে অর্চনা,—কী রে, হঠাৎ কোনও খবর না দিয়ে?

বিদিশা বিনা ভূমিকায় মিতিনের শেখানো কথা উগরে দিল,—দিদি, এ আমার বন্ধু, প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি। তোমার সঙ্গে কীসব কথা বলতে চায়।

অর্চনা আরও অবাক,—আমার সঙ্গে? কী কথা ভাই?

মিতিন নরম সুরে বলল,—দিদি, কথাটা একটু প্রাইভেট। আমরা একটু অন্য কোথাও বসতে পারি?

অর্চনা চোখের পাতা ফেলতেও ভুলে গেছে,—আমরা মানে? বিদিশাও থাকবে না?

—বললাম না দিদি, প্রাইভেট। বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি।

বিদিশা বলল,—আমি মাসিমার সঙ্গে দেখা করে আসছি, তোমরা কাজ সেরে নাও।

হতভম্ব মুখে মিতিনকে শোওয়ার ঘরে নিয়ে এল অর্চনা। আধঘণ্টা পর যখন বেরোল, তখন মিতিনের মুখ গম্ভীর, অর্চনার মুখ ছাইয়ের মতো সাদা।

বাইরে বেরিয়ে বিদিশা জিজ্ঞাসা করল, —কী হয়েছে দিদি? আমার ননদ অত কাঁপছিল কেন?

কথাটার উত্তর দিল না মিতিন। বলল,—পূষনবাবুর ফ্যাক্টরিটা কোথায় তুমি জানো?

—হ্যাঁ, এই তো কাছেই। বেলগাছিয়ায়। কিউ রোড, না এম রোড...গেছি একবার। বিদিশা অস্ফুটে প্রশ্ন করল,—এখন ওখানে যাবেন?

একটু ভেবে নিয়ে দু দিকে মাথা নাড়ল মিতিন,—থাক।...চলো, এবার আমরা কোথাও বসে কিছু একটা খেয়ে নিই।

[বারো]

শুক্রবার সারাটা দিন ছোটাছুটিতেই কাটল মিতিনের। যাকে বলে টালা থেকে টালিগঞ্জ করা, তাই। একবার লালবাজার দৌড়োয়, তো একবার শ্যামবাজার, সেখান

থেকে থেকে যদুবাজার...! সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরল একেবারে ঝোড়ো কাক হয়ে। এসেও বসল না, বুমবুমকে নিয়ে সোজা চলে গেছে ক্যারাটে ক্লাব। এ সপ্তাহে ক্লাস নিতে আসা হয়নি, আজ মন দিয়ে বাচ্চাদের শরীরচর্চা শেখাল অনেকক্ষণ। বুমবুমও লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছে, হাত পা ছুঁড়ছে, আর হুহ্ হাহ্ করছে। ওদের সঙ্গে ঝাঁপাঝাঁপি করে মিতিনের শরীরও বেশ টনকো হয়ে গেল। সুস্থ সতেজ দেহ স্বচ্ছ চিন্তাশীল মস্তিষ্কের আধার, কথাটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে মিতিন।

আটটা নাগাদ বাড়ি ঢুকে মিতিন টিভি চালিয়ে দিল। ডিসকভারি চ্যানেল। সমুদ্রের অতলে অজস্র রঙিন মাছ খেলা করছে, বুমবুমকে পাশে নিয়ে দেখছে বসে বসে।

এমত সময়ে অর্চিষ্মানের আবির্ভাব। পরনে মাখনরঙ্ সাফারি স্যুট, হাতে একটা নতুন কিটসব্যাগ, মুখে ভাদ্রের গুমোট।

মিতিন কিছু প্রশ্ন করার আগেই অর্চিষ্মান বলে উঠল,—টাকাটা আপনাকে দিতে এলাম। যেমন বলেছেন, তেমনই আছে। পঞ্চাশটা বাণ্ডিল। পুরনো একশো টাকার।

মিতিন হেসে ফেলল,—আমি তো কিছুই বলিনি! বলেছে তো আপনার স্ত্রীর ব্ল্যাকমেলার!

অর্চিষ্মান আরও গোমড়া হয়ে গেল,—এই সময়েও আপনি ঠাট্টারসিকতা করতে পারছেন প্রজ্ঞাপারমিতা দেবী? কাজের কাজ কিছু হল না, এখনও লোকটার হদিশ করতে পারলেন না...

—সময় তো এখনও পেরোয়নি মিস্টার রুদ্র! মিতিনের মুখে হাসিটা ধরাই আছে,—আপনি যেন টাকাটা দেওয়ার জন্য একটু বেশি উদগ্রীব?

—এ ছাড়া আর উপায় কি? অর্চিষ্মান প্রায় খিঁচিয়ে উঠল,—আমার স্ত্রীকে তো আমি বিপন্ন হতে দিতে পারি না!

—কিন্তু বিপদের ঝুঁকি যে তাকেই নিতে হবে মিস্টার রুদ্র। ব্ল্যাকমেলার টাকাটা তাকেই ক্যারি করতে বলেছে।

—আপনি থাকছেন না?

—থাকাটা কি উচিত হবে? যদি গুলিগোলা চালিয়ে দ্যায়!

—আপনি...আপনি...!

—উত্তেজিত হবেন না। বসুন। রিল্যাক্স। কফি খাবেন?

—নো, থ্যাঙ্কস। অর্চিষ্মান ধপ করে সোফায় বসল,—আপনি কাল তা হলে সত্যিই বিদিশার সঙ্গে থাকছেন না?

মিতিন উত্তর না দিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল। পালটা প্রশ্ন জুড়ল,—আপনি কাল দুপুরে কোথায় থাকছেন?

—আমি আর কোথায় থাকব, দোকানেই আছি।...একবার হয়তো ব্যাঙ্কেও যেতে পারি। কাল বারোটায় ব্যাঙ্কিং আওয়ার শেষ হওয়ার পর ম্যানেজারের সঙ্গে আমার একটা জরুরি মিটিং আছে। হয়তো সেখানে...

—কাল আপনার স্ত্রীর অত বড় একটা ক্রাইসিস, আর আপনি নিশ্চিন্ত মনে মিটিং করবেন?

—কাজের মধ্যে থাকলে টেনশানটা কম হয়।...অবশ্য আপনি যদি আমাকে বিদিশার সঙ্গে থাকতে বলেন...

—না না, তার দরকার হবে না।

—ঠিকই তো। বিদিশা যাবে, আমার হার্ডআর্নড মানি একটা লোকের হাতে তুলে দিয়ে আসবে...সেখানে আমার আর কী রোল আছে! অর্চিষ্মানের স্বর তেতো। উঠে দাঁড়িয়েছে অকস্মাৎ,—তা হলে টাকা আপনি রাখছেন না?

—না। ওটা আপনি বিদিশাকেই দিয়ে দিন। সব বলা আছে, ও জানে ও কী করবে।

—ও।...তা হলে চলি।

জুতো মশমশ করে বেরিয়ে গেল অর্চিষ্মান।

মিতিনের মুখ থেকে হাসি মুছে গেছে। ভাবছিল।

পার্থ ফিরল অনেক রাতে। বুমবুম ঘুমিয়ে পড়েছে, বিমলাও শুয়ে পড়েছে বিছানা করে। মিতিন অপেক্ষা করছিল পার্থর জন্য, এক সঙ্গে খেতে বসল দুজনে। ব্যারাকপুরে আজ কল শো ছিল পার্থর। প্রতিটি কল শোতেই কিছু না কিছু কমিক ঘটনা ঘটে, এবারের ব্যারাকপুরের শোও তার ব্যতিক্রম নয়। আজ মঞ্চে পার্থর এক সহঅভিনেতার গোঁফ খুলে গিয়েছিল, পার্থর সঙ্গেই অভিনয়ের সময়ে। দৃশ্যটা খুব সিরিয়াস ছিল। তবু হাসি চাপতে পারছিল না পার্থ। শেষমেষ দর্শকদের দিকে ফিরে করজোড়ে বলেছে, দয়া করে আমাদের পাঁচটা মিনিট সময় দিন, একটি ঝুলন্ত গোঁফ কিছুতেই আমাদের স্বাভাবিক অভিনয় করতে দিচ্ছে না! শুনে নাকি দর্শকরা খুব একচোট হেসেছিল, তারপর তারাও ব্যাপারটাকে স্পোর্টিংলি নিয়েছে, এবং নাটকটা নাকি পরে দারুণ জমেওছিল।

একাই বকে যাচ্ছে পার্থ, মাঝে মাঝে শুধু হুঁ হ্যাঁ করছে মিতিন। একটু পরে পার্থ নজর করল তাকে।

চোখ ঘুরিয়ে বলল,—কী ব্যাপার, আজ ম্যাডামের কোনও কমেন্ট নেই যে?

মিতিন কাঁচালঙ্কায় ছোট্ট কামড় দিল,—শুনছি তো।

—উহুঁ, তোমার মন নেই। বলতে বলতে হঠাৎ খেয়াল হয়েছে পার্থর,—ওহ, হো কালই তো তোমার ডি-ডে।

মিতিন ঘাড় দোলাল,—হুঁ।

—অপারেশন-প্রস্তুতি শেষ?

—মোটামুটি।

—অনিশ্চয়বাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে আর?

—হয়েছে। কাল সঙ্গে দুজন এ এস আই দিয়ে দেবেন। প্লেন ড্রেসে থাকবে।

—মাত্র দুজন? লোকটার কাছে যদি আর্মস থাকে? বা সঙ্গে আরও কেউ থাকে?

—তার জন্যই তো ওই ব্যবস্থা। নইলে তো আমি একাই ট্যাকল্ করতে পারতাম।

—এবার থেকে তুমি একটা রিভলবার রাখার বন্দোবস্ত করো।

—হুঁ, অনিশ্চয়বাবুও তাই বলছিলেন। মিতিন পার্থর প্লেটে ডিমের কারি তুলে দিল। নিজের পাতে স্যালাড় নিতে নিতে বলল—তবে এই কেসে মনে হয় লাগবে না। ইনফ্যাক্ট, পুলিশ না হলেও বোধহয় চলত।

পার্থর চোখ সরু হল,—কোন যুক্তিতে বলছ এ কথা?

—যুক্তি নয়, আমার হিসেব বলছে।

—কী হিসেব?

—জানবে জানবে, তাড়া কীসের?

—মানে, হিসেবটা যদি ভুল হয়, সেইজন্যই কিছু বলবে না। তাই তো?

ইচ্ছে করে পার্থ খোঁচাচ্ছে। কৌতূহল। বুঝতে পারছিল মিতিন। একটুও উত্তেজিত না হয়ে হেসে উড়িয়ে দিল কথাটা, জবাব দিল না।

পার্থ ফের বলল,—মনে রেখো, ওই ব্ল্যাকমেলারটাই কিন্তু অর্ককে খুন করেছিল।

—অর্কর কেসটা আলাদা। লোকটা অর্ককে গ্রিপে পেয়ে গিয়েছিল, এবং ওই মুহূর্তে অর্ককে না সরিয়ে তার কোনও উপায়ও ছিল না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হবে না।

—কেন?

—লোকটার বিষদাঁত ভেঙে গেছে। অন্তত আমার হিসেব তাই বলছে।

—তোমার হিসেব আর কী কী বলছে ম্যাডাম? পার্থ নিরীহ মুখ করে মিতিনের দিকে তাকাল,—কালপ্রিটের নামটা বলতে পারছে?

মিতিন কচকচ শশা চিবোচ্ছে। খানিকটা আত্মগত ভাবে বলল,—একটা কথাই বলতে পারি। কালপ্রিট একজন সূর্যদেব।

—সূর্যদেব! ডিমের কুসুম হাতেই ধরা রইল পার্থর,—সে আবার কে?

—বারে, লক্ষ করোনি, বিদিশার আকাশে শুধুই সূর্যের ছড়াছড়ি?

—হেঁয়ালি করছ কেন? যা বলার স্পষ্টাস্পষ্টি বলো।

—বিদিশার প্রেমিকদের নাম কী? অরুণ মিহির ভাস্কর অর্ক। প্রতিটিই সূর্যের নাম, ঠিক কি না? তারপর পর ধরো ওর বরের নাম অর্চিষ্মান, শ্বশুরের নাম দিননাথ। দুটো নামই সূর্যর। ওর দাদা চিত্রভানু, সেও সূর্য। বাবা প্রভাকর, সেও সূর্য। চাকর পদ্মপাণিও সূর্য, ড্রাইভার রবিও সূর্য, অর্চিষ্মানের বারের ম্যানেজার অম্বরীশও সূর্য, এমন কী যিনি ওর লাইফ ইনশিওর করিয়েছেন, সেই সবিতাবাবুও সূর্য ছাড়া অন্য কিছু নন। বিদিশার ননদাই পূষন, সেও তো সূর্যই।

—আইব্বাস, শুনেই আমার সানস্ট্রোক হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা তুমি কবে আবিষ্কার করলে গো?

—অনেকদিনই করেছি। তোমার শব্দজব্দ করা মাথায় এসেছে কিনা দেখছিলাম।

—মাইরি, এই জন্যই তুমি টিকটিকি।

—এবং তুমি আরশোলা। উচ্চিংড়েও বলা যায়। মিতিন অনেকক্ষণ পর অনাবিল হাসল। ভুরু নাচিয়ে বলল,—কী গো, যাবে নাকি কাল সঙ্গে? অবশ্য প্রেসে যদি চাপ থাকে তবে বাদ দাও...

—না না, কাল তো শনিবার, দেড়টায় ছুটি। আমি বারোটায় বেরিয়ে পড়তে পারি।

—তোমার রিহার্সাল নেই?

—যাব না। নাটক করি বলে কি অমলদার চাকর বনে গেছি না কি? আজ ওই ক্রিটিকাল শোটাকে পার করে দিলাম, তার একটা মাসুল নেই?

—ঠিক আছে। তুমি প্রেসেই থেকো, আমি তুলে নেব।

খাওয়া শেষ করে বেসিনে আঁচাতে গেল মিতিন। পার্থ বসে বসে মাথা চুলকোচ্ছে। এক সময়ে সেও উঠল। মুখ ধুয়ে বসেছে সোফায়। আয়েশ করে সিগারেট ধরাল।

মিতিন টুক করে ঢুকে গেল স্টাডিরুমে। আধঘণ্টাটাক পর বেরিয়ে দেখল, পার্থ শুয়ে পড়েছে। নাকও ডাকছে ফুরুর ফুরুর।

আলো নিবিয়ে বিছানায় এল মিতিন। মাঝখানে বুমবুম, তাকে পেরিয়ে হাত রেখেছে পার্থর মাথায়। ফিসফিস করে ডাকল,—অ্যাই উচ্চিংড়ে, শুনছ?

পার্থর নাকডাকা থেমেছে। পাশ ফিরল,—উম?

—একটা কথা ছিল।

পার্থ জড়ানো স্বরে বলল,—বলে ফ্যালো।

—কদিন কোথাও থেকে একটা ঘুরে এলে হয় না? এই ধরো, পুজোর পর?

—এসব কি হুট বললে হয় না কি? বাঙালিরা সারা বছর ছারপোকার মতো ডেরায় সেঁধিয়ে থাকে, পুজোর সময়ে কিলবিল করে গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এখন তুমি হারগিস কোনও জায়গার টিকিট পাবে না।

—কাছেপিঠে কোথাও চলো। মাথাটা একদম জ্যাম হয়ে গেছে, ছাড়ানো দরকার।...তোমার কোন এক বন্ধু আছে না, ট্র্যাভেল এজেন্ট?

—কোথায় যাবে? পার্থ লম্বা হাই তুলল।

—সূর্যদেবের দেশেই যাই চলো। মিতিন অন্ধকারে মুচকি হাসল,—কোনার্ক, পুরী...

—দেখছি। পার্থর নিশ্বাস প্রলম্বিত হচ্ছে,—এক্সপেনসেজ কিন্তু তোমার...

—তাই হবে গো কিপটেরাম।

মিতিন চোখ বুজল। বাতাসে বেশ হিম হিম ভাব, পাখার হাওয়ায় শীত করছে অল্প। পায়ের কাছে পাতলা চাদর ভাঁজ করা আছে, টেনে ছেলের গায়ে ভাল করে ছড়িয়ে দিল।

পার্থ গভীর ঘুমে চলে গেছে। ছেলের গায়ে আলগা হাত রেখে পাশ ফিরে শুয়েছে মিতিন। ঘুমোতে চাইছে, ঘুম আসছে না। মনে মনে আবার কাহিনীটাকে সাজাতে শুরু করল মিতিন। বন্ধ চোখের পাতায় একের পর কল্পদৃশ্য ভেসে উঠছে। তবু এখনও যেন ফাঁক থেকে যাচ্ছে কোথাও!

অন্ধকারে অদৃশ্য গ্রন্থিটাকে খুঁজছে মিতিন।

[তেরো]

ঠিক দুটো সাতাশে সেন্ট্রাল স্টেশনে ইন করল মেট্রোট্রেন। মিতিন পার্থ প্রস্তুতই ছিল, উঠেছে একেবারে প্রথম কামরায়। সরকারি অফিস সব ছুটি আজ, ট্রেনে তেমন ভিড় নেই, তবে একদম ফাঁকাও নয়। বসার সিট ভর্তি, দু পাঁচ দশজন দাঁড়িয়ে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। চাঁদনি থেকে বেশ কিছু লোক উঠল, মিতিনরা দ্রুত পিছিয়ে এল দ্বিতীয় কামরায়। এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে ট্রেন প্রায় পূর্ণ হয়ে গেছে। মিতিনরাও ওমনি সরে এসেছে

তৃতীয় কামরায়।

মিতিনের চোখে সানগ্লাস, মণি ঘুরছে আনাচে কানাচে। বিদিশা বসে আছে দরজার পাশে, হাতলে হাত, মাথা নিচু, শালোয়ার পরা দু পায়ের মাঝখানে কালো কিটসব্যাগ। চোখ তুলে কী যেন খুঁজল একবার, মিতিনকে দেখেই দৃষ্টি বাত্ময় হয়ে উঠেছে। মিতিন সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

সুড়ঙ্গপথে ছুটছে ট্রেন। প্রচণ্ড আওয়াজ, গাড়ির সর্বাঙ্গ ঝনঝন করছে, কানে তালা লেগে যায়। তারই মধ্যে পার্থ কানের কাছে গুনগুন করে উঠল,—তোমার পুলিশ অফিসাররা কোথায় গো?

—আছে। আগে থেকেই উঠেছে।

—বিদিশার পাশের সর্দারজিটাই বুঝি সেই লোক?

—না। আছে ঠিক জায়গায়। তুমি চুপ করে দাঁড়াও তো।

পার্ক স্ট্রিট এসে গেল। জড়োসড়ো পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বিদিশা, দরজা খুলে যেতেই নেমে গেল, মুহূর্তে হুড়মুড়িয়ে উঠেছে আরও এক ঝাঁক মেট্রোযাত্রী। দরজা বন্ধ হয়ে গেল, উদ্বিগ্ন বিদিশার মুখ মিলিয়ে গেল স্টেশনে।

কামরায় এখন ঠাসাঠাসি ভিড়। মিতিন ঠেলেঠুলে বিদিশার ফেলে যাওয়া সিটের দিকে এগোল কিছুটা। সেখানে এখন সরে বসেছে সর্দারজি, আর সর্দারজির জায়গায় রোগা চেহারা এক যুবক, ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে যুবকটি, যেন কোথাও জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তার।

পার্থ পাশে এসে গেছে। কানে কানে বলল,—ওই কি কালপ্রিট?

—আহ্, থামবে?

পার্থকে মৃদু ধমক দিয়ে আর একটু এগোল মিতিন। দরজার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

পর পর স্টেশন চলে যাচ্ছে। ময়দান রবীন্দ্রসদন নেতাজিভবন...। এখন লোকজনের ওঠা নেই বিশেষ, তবে নামছে অনেকে। এক দল তরুণ তরুণী উচ্চৈঃস্বরে গল্প করছে, হি হি হাসছে, যাত্রীরা ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে তাদের দিকে। ছেলেমেয়েগুলো বেশভূষায় যথেষ্ট আধুনিক। হয়তো সেই আধুনিকতার সঙ্গে তাল মেলাতেই অনর্গল ইংরিজি বুলি ফুটছে তাদের মুখে। মাঝে মধ্যে এক আধটা খাঁটি দেশজ বাংলা শব্দ শুনে সন্দেহ হয় এরা বোধহয় বাঙালি পিতামাতারই সন্তান। পার্থর এ ধরনের ট্যাঁশপনা ঘোরতর অপছন্দ, মাঝে মাঝেই কটমট চোখে ছেলেগুলোকে দেখছে সে, আর বিড়বিড় করছে—এদের সিটিজেনশিপ কেড়ে নেওয়া উচিত...

মিতিন শুনেও শুনছিল না তার চোখ কান মস্তিষ্ক সবই এখন ওই কালো ব্যাগে স্থির। নামার আগে ব্যাগ সামান্য একটু ভেতর দিকে ঠেলে দিয়ে গেছে বিদিশা, হ্যান্ডেলটা সর্দারজির পায়ের কাছে লটপট করছে।

যতীনদাস পার্ক চলে গেল। মিতিন বুকের মধ্যে চাপা উত্তেজনা টের পাচ্ছিল। ট্রেন তো এর পর বেশ ফাঁকা হয়ে যাবে, এখনও ব্যাগটাকে তুলছে না কালপ্রিট?

কালীঘাট স্টেশন। প্রচুর লোক নামছে এ স্টেশনে। সেই ছেলেমেয়েগুলোও নেমে গেল। এখনও ব্যাগ অনড়।

তখনই ঘটল ঘটনাটা। স্বয়ংক্রিয় দরজা বন্ধ হচ্ছিল, হঠাৎই বিদ্যুৎবেগে ব্যাগটা তুলে নিয়ে দরজা গলে নেমে গেল সর্দারজি। মিতিন হতচকিত হয়ে গিয়েছিল, মুহূর্তের মধ্যে ইতিকর্তব্য স্থির করে বন্ধ হয়ে আসা গেটের সরু ফাঁকে গলিয়ে দিয়েছে পা। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল!

মিতিন পার্থ দৌড়ে নেমেছে। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ পোশাকের দুই পুলিশও। মিতিনের ইশারায় তির বেগে ছুটল তারা।

সর্দারজি হনহনিয়ে হাঁটছিল, কিছু একটা আঁচ করে দৌড়তে শুরু করেছে। এসকালেটারে গাদাগাদি ভিড়, লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছে লোকটা। একদম ওপরের ধাপ পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না, তার আগেই পুলিশের লোক চেপে ধরেছে তার কলার।

মিতিন চেঁচিয়ে উঠল,—তপন, একদম নড়বেন না।

ঘাড় ঘুরিয়ে মিতিনকে এক ঝলক দেখেই নিজেকে ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিয়েছে লোকটা। ধেয়ে আসা পুলিশের একজনকে ব্যাগ ঘুরিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল। ছিটকে পড়ে গেছে পুলিশটা, আশপাশের ভিড়ের প্রায় ছত্রভঙ্গ দশা। তারই সুযোগ নিয়ে গেটে পৌঁছে গিয়েছিল সর্দারজিবেশী তপন, গেট পার হতে পারল না, অন্য পুলিশটা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে মিতিনই পৌঁছে গেছে। মিতিনের ডান হাত শূন্যে উঠল একবার, নেমে এল তপনের কাঁধে।

যন্ত্রণায় কুঁকড়ে বসে পড়েছে তপন। বিস্ফারিত চোখে দেখছে মিতিনকে। মিতিন গর্জে উঠল,—আপনার খেলা শেষ তপন। একটু নড়ার চেষ্টা করলে আপনার হাড় আমি গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেব।

তপন দরদরিয়ে ঘামছে। চারপাশে লোকজন জড়ো হয়ে গেছে, সকলে ড্যাবড্যাব চোখে গিলছে দৃশ্যটা। মিতিন টান মেরে তপনের দাড়িটা খুলে নিল, পাগড়িটাও। বেরিয়ে পড়েছে এক সাধামাঠা মুখ। একজন পুলিশ হাতকড়া বার করল, টেনে ওঠানোর চেষ্টা করছে তপনকে, পারল না। কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে গেছে তপনের মুখ, চোখ উল্টে গড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

পুলিশ দুজন নিচু হয়ে ঝাঁকাচ্ছে, নড়ছে না তপন। একজন পুলিশ তপনের হাতটা ওঠাল, বডি তো বেশ ঠাণ্ডা ম্যাডাম! পালস পাচ্ছি না...!

পার্থ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নার্ভাস গলায় বলে উঠল, স্ট্রোক ফোক হল নাকি?

মিতিন বুঁকল,—কিছু হয়নি। নাথিং টু ওরি।

বলেই মিতিন হাত ঢুকিয়েছে তপনের বুকপকেটে। ছোট্ট একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ বার করে আনল। চেপে চোয়াল ফাঁক করে প্যাকেটটা উপুড় করে দিল তপনের মুখে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ভোজভাজি! তপনের চোখ খুলে গেছে, পিটপিট তাকাচ্ছে চারদিকে।

মিতিন মৃদু হাসল,—কী সোনাদা, শরীর ঠিক হয়ে গেছে তো? এবার তা হলে উঠে পড়ুন। এখন যে আপনাকে শ্রীঘর যেতে হবে।

পলকে তপনের মুখচোখ আবার হিংস্র। ফুঁসে উঠেছে,—দেখে নেব, সব্বাইকে দেখে

নেব। সব ফাঁস করে দেব। আমায় ধরিয়ে দেওয়া, অ্যাঁ?

মিতিন তপনের দিকে তাকালই না। কেজো সুরে পুলিশদের বলল,—একে তবে এখন লালবাজারে নিয়ে যান। মিস্টার তালুকদারকে গিয়ে বলবেন আমি ঘন্টা কয়েকের মধ্যেই আসছি।

—আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন না ম্যাডাম?

মিতিন দু দিকে মাথা নাড়ল,—না ভাই,—আমার এখনও কিছু কাজ বাকি।

তরতর পায়ে পার্থকে নিয়ে ভূতলে উঠে এল মিতিন। কিটসব্যাগটা হাতে চেপে খোলা জায়গায় এসে বড় করে নিশ্বাস নিল একটা। পার্থকে বলল,—এক্ষুনি একটা ট্যাক্সি ধরো। শিগগিরই।

পার্থ কিছুই বুঝতে পারছে না। ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছে,—কোথায় যাবে এখন?

—আহ্, দেরি কোরো না। বিদিশা পার্কস্ট্রিট স্টেশনের গেটে অপেক্ষা করছে। ওকে নিয়ে এক্ষুনি ইম্পিরিয়াল এক্সচেঞ্জে যেতে হবে।

—নিলামঘরে? এক্ষুনি? কেন?

মিতিনের ঠোঁটে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। বলল,—তুমি কি ভাবছ তপন একাই কালপ্রিট? মোটেই না।

[চোদ্দ]

পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশন থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে অপেক্ষা করছিল বিদিশা। অপেক্ষা না বলে ছটফট বলাই ভাল, উদ্বিগ্ন মুখে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক, ঘন ঘন কবজি উল্টোচ্ছে, তার ত্রস্ত চোখ পিছলে পিছলে যাচ্ছে প্রতিটি চলমান গাড়িতে। মিতিনদের ট্যাক্সির দর্শন পেয়েই সে প্রায় ঝাপটে এল।

বিদিশা কোনও প্রশ্ন করার আগে মিতিন ট্যাক্সির দরজা খুলে ডাকল,—উঠে পড়ো।

সুস্থিত হয়ে বসতে পারল না বিদিশা, তার নজর আটকেছে মিতিনের কোলে। অস্ফুটে বলল,—লোকটা টাকা নেয়নি?

—চেষ্টা করেছিল, হজম করতে পারেনি। মিতিন কিটসব্যাগটা নাড়াল,—সে এখন পুলিশের জিম্মায়।

—কককে সে? বিদিশার গলা কাঁপছে, —চেনা কেউ?

—হয়তো চেনো। সিগনাল সবুজ হতেই নড়ে উঠেছে ট্যাক্সি, মিতিন বিদিশার দিকে ফিরল,—লোকটার নাম তপন। তপন নন্দী।

পার্থ পাশ থেকে ফুট কেটে উঠল,—ব্যাটা আপনার স্বামীর দোকানে চাকরি করত। ছাঁটাই হয়েছিল।

বিদিশার চোখের মণি স্থির, কী যেন মনে করার চেষ্টা করছে। বিড়বিড় করে বলল,—তপন? হ্যাঁ, লোকটাকে একদিন দেখেছিলাম বটে। আমাদের বাড়িতে...। কিন্তু সে কেন হঠাৎ...? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—সম্ভবত তোমার স্বামীর ওপর আক্রোশেই তোমার ওপর এই আক্রমণ।

—শুধু ছাঁটাই হওয়ার জন্য কেউ এমন...?

—অন্য কারণ থাকলে পুলিশ টেনে বার করবে। বিদিশার জিজ্ঞাসা মাঝপথে থামিয়ে দিল মিতিন,—লোকটা তোমার দাদার বন্ধুও ছিল। তোমার পাস্ট সে জেনেছে তোমার দাদার কাছ থেকেই। চিত্রভানুবাবু অবশ্য এই ব্ল্যাকমেলিং-এর বিন্দুবিসর্গও জানেন না। তিনি শুধু নির্বোধের মতো খবর সাপ্লাই করেছেন, ব্যস। একটু বেশি বকবক করা স্বভাব কিনা।

বিদিশা স্তম্ভিত মুখে বলল,—তাই কি সেদিন লোকটাকে চেনা চেনা লেগেছিল? দাদার সঙ্গেই কি দেখেছি কোনও দিন?

—হতে পারে। মিতিন বিদিশার পিঠে হাত রাখল,—যাক গে, আজ থেকে তোমার দুঃস্বপ্নের দিন শেষ। এবার থেকে লক্ষ্মী বউ হয়ে সুখে শান্তিতে ঘরকন্না করো। নতুন কোনও লোভের ফাঁদে পোড়ো না, আর কোনও ভাস্কর মিহির অরুণ অর্ক জুটিও না। বুঝেছ? মনে রেখো, তোমার স্বামী তোমার একটা অপরাধ হয়তো ক্ষমা করে নেবেন, কিন্তু...। তা ছাড়া তোমারই জন্য অর্কর মতো একটা নিরীহ ছেলেকে মরতেও হয়েছে।

বিদিশা মাথা নামিয়ে নিল। টপটপ জল পড়ছে চোখ বেয়ে। কান্নাটা বোধহয় কৃত্রিম নয়, মনে হল মিতিনের।

ইম্পিরিয়াল এক্সচেঞ্জের সামনে ট্যাক্সি থামিয়েছে পার্থ। মিতিন বলল,—তুমি এই ট্যাক্সিতেই বাড়ি চলে যাও বিদিশা. আমরা একটু মিস্টার রুদ্রর সঙ্গে কথা বলব।

—আমি থাকব না?

—তুমি থেকে কী করবে? হয়তো এক্ষুনি আমাদের মিস্টার রুদ্রকে নিয়ে লালবাজারে ছুটতে হবে। সেখানে কতক্ষণ লাগবে, না লাগবে...। তোমার শ্বশুরমশায়ের শরীরটা ভাল না, তুমি বরং তার কাছেই এখন...। ট্যাক্সি থেকে নেমে মিতিন কী যেন ভাবল একটু। তারপর ট্যাক্সির জানলায় মুখ এনে বলল,—টেনশান কোরো না। আমার স্মরণে আছে, ভাস্কর মিহিরদের কথা তোমার স্বামীকে বলব না। তুমিও এই ব্ল্যাকমেলিং-এর আতঙ্ক মন থেকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলো, কেমন?

ট্যাক্সি মিলিয়ে যেতে পার্থ বলল,—কেসটা কী বলো তো? মেয়েটাকে ভাগালে কেন?

মিতিন মুচকি হাসল,—রহ ধৈর্যং, রহ ধৈর্যং। নাটক তো ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেই গেছে, আর একটু সবুর করোই না।

নিলামঘরে ঢুকতেই দূরে কাচের ওপার থেকে মিতিনদের দেখতে পেয়েছে অর্চিষ্মান। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে। হন্তদন্ত পায়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

মিতিন কিটসব্যাগটা অর্চিষ্মানের দিকে বাড়িয়ে দিল। নীরস গলায় বলল,—দেখে নিন। পুরো পাঁচ লাখই আছে।

অর্চিষ্মানের তবু যেন বিশ্বাস হচ্ছে না,—লোকটা...?

—ধরা পড়েছে। সে এখন শ্রীঘরে।

—রিয়েলি? রিয়েলি? হারামজাদাটা কে?

—বলছি বলছি, তাড়া কীসের! চলুন গিয়ে ঠাণ্ডাঘরে বসি, একটু কফিটফি খাই।

মিতিন ফিক করে হাসল,—আমার স্বামী খুব ভোজনরসিক মানুষ, ওকে একটু ভাল করে আপ্যায়ন-টাপ্যায়ন করুন।

মিতিনের আকস্মিক লঘু আচরণে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল অর্চিষ্মান। পলকে অবশ্য সামলেও নিয়েছে নিজেকে। দারুণ শশব্যস্ত ভঙ্গিতে দুজনকে এনে বসাল নিজস্ব ঘেরাটোপে, বেয়ারাকে ডেকে কফি স্ন্যাকসের অর্ডার দিল, এসিও বাড়িয়ে দিল দু পয়েন্ট। চেয়ারে বসে টেবিলের পেপার ওয়েট নিয়ে নাড়াচাড়া করল একটুক্ষণ। তারপর গলা ঝেড়ে বলল,—ওয়েল ম্যাডাম, এবার সব খুলে বলুন।...বাই দ বাই, আমার ওয়াইফ কোথায়?

—এতক্ষণে তার কথা মনে পড়ল? মিতিনের ঠোঁটে আবার আলগা হাসি,—ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। বেচারার ওপর আজ খুবই মেন্টাল স্ট্রেন গেছে, ওর এখন বিশ্রাম দরকার। তা ছাড়া এই মুহূর্তে ওর বাড়িতে থাকাটা খুব জরুরি। টু অ্যাভয়েড ফারদার মিসহ্যাপ ইন ইওর ফ্যামিলি।

অর্চিষ্মান ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাল।

অর্চিষ্মানের ধন্দ মাখা মুখখানা দেখতে দেখতে হাসি মুছে ফেলল মিতিন। সংক্ষেপে আজকের অভিযানের বিবরণ দিল। শুনতে শুনতে অর্চিষ্মানের চোয়াল শক্ত হচ্ছে ক্রমশ। তপনের নাম শুনে প্রায় ছিটকে লাফিয়ে উঠল। চিৎকার করছে,—আ'ইল কিল দ্যাট সোয়াইন,...দা সান অফ আ বিচ। ব্যাটা চোরস্য চোর, তার অত বড় সাহস...! বলতে বলতে ভুরু কুঁচকে তাকাল,—কিন্তু ওই হারামজাদা বিদিশার এত খবর জানল কোত্থেকে?

—বলছি, সব বলছি। উত্তেজিত না হয়ে স্থির হয়ে বসুন।

বসবে কি, ক্রোধে ফুঁসছে অর্চিষ্মান। ঝপাং করে চেয়ারে ছেড়ে দিল শরীর, হাতের মুঠো পাকাচ্ছে।

মিতিন হিমশীতল গলায় বলল,—এবার মন দিয়ে আমার কথাটা শুনুন। তপন একা কালপ্রিট নয়। একজনের প্রত্যক্ষ যোগসাজশে ঘটনাটা ঘটেছে। বলতে পারেন, তাঁর অপরিণামদর্শিতা এবং দুর্বলচিত্ত আচরণই এই ব্ল্যাকমেলিং-এর মূল কারণ।

অর্চিষ্মানের চোখ সরু হল,—কে সে?

—আপনার বাবা। শ্রীদিননাথ রুদ্র স্বয়ং। তিনি পর্দার আড়ালে আসল ট্র্যাজিক হিরো। ভিলেনও বলতে পারেন।

ঘরে এই মুহূর্তে অ্যাটম বোমা পড়লেও বুঝি এতটা চমকাত না অর্চিষ্মান। বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে না তার। কোনও মতে বলল,—কী আবোল তাবোল বকছেন?

—আমি সত্যি কথাই বলছি। মিতিনের মুখ ভাবলেশহীন,—এও শুনে রাখুন, আপনি এতক্ষণ ধরে যাকে গালিগালাজ করলেন, সেই হারামজাদা তপন নন্দী আপনার বাবারই ছেলে। অর্থাৎ আপনার ভাই।

অর্চিষ্মানের মুখ লাল হয়ে গেছে। ফ্যাসফেসে গলায় বলল,—অ্যাবসার্ড। ইম্পসিবল। হতেই পারে না। তপন নন্দী আমাদের এক্স ম্যানেজার উষাপতি নন্দীর ছেলে।

—হ্যাঁ, এইটাই তার অফিসিয়াল পরিচয় বটে, কিন্তু আদতে সে উষাপতিবাবুর সন্তান নয়। মিতিন গুছিয়ে বসল। অর্চিষ্মানের চোখে চোখ রেখে বলল,—আমার বলতে খুব খারাপ লাগছে মিস্টার রুদ্র, উষাপতিবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আপনার বাবার অবৈধ প্রণয় ছিল। ওই সম্পর্কেরই বিষাক্ত ফল এই তপন নন্দী। দিননাথবাবুর সঙ্গে স্ত্রীর এই সম্পর্কের কথা জানতে পেরে উষাপতিবাবু প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। এবং তপনের জন্মের পর পরই তিনি আত্মহত্যা করেন।

—নো। আই কান্ট বিলিভ ইট। অর্চিষ্মান দু দিকে মাথা ঝাঁকাচ্ছে।

—তবু এটাই ফ্যাক্ট। বিশ্বাস না হয়, আপনার দিদিকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন। আপনার বাবার ঘটনাটা মোটামুটি জানেন।

অর্চিষ্মানের চোখে এখনও তীব্র অবিশ্বাস।

মিতিন গলা ঝেড়ে বলল,—রিল্যাক্স মিস্টার রুদ্র। আপনার বাবা তো একজন মানুষ, আর মানুষ মাত্রেরই পদস্খলন ঘটতে পারে। ইন ফ্যাক্ট, দিননাথবাবুর এই পদস্খলনের যথেষ্ট কারণও ছিল। আপনার মা ছিলেন নিতান্ত সাদাসিধে মানুষ যাকে বলে ঘরোয়া, সলজ্জ, হাঁড়িহেঁশেলে ডুবে থাকা আপাদমস্তক গৃহবধূ। তুলনায় উষাপতিবাবুর স্ত্রী অনেক স্মার্ট, রূপসী বলিয়ে কইয়ে। সব থেকে বড় কথা, তিনি খুব ভাল গান জানেন। হয়তো এই সব কারণেই তিনি বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি...। সে যাই হোক, আপনার বাবা কিন্তু মানুষ খারাপ নন। উষাপতিবাবুর মৃত্যুর পর তপন বা তপনের মার দায়িত্ব তাই তিনি ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। বরং তাদের সংসারটা তিনিই টেনে এসেছেন এতকাল। ওদের একটা বাড়ি কিনে দিয়েছেন, তপনকে ভাল ভাবে মানুষ করার চেষ্টা করেছেন, মা ছেলেকে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রেখেছেন...। এটাকে আপনি তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতাও বলতে পারেন, আবার মহানুভবতাও বলতে পারেন। বাট দি আয়রনি ইজ দিস, তাঁর কৃতকর্ম তাঁকে একটা দিনের জন্যও শান্তি দেয়নি।

বেয়ারা কফি এনেছে, সঙ্গে গরম গরম চিকেন পকোড়া। পার্থ পকোড়ার প্লেটের দিকে হাত বাড়াচ্ছে না, মুগ্ধ চোখে শুনছে স্ত্রীর কথা। অর্চিষ্মানের চোখ মিতিনে স্থির।

মিতিন ধূমায়িত কাপে চুমুক দিল,—অশান্তি আর বদনামের ভয়ে দিননাথবাবু দর্জিপাড়া থেকে সরে এসে সল্টলেকে বাড়ি করলেন, তবু শেষ রক্ষা হল না। ওই তপন সারাটা জীবন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে তাঁকে। সম্ভবত সে ছোটবেলাতেই টের পেয়ে গিয়েছিল, দিননাথ রুদ্র যতই নিজেকে বাবার বন্ধু বলে পরিচয় দিন, আসলে তিনিই তার জন্মদাদা। এসব ব্যাপারে বাচ্চাদের সিক্সথ্ সেন্স খুব কাজ করে। চিরকাল সে দিননাথবাবুকে দু হাতে দোহন করার চেষ্টা করে গেছে। লেখাপড়া তো শিখলই না, উল্টে কুসঙ্গে পড়ে জুয়া খেলে টাকা উড়িয়ে গেছে ক্রমাগত। আর আপনার বাবা অপরাধবোধের ভারে জর্জরিত হয়ে একটি কথাও বলতে পারেননি, নীরবে শুধু তাকে টাকা জুগিয়ে গেছেন। ছেলেকে শোধরানোর শেষ একটা চেষ্টা তিনি করেছিলেন, এই ইম্পিরিয়াল এক্সচেঞ্জে চাকরি দিয়ে। ভেবেছিলেন, রোজগারপাতির মধ্যে থাকলে হয়তো তপনের মতি ফিরবে। আর আপনার সঙ্গে যদি তার হৃদ্যতা হয়ে যায়, তা হলেও তো তার আখেরে লাভই। কিন্তু সেই চেষ্টাও ফেল করে গেল। চুরিচামারি করে তপন

চাকরিটাও খোয়াল, মাঝখান থেকে দিননাথবাবুর সঙ্গে কুরুক্ষেত্র বেধে গেল আপনার। তখন থেকেই তো দিননাথবাবুর দোকানে আসা বন্ধ হয়েছিল। নয় কি?

—হ্যাঁ মানে...বাবা...তপনের মতো স্কাউন্ড্রেলের জন্য এমন ওকালতি করছিলেন...। অর্চিষ্মান প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলে উঠল।

—না করে তাঁর যে কোনও উপায়ও ছিল না। যতই হোক, নিজেরই ছেলে যে। মিতিন মাথা দোলাল,—তখন থেকে আবার অন্য একটা বিপদ শুরু হল। টাকাপয়সার ওপর থেকে দিননাথবাবুর কন্ট্রোল চলে গেছে, তপনদের সংসারে আর ইচ্ছে মতো টাকা দিতে পারছেন না, তপনও ক্রমাগত তাঁকে চাপ দিয়ে চলেছে, তার মাও তাকে থামিয়ে রাখতে পারেন না...। ইতিমধ্যে আপনার দিদিও কিছু আন্দাজ করে থাকবেন। ভবিষ্যতে তপনকে যাতে সম্পত্তির ভাগ না দিতে হয়, সেই জন্য তিনি বাবাকে উইল করার জন্য চাপ দিতে শুরু করে দিলেন। দিননাথবাবু বরাবরই দুর্বলচিত্তের মানুষ, মেয়ের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে গত বছর পুজোর আগে উইলটা করে ফেলতে বাধ্য হন। ছেলে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, বিবেকের এই তাড়নায় কথাটা বোধহয় বলেও ফেলেছিলেন তপনের মাকে, তার পর থেকে প্রতিহিংসার নেশায় পাগল হয়ে উঠল তপন। ইন্সিডেন্টালি, অর অ্যাক্সিডেন্টালি, এর কিছুদিন আগে চিত্রভানুর সঙ্গে তপনের পরিচয় হয়। চিত্রভানু তাকে বিদিশার প্রেমের গল্প শুনিয়েছিল, এক আধ বার সে বোধহয় দেখেওছিল বিদিশাকে, ব্যস ওমনি তার মাথায় শয়তানি বুদ্ধিটা খেলে যায়। দিননাথকে সে প্রেসার করা শুরু করে, ওই বিদিশার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে অর্চিষ্মানের, এবং তারপর বিদিশাকে ব্ল্যাকমেল করে সে নিয়মিত টাকা নিয়ে যাবে। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস, স্নেহে অন্ধ হয়ে এমন একটা কুপ্রস্তাবে রাজিও হয়ে গেলেন দিননাথ। আসলে বোধহয় সব বাবার মধ্যেই একজন ধৃতরাষ্ট্র লুকিয়ে থাকে। আপনি তাঁকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে দিয়েছিলেন বলে তাঁর মনে বোধহয় একটা অভিমানও ছিল। আর সেটাকেই উসকে দিয়েছিল তপন।

অর্চিষ্মান বলে উঠল,—কিন্তু আমিও তো তাঁর ছেলে!

—বিদিশার মাধ্যমে টাকাই তো শুধু নিচ্ছে তপন, আপনার তো কোনও ক্ষতি করছে না! অন্তত দিননাথবাবু এরকমই ভেবেছিলেন হয়তো। পরে, বিদিশা আপনাদের বাড়ির বউ হয়ে আসার পর, গোটা পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়। আবার দুর্বল মনের শিকার হলেন আপনার বাবা। বিদিশাকে সত্যি সত্যি ভালবেসে ফেললেন। একেবারে নিজের মেয়ের মতো। কিংবা তার চেয়েও বেশি। তপন ঘন ঘন তাড়া লাগাচ্ছে কাজ শুরু করবে বলে, কিন্তু তিনি আর কিছুতেই এগোতে রাজি হচ্ছিলেন না। তখনই তপন মাস্টার স্ট্রোকটা দিল।

—মাস্টার স্ট্রোক? পার্থ চিকেন পকোড়ার দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও থমকে গেল,—কীরকম?

—নিলামঘরের চুরি। কাজটি তপনের। ইম্পিরিয়াল এক্সচেঞ্জের কোনও দারোয়ানকে হাত করেছিল তপন। নিলামঘরে হানা দিয়ে সে একটা মোক্ষম জিনিস হাতিয়ে নিয়ে চলে যায়।

—কী জিনিস? অর্চিষ্মানের মুখ থেকে প্রশ্ন ছিটকে এল।

—একটা উইল। দিননাথবাবুর। অনেক দিন আগে করেছিলেন। উইলটিতে তপনকে আপনার সম্পত্তির অংশীদার করা হয়েছিল।

—কিন্তু সেকেন্ড উইল করার পর সে তো অটোমেটিকালি নাল অ্যান্ড ভয়েড! পার্থ চোখ পিটপিট করল,—ওই উইলের আর কী মূল্য?

—আছে। তপন যে দিননাথবাবুর ছেলে, সেই প্রমাণটা তো ওই উইলের সুবাদে তপনের হাতে রয়ে গেল। অর্চিষ্মানের দিকে ফিরল মিতিন,—আপনাদের বাতিল আলমারিটা থেকে ওই উইলেরই ছেঁড়া অংশ আমি পেয়েছি। দিননাথবাবু ওটা বাড়িতে রাখার সাহস পাননি, দোকান থেকে নিয়েও যেতে পারেননি। তপন সম্ভবত তার মার কাছ থেকে জেনেছিল ওটা কোথায় আছে।

অর্চিষ্মান দু আঙুলে রগ টিপে ধরেছে,—আমি ভাবতে পারছি না, ভাবতে পারছি না...

—বাট দিস ইজ অলসো ফ্যাক্ট। এমনটাই হয়েছে। ওই উইল হাতে পেয়েই লম্ফঝম্ফ বেড়ে যায় তপনের। অগত্যা নিরুপায় হয়ে দিননাথবাবুকে সম্মতি দিতে হয়েছিল খেলাটায়। মনে রাখবেন, চুরির পরদিনই দুপুরে প্রথম ফোনটা আসে। এরপর থেকে তপনের প্রতিটি কাজে তিনি সহায়তা করেছেন। বিদিশার প্রতিটি গতিবিধির ওপর তিনি নজর রেখেছেন, টাইম টু টাইম তপনকে জানিয়েও গেছেন। রবি ছিল দিননাথবাবু লোক, সেই মেনলি বিদিশার ওপর নজরদারিটা...। বিদিশা যখন নার্ভাস হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, তখনই তার গয়নার বাক্সটা চুরি হয়। আমি নিশ্চিত, এর পিছনে দিননাথবাবুর ইন্সট্রাকশন ছিল। অবশ্য বাক্সে যে লাভলেটার আছে, এটা রবি বা দিননাথবাবুর কেউ ভাবতে পারেননি। ওটা একটা ম্যাটার অফ কোন্সিডেন্স। অবশ্য রবি বাক্স খুলে চিঠির তাড়া দেখেও থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, রবি এখন বহাল তবিয়তে তার দেশের বাড়িতে হাওয়া খাচ্ছে। আপনি যা জানেন না তা আপনাকে বলি, তপন যে শার্ট পরে প্রথম দিন টাকা নিতে যায়, তার একটি বোতাম অর্ক ছিঁড়ে নিয়েছিল। শার্টটা আপনার পুরনো জামাকাপড়ের ড্রয়ারে পরে পাওয়া গেছে।

—ইজ ইট? কিন্তু কী করে?

—দিননাথবাবুরই কাজ। জাস্ট টু মেক বিদিশা মোর নার্ভাস। এই কাজটাই বড় কাঁচা হয়ে গিয়েছিল। আপনি ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটি দোকান থেকে শার্ট বানান, কিন্তু ওই শার্ট অন্য টেলারের। মেটিরিয়ালও অনেক সস্তা দামের। দিননাথবাবু ব্যাপারটা খেয়ালই করেননি। অর্কর মৃত্যুর পর থেকে তিনি বেজায় নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলেন। প্রাণপণে তপনকে রুখবারও চেষ্টা করেছেন। বাট ইট ওয়াজ টু লেট। তপন আপনার বাবার সঙ্গে শেষে রফা করেছিল একটা মোটা টাকা পেলে সে আপাতত চুপ করে যাবে। তাই লাস্টে টাকার অ্যামাউন্টও বেড়ে গেল। দু লাখ থেকে পাঁচ লাখ।

অর্চিষ্মান খানিকক্ষণ চুপ। মাথা নিচু করে বসে আছে। তারপর টেরচা চোখে মিতিনের দিকে তাকাল,—আপনি যে আমার বাবার বিরুদ্ধে এতগুলো সিরিয়াস অ্যালিগেশন আনলেন, প্রমাণ আছে কিছু?

—প্রমাণ তো ওই তপনই। সে এখন ডিসি ডি ডির হেপাজতে আছে। পুলিশি জেরার সামনে সে বেশিক্ষণ মুখ বন্ধ করে থাকতে পারবে না। মিতিন বড় করে শ্বাস নিল,—শুনুন মিস্টার রুদ্র, আপনার বাবার অ্যাফেয়ারের ব্যাপারটা আপনার দিদির কাছ থেকে আমি ভেরিফাই করে এসেছি। ইচ্ছে হলে ফোন করে দেখতে পারেন। চাইলে দিননাথবাবুকেও এক্ষুনি ফোন করুন। জানিয়ে দিন, তপন অ্যারেস্ট হয়েছে। তারপর দেখুন কী রিঅ্যাকশন হয়। দিননাথবাবুর মতো দুর্বল মানুষ আর কিছুই অস্বীকার করতে পারবেন না।

অর্চিষ্মান আবার চুপ।

মিতিন নিচু গলায় বলল,—আমার কাজ কিন্তু শেষ মিস্টার রুদ্র। এবার আপনি ঠিক করুন কী করবেন।

অর্চিষ্মানের গাম্ভীর্যের আবরণ খসে গেছে। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল,—কী করি বলুন তো?

[পনেরো]

শহরে সন্ধে নেমে গেছে অনেকক্ষণ।

লালবাজার থেকে ফেরার পথে মিতিনদের ঢাকুরিয়া নামিয়ে দিয়ে গেল অর্চিষ্মান। গাড়িতে এতক্ষণ চুপচাপই ছিল পার্থ, বাড়ি ঢুকেই সে উত্তেজিত ভাবে প্রশ্ন করল,—বাপটাকে তুমি বেমালুম ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিলে?

মিতিন বড় অবসন্ন বোধ করছিল। মস্তিষ্কের কসরত শেষ, শরীর যেন আর চলছে না, সোফায় নিজেকে ছেড়ে দিতে দিতে অলস গলায় বলল,—হুম।

জুতো খুলে উল্টো দিকের সোফায় বসল পার্থ। বেজার মুখে বলল,—তা হলে তোমার এতদিনের পরিশ্রমের কী অর্থ?

—অর্থ তো আমার ব্যাগেই রয়েছে। করকরে পঞ্চাশ হাজার!

—তা ঠিক। তবু...। পার্থ সিগারেট ধরাল। খুঁতখুঁত গলায় বলল,—এটা কিন্তু সুবিচার হল না। একই অপরাধের জন্য একজন শাস্তি পাবে, অথচ তার সহযোগীর সব দোষ মাপ? দিস ইজ হাইলি আনএথিকাল।

মিতিন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। বুমবুম ডুবে আছে পাজলে, ঘরময় অজস্র রঙিন পিজবোর্ডের টুকরো, জুড়ে জুড়ে বাঘ সিংহ হাতি ভাল্লুক বানাচ্ছে অখণ্ড মনোযোগে। এভাবে বসার ঘরের মেঝে নোংরা করার জন্য ছেলেকে বকাবকি করে মিতিন, আজ যেন দেখেও দেখছে না।

একটু পরে খানিকটা আত্মগত ভাবেই বলল,—মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে আর কী লাভ, বলো? বেচারা দিননাথবাবু এমনিতেই অন্তর্দাহে পুড়ছেন। তিনিও তো এক ধরনের ব্ল্যাকমেলিং-এরই শিকার, নয় কি? তাঁর অতীত, তাঁর ভুল তাঁকে তপনের হাতের পুতুল বানিয়ে রেখেছিল।

—কিন্তু অফেন্সটা তো অফেন্সই। তা হলে তপনকেও তোমাদের ছেড়ে দেওয়া

উচিত ছিল।

—সে তো এমনিই ছাড়া পেয়ে যাবে। অর্চিয়ানকে দেখে বুঝলে না, সে এখন প্রাণপণে পারিবারিক কলঙ্ক গোপন করতে চায়? তপনকে নিয়ে বেশি নাড়াঘাঁটা করলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে না? বড় জোর এখন তপনের এগেনস্টে নাম-কা-ওয়াস্তে একটা টাকা এক্সট্রশনের কেস চলবে। তবে সেই কেসও অর্চিয়ান আর পারসিউ করবে বলে মনে হয় না। মিতিন বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলল,—তপন অনেক দোষ করেছে। বিশেষত অর্ককে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলার কোনও ক্ষমা হয় না। কিন্তু লজিকালি স্পিকিং, গাড়ি চাপা দিয়ে খুন প্রমাণ করা খুব কঠিন। তাও আবার এতদিন পর। তার থেকেও বড় কথা, ঘাতক গাড়িটা যদি আইডেন্টিফায়েড হয়, দিননাথ রুদ্র আবার বিপাকে পড়বেন। কারণ সবাই জানে তিনি তাঁর পুরনো অ্যাম্বাসাডার বেচে দিয়েছিলেন। এটাও যে মিথ্যে, গাড়িটা যে তিনি তপনকে দিয়ে দিয়েছিলেন...। আমি সুভাষকে মোটর ভেহিকল্‌সে পাঠিয়েছিলাম। দিননাথের সাদা অ্যাম্বাসাডার কার নামে ট্রান্সফারড হয়েছিল জানো? বীথিকা নন্দী। তপনের মা।

বিমলা চা এনেছে। সেন্টার টেবিলে কাপ নামিয়ে বলল,—বিকেলে একটু চিঁড়ের পোলাও বানিয়েছিলাম, খাবে?

—আমি আর এখন কিছু খাব না। তোর দাদা খায় তো দে।

—না, না, আমার পেটে এখনও চিকেন পকোড়া গজগজ করছে। তুমিই বরং একটু...। ওখানে তো কিছুই মুখে দিলে না।

—ইচ্ছে করছে না। একটু পরে একেবারে রাতের খাওয়া খেয়ে নেব। ক'দিন ধরে মাথাটা জ্যাম হয়ে ছিল, আজ একটা লম্বা ঘুম দরকার।

আর বিশেষ কথা হল না। একটুক্ষণ চোখ গোল গোল করে বসে রইল পার্থ, তারপর চা শেষ করে বাথরুমে ঢুকে গেছে, শাওয়ার খুলে গান ধরেছে সুরেলা গলায়। বুমবুম ক্যাঙারুর দেহে খরগোসের মাথা বসাচ্ছিল, মিতিন হাঁ হাঁ করে বাধা দিল তাকে। নেমে বসেছে মেঝেয়, ছেলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ধাঁধা খেলায়, আধ ঘন্টার মধ্যেই শরীর মন অনেকটা চনমনে।

আবার বিদিশা-প্রসঙ্গে ফিরল রাত্রে। খাওয়া দাওয়ার পর। বুমবুম ঘুমিয়ে পড়েছে, ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে টান টান করে চুল বাঁধছিল মিতিন, খাটে চিৎপাত পার্থ ঘুরন্ত ফ্যানের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল,—আচ্ছা, কেসটা তুমি সল্‌ভ করলে কী করে বলো তো?

মিতিন হাসি হাসি মুখে বলল,—তুমি কি শুয়ে শুয়ে কেসটার কথাই ভাবছ নাকি?

—ভাবছিই তো। দিননাথ রুদ্রকে তুমি সন্দেহের তালিকায় আনলে কী করে?

—এটা বুঝলে তো তুমিই টিকটিকি হতে, আর আমি আরশোলা। মিতিন হাসতে হাসতে পার্থর পাশে এসে বসল। হাতে নাইটক্রিম, ঘষছে মুখে। পার্থর নাকে একটু ক্রিম লাগিয়ে দিয়ে বলল,—দিননাথকে আমিও প্রথমে গোনায় ধরিনি মশাই। আমার প্রথম সাসপেক্ট কে ছিল তুমি তো জানই!

—হ্যাঁ। অর্চিয়ান রুদ্র।

—রাইট। অর্চিষ্মানকে সন্দেহ করার কারণও তোমায় বলেছিলাম। আপাতদৃষ্টিতে অনেক কিছুই অর্চিষ্মানের বিরুদ্ধে যায়। দিঘায় তার হঠাৎ অস্বাভাবাবিক আচরণ, দুম করে বিদিশার নামে দশ লাখ টাকার পলিসি করা, সদ্যবিবাহিত স্ত্রী টেনশানে ছটফট করছে, সেদিকে আদৌ লক্ষ না করা, অথচ সেই স্ত্রীর ব্ল্যাকমেলারকে দু-পাঁচ লাখ টাকা দেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়া—এর একটাকেও ঠিক স্বাভাবিক বলা যায় না। এমনকী রবির হাপিশ হয়ে যাওয়াও অর্চিষ্মানের কারসাজি বলে মনে হয়। ঈর্ষায় উন্মাদ মানুষ কী না করতে পারে!

—বটেই তো। বউ-এর পেছনে ড্রাইভার লেলিয়ে দেওয়াও অস্বাভাবিক নয়, বাই চান্স বউ-এর লাভলেটার-বক্স হাতে পেয়ে গিয়ে আরও হিংস্র হয়ে ওঠাও বিচিত্র নয়। পার্থ কনুই-এ ভর দিয়ে আধশোওয়া হল,—আমার কিন্তু প্রেমিকদের দিকেও সন্দেহ গিয়েছিল।

—সে তো তুমি বলেই দিয়েছিলে ওটা অর্কর কাজ।

—তার কারণও ছিল। লোকটা গাড়ির তলায় আধঘণ্টা শুয়ে রইল, অথচ অর্ক তাকে তখন ধরারও চেষ্টা করল না...

—আমি শিওর অর্ক তখন পাজল্‌ড্‌ হয়ে গিয়েছিল। বেচারা ভাল মানুষ ওরকম পরিস্থিতিতে তো কখনও পড়েনি। যদি ধরতে গিয়ে ফেল করে যায়, যদি প্রেমিকার কোনও নতুন বিপদ হয়...! তা ছাড়া লোকটা, আই মিন তপন, কেন ওভাবে অতক্ষণ শুয়ে রইল, অর্কর হিসেবেই আসছিল না। যেমন তপনেরও হিসেবে আসেনি সত্যি সত্যি বিদিশা অর্ককে সঙ্গে এনেছে। শেষ পর্যন্ত অর্ক যখন মরিয়া ডাইভ দিল, তখনই মুশকিলটা হয়ে গেল। দুজনেই দুজনকে সামনাসামনি দেখে ফেলল। তপন বেজায় ঘাবড়েছিল, তবে সে সময়ে বিদিশা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তপন ভেবেছিল ব্যাপারটা বুঝি ধাপাচাপা পড়ে গেল। কিন্তু অর্ক তক্কে তক্কে ছিল, আকস্মিক ভাবে তপনের সুলুক সন্ধানও পেয়ে গিয়েছিল সে। যখন তপনের সম্পর্কে অর্ক অনেকটা জেনে ফেলেছে, তখনই ব্যাপারটা তপনের নলেজে আসে। খুন হওয়ার আগে তপনের পাড়ায় গিয়েছিল অর্ক, তখনই তপন ঠিক করে অর্ককে সরিয়ে দেবে। অজয় খবর এনে দিয়েছে, সে দিন সকাল থেকেই স্টেডিয়ামের আশেপাশে একটা সাদা অ্যাম্বাসাডার ঘোরাফেরা করছিল। অবশ্য প্রত্যক্ষদর্শীরা সঠিক বলতে পারেননি সন্ধেবেলা ওই অ্যাম্বাসাডারই অর্ককে হিট করেছে কিনা।...যাই হোক, দুয়ে দুয়ে তো আর পাঁচ হয় না। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি তপনই...। অতি দুঃসাহসী হয়ে তপন সেদিনই বিদিশাকে আবার ফোনও করেছিল।

—হুঁ। পার্থ উঠে বসল। হাত বাড়িয়ে বেডসাইড টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করেছে। ধরাল না সিগারেট, ঘোরাচ্ছে আঙুলে।

মিতিন বলল,—শুনুন স্যার। অর্ক কেন, বিদিশার কোনও প্রেমিককেই আমি সন্দেহ করিনি। বিদিশা বার বার ভাস্করের দিকে আঙুল তোলা সত্ত্বেও না।

—তা হলে তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে কেন?

—ছাই উড়িয়ে দেখতে চাইছিলাম, মণিমুক্তোর সন্ধান পাই কিনা। ভাস্করকে দেখে বুঝলাম লোকটি একটি অতি পগেয়া মাল। বিদিশাকে সে মন থেকে বহুকাল আগে

ঝেঁটিয়ে বিদায় তো করেছেই, সে এখন যে মেয়ে দেখে তার হাত ধরেই টানাটানি করতে চায়। রাজনীতির দৌলতে সে এখন দিব্যি করে কম্মে খাচ্ছে, অর্চিষ্মানের কাছেও তার কিছু ধান্দা আছে, ও সব বাঁকাচোরা ঝামেলায় জড়ানোর বান্দাই নয় সে। মাঝে সে অনেক দিন কলকাতার বাইরে ছিল, এই পয়েন্টটাও তার ফেবারে যায়। কিন্তু মিহিরের কেসটা আলাদা। সে গেরস্ত মানুষ সদ্য বিয়ে-থা করে সুখে আছে...। তবে এর কাছ থেকেই মোক্ষম ইনফরমেশানটা জুটে গেল।

—আর সেই সূত্র ধরেই চিত্রভানু, চিত্রভানুকে ধরে সোনাদা! পার্থ সিগারেটটা ধরাল,—এ তো আমি জানি। কিন্তু দিননাথকে তুমি পিকচারে আনলে কী করে?

—মনের ভেতর অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে মশাই। চিত্রভানুর কাছ থেকে জনৈক সোনাদার সন্ধান পেয়ে চমকে ছিলাম বটে, কিন্তু ব্ল্যাকমেলিং-এর ঘটনার সঙ্গে এই লোকটাকে ঠিক অ্যাসোসিয়েট করতে পারছিলাম না। কারণ তখনও আমার মন জুড়ে আছে অর্চিষ্মান। সোনাকে বছর দুই আগে ছাঁটাই করেছে অর্চিষ্মান, গত বছর জুলাই আগস্টে চিত্রভানুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সোনার, পুজোর ঠিক পরে কেউ একজন গিয়ে চিত্রভানু সেজে মিহিরের কাছ থেকে বিদিশার প্রেমপত্র নিয়ে এল, তার মাস আড়াই পরে আকস্মিক ভাবে অর্চিষ্মানের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হল বিদিশার, ব্ল্যাকমেলিং শুরু হল বিয়ের ছ মাস পরে, ব্ল্যাকমেলিং-এর ফোন আসার আগের দিন অদ্ভুত এক চুরি হয়ে গেল নিলামঘরে, চোর প্রায় কিছুই নিল না, শুধু শুধু কিছু আলমারি ঘেঁটে গেল, তার মধ্যে একটা আবার ভাঙা বাতিল আলমারি—ব্যাপারগুলোকে ঠিক ঠিক লিংকআপ করতে পারছিলাম না। অথচ মনে হচ্ছে প্রতিটি ঘটনার মধ্যেই কোথায় যেন একটা সুতোর যোগ আছে। মিহিরের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়ে গেছি বিদিশা আর অর্চিষ্মানের বিয়ে হঠাৎ স্থির হয়নি, এটা রীতিমতো পূর্বপরিকল্পিত। প্ল্যানটা কার? অর্চিষ্মানেরই? তা হলে প্রতিহিংসার থিয়োরিটা মিথ্যে হয়ে যায়। ধরে নিলাম, দিননাথ সাদা সরল মানুষ, অর্চিষ্মানই আটঘাট বেঁধে বাবাকে দিয়ে বিয়ের ব্যাপারটা ঠিক করিয়েছিল। সে ক্ষেত্রে কি দিননাথ পরে ঠাট্টার ছলেও কথাটা বিদিশাকে বলতেন না? তা ছাড়া মাত্র দশ লাখ টাকা পাওয়ার সম্ভাবনায় এমন দীর্ঘমেয়াদি একটা প্ল্যান...? নাহ্, হিসেবটা মিলছে না, হিসেব মিলছে না। ভাবতে ভাবতে সেদিনই অবশ্য চোখ অনেকটা খুলে গেল।

—কী করে?

—ওই শার্ট। অর্চিষ্মান যদি গোটা ব্ল্যাকমেলিং-এর ব্যাপারটা সাজিয়ে থাকে, সে কেন নিজের জাপাকাপড়ের মধ্যে ওই শার্ট রাখতে যাবে? তা হলে রাখল কে? বাড়িরই কেউ! পদ্মপাণি মানদা সুমতি...! কেন তারা রাখবে? অর্থপ্রাপ্তির আশা? কারও নির্দেশ? তখনই মনে পড়ল অর্চিষ্মানের জাপাকাপড় ঘাঁটতে দিননাথই বিদিশাকে বলেছিলেন! তবে দিননাথই কি বিদিশাকে বিভ্রান্ত করার জন্য...? আবার আমি তোমার আনা স্টেটমেন্টগুলো নিয়ে বসলাম। কয়েকটা অসঙ্গতি আগেই চোখে পড়েছিল, এবার স্টাডি করে সেগুলো আরও স্পষ্ট হল। সুমতি বলছে, রবি মিসিং হওয়ার আগের দিন চলে গিয়েও আবার ফিরে এসেছিল। বোনাস নিতে। বোনাস, নাকি দিননাথের সঙ্গে অন্য প্রয়োজন ছিল? মানদার এজাহার অনুযায়ী, রবি বলত বিদিশা এ বাড়ি আসার পর তার

কপাল খুলে গেছে! কেন বলত? শুধুই বিদিশার কাছ থেকে বখশিস পেত, তাই? উঁহু, ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছে। পদ্মপাণির বক্তব্য, ইদানীং বড় উদ্ধত হয়ে গিয়েছিল রবি। কোন জোরে? দিননাথের দিকে সন্দেহের তিরটা এবার সরতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পারছি, দ্বিতীয় আর একজন লোকও আছে। যে গাড়ির তলায় শুয়ে ছিল, সাদা অ্যাধাসাডার নিয়ে ঘোরে, অর্ককে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে, যার শার্ট এসে গেছে অর্চিষ্মানের দেরাজে...। কাকে আড়াল করতে চাইছেন দিননাথ? সে কি ভাড়া করা লোক? নাকি সে'ই চক্রান্তের হোতা? আমার সিক্সথ সেন্স বলছিল, চিত্রভানুর সোনাকেও একবার বাজিয়ে দেখা দরকার। পরদিনই নিলামঘরে গিয়ে অর্চিষ্মানের কাছ থেকে ছাঁটাই হওয়া সকলেরই নাম ঠিকানা নিয়ে নিলাম। ওই সময়ে স্ট্যাম্পপেপারের টুকরোটাও পেয়ে যাই। তারপর ছুটলাম বাড়ি বাড়ি। স্বর্ণেন্দু হরিপ্রসাদ হয়ে তপন। বিকেলের মধ্যে ছবি মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেল। তপন যে সোনা, সেটাও।...তপনের বাড়িতেই মোস্ট ভাইটাল জিনিসটা চোখে পড়ল। ইনসুলিনের ভাঙা অ্যাম্পিউল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ধাঁধার সমাধান পেয়ে গেলাম।

পার্থর সিগারেট শেষ, আর একটা সিগারেট ধরাল। দু দিকে মাথা নেড়ে বলল,—বুঝলাম না।

—তুমি কী গো? মনে নেই চিত্রভানু কী বলেছিল? সোনাদা মিষ্টি খাওয়ায়, কিন্তু নিজে খায় না! বীথিকা নন্দী বললেন, ইনসুলিন নেয় তার ছেলে। অর্থাৎ তপন অ্যালিয়াস্ সোনা একজন অ্যাকিউট সুগার পেশেন্ট। এই সব রোগীদের হঠাৎ হঠাৎ হাইপোগ্লাইসিমিয়ার অ্যাটাক হয়। বিশেষত টেনশানের মুহূর্তে।

—সেটা কী জিনিস? ওই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া?

—ইয়েস। ব্লাডের সুগার লেভেল সাডেনলি ফল করে সেন্সলেস হয়ে যায় রোগী, এতে আকস্মিক মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়। এরা সব সময়ে পকেটে চিনি রাখে। মুখে চিনি দিলেই সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা। শুধু চাঙ্গা নয়, একশো পারসেন্ট ফিট। তখন এরা হাঁটতে পারে, দৌড়তে পারে, গাড়ি চালাতে পারে...। গাড়ির নীচে তপনের এই অ্যাটাকটাই হয়েছিল। সে তো আর বর্ন ক্রিমিনাল নয়, সুস্থ হওয়ার পরেও কনফিডেন্স পাচ্ছিল না, বেরোতে সময় নিচ্ছিল...

—এটা কিন্তু তোমার স্রেফ আন্দাজ।

—মোটেই না। পরশুদিন বিদিশার বাড়ি গিয়ে তপনের শার্ট আমি পরীক্ষা করেছি। ওতে চিনির দানা লেগেছিল। চোখে দেখা যায় না, চেটে বুঝেছি। দেখলে না, ওই অ্যাটাকই আজ আবার...। মিতিন হাত নেড়ে মুখের সামনে থেকে সিগারেটের ধোঁয়া সরাল,—বিদিশার কাছ থেকে পরশু আরও কয়েকটা খবর পেলাম। দিননাথের উইল করার কথা, মামাবাড়ির সঙ্গে অর্চিষ্মানদের কোনও সম্পর্ক প্রায় না থাকার কথা, ভাই বোন কারও গানের অত ঝোঁক নেই অথচ বাবা গানপাগল—সব মিলিয়ে দিননাথকে নিয়ে মনে মনে গড়ে তোলা কাহিনীটা যেন পুরোপুরি একটা শেপ পাচ্ছিল। ছুটলাম অর্চনার বাড়ি। রবি পূষনের দেওয়া লোক, সেই ছুতো ধরে পূষনকে ব্ল্যাকমেলিং-এ জড়িয়ে অর্চনাকে কষে ভয় দেখালাম। ব্যস, চাপের মুখের অর্চনার পেট থেকে কথা

বেরিয়ে এল। বাবার অ্যাফেয়ারের কথা, বাবা অবৈধ সন্তানকে সম্পত্তির ভাগ দিতে পারেন, সেই আশঙ্কার কথা...। পুরনো উইলের চিন্তাটাও তখনই মাথায় এসে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী কমপ্লিট।

—হুঁ। পার্থ মাথা দোলাচ্ছে, —আচ্ছা, পূষন অর্চনাকে তুমি আদৌ সন্দেহ করলে না, এটা কেন হল?

—কে বলল করিনি? আমার লিস্টে সবাই ছিল। প্রভাকর ভারতী চিত্রভানুরাও। কিন্তু সোনা আর দিননাথকে এত হুড়মুড় করে পেয়ে গেলাম...। মিতিন লম্বা হাই তুলল। আড়মোড়া ভেঙে শুয়ে পড়েছে বিছানায়। বিড়বিড় করে বলল,—বেচারা দিননাথ! বিদিশাকে উনি সত্যি সত্যিই ভালবেসে ফেলেছেন, অথচ এই কুকর্মে তাঁকে সমানে তাল দিয়ে যেতে হয়েছে।...আননেসেসারি কত মিথ্যে বলতে হয়েছে জানো? তোমার দেওয়া স্টেটমেন্ট অনুযায়ী, রবি মিসিং হওয়ার আগের দিন উনি রবিকে নিয়ে শ্যামবাজারে টেপ সারাতে গিয়েছিলেন। শ্যামবাজার মোড়ে চরকি মেরে সেই দোকানটাও আমি খুঁজে বার করেছি। বহুকাল ধরে সেখানে নিয়মিত যাতায়াত ছিল নামি অকশনিয়ার দিননাথ রুদ্রর, দোকানদারই বলেছে। সত্যিই ওখানে রেডিও টেপ রেকর্ড প্লেয়ার সারাতেন দিননাথ। কিন্তু ওই বিশেষ দিনটিতে উনি সেখানে যানইনি। আবার বৃহস্পতিবার দিননাথ অবলীলায় বলে দিলেন মঙ্গলবার নজরুল মঞ্চে ফাংশন শুনতে গিয়েছিলেন। আমি ছোট্ট টোপ দিলাম, আমজাদ আলি খাঁর বাজনা? ওঁর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, হ্যাঁ। সেদিন নজরুল মঞ্চে আমদাজ আলি খাঁর প্রোগ্রামই ছিল না। সম্ভবত তিনি আন্দাজই করতে পারেননি আমি একজন গোয়েন্দা।...দিননাথ আসলে যেতেন তপনদের বাড়ি। বীথিকা দেবীকে বুঝিয়ে টুঝিয়ে তপনকে থামানোর চেষ্টা করতেন। বখে যাওয়া অবৈধ সন্তানটিকেও তিনি বড় ভালবাসতেন যে। আর এই ভালবাসাই তাকে বাধ্য করেছে তপনের শার্টখানা অর্চিষ্মানের দেরাজে রেখে বিদিশাকে পুরোপুরি ঘুলিয়ে দিতে। ভয়েস রেকর্ডার আনা দেখে তিনি ভেতরে ভেতরে বিপদের গন্ধ পাচ্ছিলেন।

—যাই বলো, বেচারা তো তপনও। পার্থও আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল,—আহা রে, শেষ বাজিটা আর মারতে পারল না। এটা পেয়ে গেলে হয়তো চিরকালের মতো চুপ করে যেত।

—হয়তো। মিতিন চোখ বুজল,—তাই না দু লাখ লাফিয়ে পাঁচ লাখ হয়ে গিয়েছিল...কিন্তু লোভের তো শেষ নেই পার্থ। লোভ লালসা বাসনা কামনা, কোনও কিছু থেকেই মানুষের পালাবার পথ নেই।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ। অন্ধকার ঘরে শুধু ঘূর্ণায়মান পাখার শব্দ। যেন দীর্ঘশ্বাস বাজছে একটা।

একটু পরে পার্থর গলা শোনা গেল,—ওয়ান লাস্ট কোয়েশ্চেন মিতু। বিদিশাকে তুমি সব কথা জানতে দিলে না কেন? অর্চিষ্মানকেও বারণ করে দিলে...

—যে কারণে বিদিশার সব কথা অর্চিষ্মানকে জানালাম না...। বিদিশার প্রেমিকদের লিস্ট শুনে অর্চিষ্মান কী করবে? শ্বশুরের কীর্তির কথা শুনেই বা কী মোক্ষ লাভ হবে বিদিশার? এতে তো শুধু তিক্ততা আর সন্দেহই বাড়ে।

—তার মানে বলছ স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কিছু গোপনীয়তা থাকা ভাল?

—কখনও কখনও ভাল বইকি। অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পর্কটা ভাল করে দানা না বাঁধে। ওরা যদি কখনও গভীর ভাবে পরস্পরকে ভালবাসতে পারে, নিজেরাই পরস্পরকে বলে দেবে সব কথা।

পার্থ হাত বাড়িয়ে ছুঁল মিতিনকে,—আমাদের মধ্যে কি কোনও গোপনীয়তা আছে, মিতু?

মিতিন হেসে ফেলল,—আছে বইকী। এই মুহূর্তে একটা গোপনীয়তা তো আছেই।

—কী?

—কাল যখন অত বার করে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলছিলাম, হুঁ হ্যাঁ করে ঘুমিয়ে পড়লে, অথচ আজ সকালেই আমি আলমারিতে একটা খাম পেয়েছি। খামে ট্রেনের টিকিট। পুরীর। জার্নি ডেট ফিফটিনথ অক্টোবর। অর্থাৎ একাদশী। তুমি এটা আমার কাছে চেপে গেছ কেন?

—সারপ্রাইজ দেব বলে।

—কবে কেটেছ?

—অ্যাই অ্যাই, নো টিকটিকিপনা। পার্থ মিতিনের ঠোঁটে আঙুল চাপা দিল, তোমাকে আগে থেকে ওয়ার্নিং দিয়ে রাখছি, পুরীতে গিয়ে কিন্তু নো গোয়েন্দাগিরি। কোনও অর্চিষ্মান অর্কর পেছনে দৌড়োনো চলবে না।

—তুমিও কোনও বিদিশার পেছনে ছুটো না, তা হলেই...

কথাটা শেষ করতে পারল না মিতিন। ছেলেকে টপকে চলে এসেছে পার্থ, একেবারে নীরব করে দিয়েছে মিতিনকে।

মাথার ওপর এখন আবার শুধু ঘুরন্ত পাখার শব্দ। তবে দীর্ঘশ্বাসটা নেই আর, কোথাও নেই।